

মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদক : ডঃ বিষ্ণু বসু

কমলা সাহিত্য ভবন

৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

কমলা সাহিত্য ভবনের পক্ষে
শ্রী মদন সিংহ কর্তৃক ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীঅলকেন্দ্রশেখর পত্রী

অলংকরণ ও মುದ্রণে : কোলাজ
২, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-৭০০০১০।

বিষয় বিবৃতি

রক্তবতী	১
গোরাই ব্রজ অথবা গোরি-সেতু	১২৫
জমীদার দর্পণ	৩৮
এর উপায় কি	৮০
উদাসীন পাথকের মনের কথা	১২০
বসন্তকুমারী নাটক	৩০২
গো জীবন	৩৫১

মহাবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম স্কুমার এবং মন্ত্রিপুত্রের নাম স্মমন্ত। স্মমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৌবনকাল পর্য্যন্ত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন এবং একসঙ্গে ক্রীড়া ক্রীড়া করিতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি। মনুষ্যের সৌভাগ্য-শলী কখনই সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার স্কুমার এবং মন্ত্রিকুমার স্মমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত-বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোত্তোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেষভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিমুক্ত বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের সূচাকু শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন স্কুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জনমধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাঁহারা কোন বিষয়ে নিধন লোকের হ্রাস চিন্তাজরে জর্জরীভূত হন না, বিপদেও চিন্তাহীন সন্তোষ করিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন। এমন কি তিলাঙ্কিকালের জ্ঞাত ও ছুঃখিত থাকেন না। নিধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হউন না, তাঁহাদিগকে চিরদিন ধনীদিগের পদানত ভূত্য থাকিতে হয়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীন ব্যক্তির জন্মই বৃথা। ধনীরা বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ধনদ্বারা নিরাপদ করিয়া আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হন। পরিবারদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করিয়া পরমানন্দে কালতিপাত করেন, এবং সমুদায় ধর্ম্মই তাঁহাদের আয়ত্তে থাকে। সুতরাং ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্বমস্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্যা, স্বতরাং রাজনন্দনের এই অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল মোনভাবে থাকিয়া বলিলেন, বন্ধো! পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানবকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যাদ্বারা সকল কাৰ্য্যই সাধিত হইতে পারে। অভাবনীয় ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাৰ্য্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। যে কাৰ্য্য বিদ্যাহীন লোক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও সমাধা করিতে পারে না, তাহা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সাধন করিয়া আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন। মিত্র! বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিতা চিত্তশূন্য সম্ভোগ করিতে পাবেন না। ধনীদিগের অগুণকরণ সর্বদাই অগ্রথ; কেননা তাহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

আপন সিদ্ধান্তের বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সংকোচ লোচনে বলিলেন, কি বৃথা তর্কবিতর্ক কবিতোছ? আমি চিরকালই জানি, তুমি আমার বাক্য খণ্ডন করিতে সাধ্যমতে ক্রটি কর না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে পৃথিবীর কেহই আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি নিস্তুক হও, ধনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। স্বমস্ত কহিলেন, যুবরাজ! অকারণ ক্রোধ করেন কেন? এ তর্কের মীমাংসা স্বদেশে হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশ উভয়েরই অপরিচিত এমন এক দেশে গমন করা যাউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধন দ্বারাই বা কি কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় এবং বিদ্যাদ্বারাই বা কি কর্ম সম্পন্ন হয়। রাজকুমার তাহাতে সন্মত হইলেন। অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল। সেই দিনই রাজনন্দন পশ্চিমাভিমুখে এবং ময়িনন্দন পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজনন্দন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বনপর্বাটনে প্রকৃত হইলেন। সপ্তাহকাল নিবিড় বন পর্বাটন করিয়া এক দিবস প্রভাতকালের প্রথমে ক্রমে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া জলাশয়েন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু চেষ্টাতেও

জলপ্রাপ্ত হইলেন না। একে মার্জিত করি, তাহাতে আবার অনেক পদ্যান্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে : ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! আমি আপন দোষে আপনি বিপদে পড়িয়াছি, ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী হইয়াছে, আর সহ হয় না। এই তৃষ্ণার্ত নরাদম সন্তানের প্রতি রূপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ জীবনদানে জীবন রক্ষা করুন। রাজপুত্র এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলাশয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দূর অতি কষ্টে গমন করিয়া হঠাৎ এক মনোহর উদ্যানমধ্যস্থিত একটি সুরমা সরোবর দৃষ্ট হইলে রাজকুমার তন্তুভাবে তাহার তটবর্তী হইলেন। রাজপুত্রের পিপাসা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি আব এক আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই জলাশয়ের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে করে অক্ষমালা ধারণ করিয়া নয়ন মুদ্রিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিল। যুবরাজ বক্ষি চক্ষে তাহাকে দর্শন করিতে করিতে সরোবরে অবরোহণ পূর্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদভ্রষ্ট একবিন্দু বারি কপিবেশধারী তপস্বীর গায়ে পতিত হইবামাত্র কপিদেহ পরিবর্তন হইয়া তাঁহার মনুজদেহ হইল। তখন তিনি অতি ভয়াবহ গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, ওরে নরাদম পাপিষ্ঠ, কে তুই? তুই কি জগৎ আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রতিকল প্রদান করিতেছি। রাজনন্দন স্কুমার তাঁহার তর্জনে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, হে তপস্বীশ্রেষ্ঠ! আমার অজ্ঞাতমারে বারিবিন্দু আপনার গাত্রে পতিত হইয়াছে। অতএব রূপা করিয়া আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু কষ্ট সহ করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। রাজতনয়ের এবভূত সাক্ষ্যের স্মৃতিবাক্যে তপস্বী ক্রোধ সঞ্চার করিয়া কহিলেন, তুমি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কি নিমিত্ত এই তরুণ বয়সে বনপর্যটনযন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য হইয়াছ? সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। রাজনন্দন আত্মবিবরণ আত্মোপাস্ত বর্ণন করিলেন। উদাসীন হাস্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ যৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। স্কুমার ক্লান্তাঙ্গলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া আপন করস্থিত অনুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন। কহিলেন, বৎস, এই অনুরীটি গ্রহণ কর। ইহার নিকট তুমি যখন যাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ

তাহা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তুমি এই অরণ্যানীর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিও, পশ্চিম প্রদেশে কদাচ গমন করিও না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। সুকুমার অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীর পদচূষন পূর্বক পুনরায় স্তব করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বিদায় করিয়া পূর্ববৎ বানরাকৃতি হইয়া আপন ইষ্ট দেবতাতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজনন্দন আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন।

পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর এই তিনদিক ভ্রমণ করিয়া রাজকুমার চিন্তা করিলেন, যোগী পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কি জন্ত নিষেধ করিলেন? পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল পশ্চিম দিকে কোন আশ্চর্য্য পদার্থ থাকিতে পারে, অতএব তাহা অবলোকন করা কর্তব্য। আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা কি আছে? তপস্বী-দত্ত অঙ্গুরীয়কের নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তাহাই পাইব। এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশেই গমন করা বিধেয়। এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পবিশেষে একটি অপূর্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রতা অভিনব বস্ত্র, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটীর প্রবেশদ্বারে একখণ্ড রুক্ষবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে, “এই রত্নপুর সাম্রাজ্যেশ্বরের দুহিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। যিনি উক্ত সাতদিন অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে পরাজুথ হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিতে হইবে।”

নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অল্প অল্প লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিক্রপী তপস্বী-দত্ত যে অমূল্যরত্ন আমার নিকটে আছে, তাহার সহায়তায় রাজকুমারীর অভীষ্ট সমুদায় অবলৌল্যক্রমে প্রদান করিতে পারিব, অতএব রাজদুহিতার পাণিপীড়নে যে আমি সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ কল্পনাধবর্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্তী ডঙ্কাধনি করিলেন।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দনের হস্তধারণ-

পূর্বক নৃপতিসন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল। রাজা যথোচিত সমাদরে নিকটবর্তী অপূর্ব আসন গ্রহণ করিতে অমুমতি করিলেন। রাজনন্দন ভূপতিকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃপতি যুবরাজের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অনঙ্গত করিয়াছেন, কিন্তু আমার কণ্ঠা কি দুর্ভাগ্যবতী, এইরূপ স্বকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসর্বস্ব হরণপূর্বক ইহাকে বিপদে পাতিত করিবে। যাহা হউক, এই উৎসাহোন্মত্ত যুবককে স বিশেষ অবগত করাইয়া পূর্বেই সতর্ক করা আমার কর্তব্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি স্নানবদনে মুছ সন্মোদনে কহিলেন, বৎস! তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমার অত্মভব হইতেছে, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত বংশ বা রাজকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, দেশ পর্যাটন ব্যতীত তোমার অণু কোন অভিসন্ধি ছিল এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া উদ্ধাধ্বনি করাতে ইচ্ছা করিয়া বিপদহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। কতশত রাজপুত্র অসংখ্য ধনরত্ন ও বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু প্রদান করিয়াও আমার অঙ্গজার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই। বিবাহ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করা দূরে থাকুক, কারাগারে চিরকষ্ট ভোগ কবিতেন। আপনার সহিত ধনজন কিছুমাত্র দেখিতেছি না। কি প্রকারে রাজকণ্ঠার মনোবঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বৎস! আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, ইচ্ছা করিয়া অনলে অঙ্গ বিসর্জন করিও না। স্ত্রীরত্নলাভলালসা পরিত্যাগ কর। আমার দুহিতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তখন আমার রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। যুবরাজ নৃপতির বাক্য শুনিয়া মনে মনে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এখন উপায় কি করি। নৃপদুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে, স্বতরাং চিত্তবারণ ধৈর্য্যাক্ষুশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্বিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা সরোবরে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অমৃতময় উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; তথাচ এই নিবেদন করিতেছি, আমি যাতনা সহ্য করিয়া যখন এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তখন অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে পারিব না বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিব না। যাহা ভবিতব্যে লিখিত আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি আপনার তত্ত্বজ্ঞার মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আমার সহিত ধনরত্ন ও রথ গজ নাই।

বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যেহেতু সকল মনুষ্য একভাবে নহে। আমি যে একাকী এই অপরিচিত দূরদেশে আসিয়া শতশত রাজপুত্র যে কার্য সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা সিদ্ধ করিতে সাহস প্রকাশ করিতেছি, ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনার দুহিতার নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাঁহার কি বাঞ্ছা, জানিতে পারিলেই অবিলম্বে পূর্ণ করিব। রাজা স্কুমারের এই সাহসের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহলাদে গদগদচিহ্ন হইয়া সভাসদদিগকে বলিলেন, ইহার সাহস দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অনায়াসে রাজকন্യാ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে কন্্যাব নিকটে ইহাকে প্রেরণ করা কর্তব্য। এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন।

তুপতি রাজনন্দন স্কুমারকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া ভোজনাদি করাইলেন এবং তাহার বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিরূপিত করিয়া দিলেন। রাজনন্দন তথায় বিশ্রাম-স্বাস্থ্যভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে! অগতঃ তরুণবয়স্ একটি রাজপুত্র তোমার হৃদয়নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় রূপবান। তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়ানুধি আনন্দে উহেল হইয়া উঠে। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সহিত ধনজন মাত্র নাই, তথাচ তিনি কন্্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অভূতপূর্ব সাহস প্রকাশ করিতেছেন। তুমি কন্্যাকে সংবাদ প্রদান কর, আমি রাজকুমারকে এই স্থানে আনয়ন করিতেছি।

রাজকন্্যা স্কুমারের আগমনবার্তা পূর্বেই অবগত হইয়া সহচরী সমভিব্যাহারে তাঁহার গর্ষ খর্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এক রাজপুত্র উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ তাঁহাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিতেছেন, এখন তুমি কি করিবে স্থির কর। মহিষীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই একজন কিস্করী আসিয়া বলিল, ঠাকুরানি! মহারাজ সেই রাজপুত্রের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণে রানী কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা দুহিতার প্রকোষ্ঠে স্কুমারের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজনন্দিনী, যুবরাজ স্কুমারকে দর্শন করিবামাত্র সগর্বে স্বীয় সহচরীকে সঙ্গীত করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা

করি। রাজনন্দন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজনির্দিষ্ট স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং করস্থিত অঙ্গুবীরকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, অঙ্গুবীরক ! রাজকন্টার অভিলষিত মুদ্রা প্রদানে আগাকে কৃতার্থ কর। নিমেষকালমধ্যে মুদ্রা উপস্থিত হইল। তখন নৃপনন্দন বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া রাজনন্দিণীর সহচরীর করে অর্পণ করিলেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে যুবরাজের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, এই ব্যক্তি রাজকন্টার সম্পূর্ণ বাজা পূর্ণ করিয়া নিঃসন্দেহ পানি গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস বাজা পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান সহকারে রাজপুত্রকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমারী অত আবার কি প্রার্থনা করেন, এই চিন্তায় রাজকুমারেব অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। অঙ্গুবীরকের অলৌকিক গুণ শ্রবণ হওয়াতে পুনর্বার মনোঃসংযোগপূর্বক ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। বজ্রনীযোগে রাজকন্টা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মূর সন্মোদনে বলিলেন, যুবরাজ ! কল্যা আপনি এ দাসীর অভিলষিত অর্থ প্রদানে চরিতার্থ করিয়াছেন, অতঃপর প্রকাশ করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করুন। রাজপুত্র শ্রবণমাত্র পূর্ববৎ উপায়াবলম্বন করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। এই রূপে চতুর্থ দিবস তাঁহার বাজা পূর্ণ করিয়া নৃপনন্দনের অন্তঃকরণে কৃতকার্য্যেব আশা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। রাজনন্দিণী কি কৌশলে রাজপুত্রকে প্রতিজ্ঞাজালে বদ্ধ করিবেন, একান্তমনে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; সখীকে কহিলেন, সহচরি ! আর তিন দিবস প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেই আমার গর্ভ সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হইবে, স্নতরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হইবেন, তাহা বলা বাজল্য। অতএব যাহাতে মান রক্ষা হয়, এক্ষণ উপায় কর। এই আগন্তুক যুবাণ্ডক্যদের সহিত কোনরূপ অর্থ থাকা দূরে থাকুক, দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্রও নাই। অতএব ইনি কোথা হইতে আমার অভিলষিত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। বোধহয়, ইহার নিকট কোনরূপ দুর্লভ বস্তু আছে, তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। রাজকন্টার চতুর্থ সহচরী এই বাক্য শ্রবণে

সতর্ক হইয়া তদ্বাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। স্বকুমার নৃপতিসম্মিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এই অবকাশে রাজকন্য়ার সহচরী স্বকুমারের নিদ্দিষ্ট বাসস্থানে এক্রপ কৌশলে আত্মগোপন করিল যে, সমুদায় দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

রাজদুহিতা স্বকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, রাজপুত্র! গজমুক্তা হাব পরিধান করিতে আমাব একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি একশত মুক্তা প্রদান করিয়া বাঞ্ছাপূর্ণ করুন। রাজনন্দন অবিলম্বে শয়নালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্বারাবরোধ পূর্বক করস্থ অঙ্গুবীয়কে বলিলেন, প্রিয় অঙ্গুরি! অগ্ন রাজকন্যাব বাসনা পূর্ণ কর। এই কথা বলিবামাত্র একশত গজমুক্তা নিকটস্থ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া স্বয়ং রাজকুমারীর সম্মিধানে প্রফুল্লান্তঃকবণে উপস্থিত হইলেন।

চতুরা সহচরী গোপনভাবে থাকিয়া সমুদায় অবলোকন পূর্বক বিস্মিতান্তঃকরণে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৃপনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইল। যুবরাজ কন্যার প্রার্থিত গজমুক্তা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কবিলে সহচরী রাজকন্যার সম্মুখবর্তিনী হইয়া সমুদায় বর্ণন করিল। নৃপস্বতা ভূনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, সখি! আমি যাহা চাহিব, নৃপনন্দন তাহাই অনায়াসে প্রদান করিবেন, স্ততরাং আব দুই দিবস পরে আমারে তাঁহার ক্রোড়গামিনী হইতে হইবে। আমি যে, এত রাজপুত্রকে কৌশল চক্রে বদ্ধ করিয়াছি, বোধহয়, তাহার প্রতিশোধ লইতেই এই মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। অতএব এখন উপায় কি করি, স্থির কর।

সখী দ্রষ্টব্য হাশ্ব করিয়া কহিল, রাজনন্দিনী! চিন্তা কি? যখন অঙ্গুরীয়কের সন্ধান পাইয়াছি, তখনই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আর চিন্তা নাই। আপনি রাজকুমারের নিকট তাঁহার করাস্থিত অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিবেন। তাহাতে দুই প্রকারেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে। কেননা যদি রাজনন্দন অঙ্গুরীয়ক প্রদানে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও তিনি আপন প্রার্থিত বস্ত্র প্রদানে অক্ষম হইলেন এবং যদি প্রদান করেন, তবে আপনি পরদিন যাহা প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গুরী না থাকিলে তিনি কখনই তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সর্বথা আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। রাজতনয়া এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, যুবককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,

রাজকুমার! অত্ন আমি একটি মানিক্যাজুরী প্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য নির্বোধ রাজকুমার অঙ্গুরীয়কের নিকট মানিক্যাজুরী যাচঞা না করিয়া আপন অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটি তৎক্ষণাৎ স্থায়ী হস্তে অর্পণ করিলেন। সহস্রী রাজতনয়াকে অঙ্গুবী প্রদান করিয়া বলিল, আপনার বাঙ্গ সিদ্ধি হইল, আর চিন্তা কি? নৃপতনয়া সহস্র বদনে অঙ্গুরী পরিধান করিলেন।

বাজপুত্র বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া রাজকন্তা সন্তুষ্ট হইয়াছেন; বোধহয় অত্ন কোন বস্তু আর প্রার্থনা করিবেন না। এই সময় দিননাথ অন্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতি পুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্বোধ রাজপুত্র দুঃখাশার বশবর্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মূহমূহঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেননা তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, প্রভাতেই রাজকন্তার পানিগ্রহণে সুখী হইবেন। শশিসীমন্তিনী যামিনী বাজপুত্রের ভাবী দুঃখ দুঃখিনী হইয়া গমনসময়ে বিহগকুলের কলরবই যেন ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কমলমুখী রাজকন্তার শুভোদদেশেই যেন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। তদর্শনেই যে তিনি প্রফুল্ল হইলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রাতঃকালেই রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অত্ন আমার কি শুভদিন! এত দিনের পরে বুদ্ধি জগদীশ্বর আমাব প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা কখনই সংঘটিত হইবে না মনে ছিল, অত্ন তাহাবই সংঘটনের লক্ষ্য সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। কতগত রাজপুত্র আমার দুহিতার মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন। স্বকুমার ষষ্ঠ দিবস তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। অত্ন সপ্তম দিবস। বোধ হয়, ঈশ্বরের রূপায় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। সভাসদেরা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজকুমারের লক্ষ্য দেখিয়া বোধহয়, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি যে, অত্ন আপনার দুহিতার অভিলষিত দ্রব্য দানে তদীয় পানিপীড়ন করিবেন, তাহাতে সংশয় হইতেছে না।

ওদিকে রাজপুত্রী নৃপপুত্রকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনার সৌজ্ঞ্য ও বুদ্ধিকৌশলে যাবৎপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। অত্ন আমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন। আর একটি

মাণিক্যাজুরীয়ক প্রার্থনা করিতেছি। রাজকুমারী এই প্রার্থনা করিলাম। যুবরাজের মস্তকে যেন বজ্র পতিত হইল। তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাজপুত্রীর প্রার্থিত অঙ্গুরী কোথায় পাইবেন? তপস্বী-দত্ত অমূল্য অঙ্গুরী আর নিকটে নাই। স্তবরাং রাজকন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

রাজনন্দন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নির্জনে আশ্রয় করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা বন্ধো! তুমি কোথায়? আমি যে বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি, তুমি ইহা কিছুই জানিতে পারিতেছ না। তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম! কোথায় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বধাময় প্রণয়স্বধাপানে পিপাসিত চিত্তচকোবকে পরিতৃপ্ত করিব, না কোথায় চিবকালেব নিমিত্ত কাবাগারবাসী হইতে চলিলাম।

হা মৃত্যু! কাবাগারে প্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি কেন আমাকে গ্রহণ করিতেছ না? পৃথিবী! তুমি বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। তাহা হইলে জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারিবে না। হায়! আমি কি নির্কোষ! লোভ আমার সর্বনাশ করিল। যদি লোভ না করিয়া বুদ্ধির অনুগত হইতাম, তাহা হইলে দুর্দশা আমার সহচরী হইত না। আমি করস্ব অমূল্য অঙ্গুরীয়ক রাজকুমারীকে কেন প্রদান করিলাম? কেন আমি অঙ্গুরীয়কের নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করিলাম না? তাহা হইলে অতীত রাজপুত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতাম। এখন কি করিব? নিজ বুদ্ধিদোষে নিজ মস্তকে আপদকে স্থানদান করিলাম। হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা কোথায়? হা! কেন আমি পিতামাতাকে স্মরণ করিতেছি! নির্কোষ পুত্র যে পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম, সে কখনও তাহাদিগকে স্মরণ করিবার পাত্র নহে। আমি নির্কোষ, আমার তুল্য নরাধম জগতে নাই।

স্বকুমার এইরূপে খেদ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রভাকর যেন তাঁহার দুঃখেই দুঃখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল। রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। এই সময়ে রাজকন্যা স্বীয় সহচরীদিগকে

বলিলেন, রাজপুত্র অনেকক্ষণ গমন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলেন না, তিনি অকৃতকার্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। রজনীপ্রভাতে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক।

স্বকুমার সমস্ত রজনী চিন্তা-শয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার স্বকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল। নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুপ্তায়িত হইলেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীরা যেন সেই কথা বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল। স্বকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তারপূর্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মুখচন্দ্রমা ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল।

রাজতনয়া রজনীপ্রভাতে সহচরীদিগকে বলিলেন, কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, রাজপুত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, অতএব তিনি তাঁহার কর্তব্যাকর্ম সমাধা করুন। সহচরী নৃপকুমারীর আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। কারাধ্যক্ষও স্বকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নৃপতি সেই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার দুহিতার মনোমত পাত্র পৃথিবীতে আর নাই। রাজনন্দন ছয় দিবস তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে ভাবিয়াছিলাম, সপ্তম দিবসেও তিনি কৃতকার্য হইবেন। কিন্তু সে আশা বৃথা হইল। তাদৃশ গুণাকর রাজকুমার যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অত্র কেহ যে, জয়ী হইবেন, তাহার ভরসা ফুরাইল। বোধহয়, রাজপুত্রীকে চিরকাল অনুচাবস্থায় থাকিতে হইবে। অতএব এটি তাহার প্রতিজ্ঞা নহে, বিধাতার বিড়ম্বনা। রাজা এইরূপ মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া নিশ্চল হইলেন। যুবরাজ কারাগারে নিষ্কিন্ত হইয়া অশেষ যত্নগা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়! রাজকুমার স্বকুমার রত্নপুত্রের কারাগারে থাকুক, আশুন, আমরা মন্ত্রিপুত্র স্বয়ম্ভের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায়? আশুন দেখিতে পাইবেন। স্বরণ থাকিতে পারে, মন্ত্রিতনয় পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া যে স্থানে তপস্বী কপিরূপ ধারণ করিয়া তপস্তা করিতেছেন,

সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। কপিবর মনুষ্যের ত্রায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর হস্তস্থলিত জলকণা কপিতপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি সেই বারিস্পর্শে কদাকার মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কে রে পাপিষ্ঠ! অকারণে আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? মন্ত্ৰিপুত্র এক আশ্চর্য্য হইতে অপর আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর যোগিবরের পদানত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমি বিদেশী, অজ্ঞাতসাবে এই কুকর্ম্ম কবিয়াছি, আপনি ক্ষমা করিয়া ক্ষমা না করিলে উপায়ান্তর নাই। তপস্বী তাঁহার বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ভয়, নাই, অজ্ঞানরূত অপরাধ ক্ষমা করিবাম। মন্ত্ৰিনন্দন আগন্তু হইয়া সবিনয়ে তপস্বীকে অনেক স্তব কবিলেন। তাহাতে তিনি সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, যে প্রকার শরীর ও প্রকৃতি ধারণ কবিতে ইচ্ছা কবিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাই হইবে। মন্ত্ৰিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্বক গমনোন্মুখ হইলেন। তপস্বী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি অত্র কয়েক দিকে ভ্রমণ করিও, কিন্তু কদাচ পশ্চিম প্রদেশে গমন কবিও না। তথায় অনিবার্য্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্ৰিপুত্রকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া তপস্বী পুনর্ব্বার সরোবরের পার্শ্বস্থ ঘাটে অবগাহন করিয়া কপিকলেবর ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন।

মন্ত্ৰিনন্দন স্মমস্ত, সরোবরের যে প্রান্তের জল স্পর্শে কপিক্রপী তপস্বী মানবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার যে প্রান্তের জলে অবগাহন করিয়া কপিক্রপ ধারণ করেন, তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন, এবং ঐ দুই স্থানের জল ভিন্ন ভিন্ন আধারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তপস্বী আমাকে পশ্চিম ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বোধ হয়, তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু থাকিতে পারে। তাহা দর্শন করা আবশ্যক। যদি নিতান্ত বিপদ ঘটে, তবে তপস্বী-দত্ত বরপ্রভাবে বুদ্ধির সহায়তায় অবশ্যই পরিত্রাণ পাইব। এই চিন্তা করিয়া আগে পশ্চিম দিকেই চলিলেন। কিয়দূর গমন করিয়া তপস্বী-দত্ত বর পরীক্ষার্থ অস্তঃকরণে ঘোড়শী রূপসী দিব্যাঙ্গনার রূপ চিন্তা করিবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর তদ্রূপ হইল। তদৃষ্টে

তিনি একবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। নারীরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করা অসুচিত বিবেচনায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গমনানন্তর রত্নপুবে উপস্থিত হইলেন। নগরের শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি হইল। স্মতরাং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজধানী ভ্রমণ করিতে চলিলেন। সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, নির্মল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তুতফলকে স্বর্ণবর্ণে রাজকন্টার প্রতিজ্ঞা বিবরণ পূর্ব্ববৎ লিখিত আছে। তাহার সম্মুখে ঘণ্টা দোঁলুয়মান রহিয়াছে। গ্রহরিগণ নিঃশব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মস্ত্রিনন্দন দেখিবামাত্র বুদ্ধিতে পাবিলেন, যে ব্যক্তি রাজকন্টার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হয়, সে এই ঘণ্টা বাদন দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করে। যাহা হউক, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করা অসুচিত। কাণে ইহাতে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনপথে একটি বকুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। মস্ত্রিপুত্র উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজবাগী হইতে কুন্তকক্ষে কতিপয় পরিচারিকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষেব অন্তরালে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে বলিল, “রাজকন্টা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কখন যে, পূর্ণ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। রাজনন্দন সুকুমার, তাঁহার প্রতিজ্ঞাত প্রার্থনা ছয় দিবস পূর্ণ করিয়াছিলেন। একদিন অসমর্থ হওয়াতে কল্যা কাবাগাবে নিষ্কিন্তু হইয়াছেন। তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদৌর্ণ হইতেছে।” এই কথা বলিবামাত্র মস্ত্রিপুত্রের দিকে দৃষ্টি নিষ্কিন্তু হওয়াতে তাহারা কথোপকথনে বিরত হইয়া জন আনয়নার্থে প্রস্থান করিল। তৎপ্রবণে মস্ত্রিপুত্র চিন্তা করিলেন, ইহারা রাজপুত্র সুকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। বোধহয় ঐ সুকুমার আমার বন্ধু হইবেন। যাহা হউক, রমণীগণ ফিরিয়া আসিলে, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

পরিচারিকাগণ জনপূর্ণ কুন্ত কক্ষে করিয়া প্রত্যাগত হইলে মস্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমরা এই রাজবাটীর পরিচারিকা হইবে। যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমার কয়েকটি বাক্যের উত্তর দান করিলে, উপকৃত হই। এ রাজ্যের রাজার নাম কি? এবং সিংহদ্বারে একটি বৃহৎ ঘণ্টাই বা ঝুলিতেছে কেন? একটি কিস্করী উত্তর

করিল, মহাশয় আমাদের রাজার নাম রত্নধ্বজ, তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন। সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সন্ততি। রাজা ও রানী সেই কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্নবতী। আপনি যে বৃহৎ ঘন্টাব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজকুমারীর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞাই সেই ঘন্টা বুলাইবার কারণ। কিন্তু সে কথা এক্ষণে বলিবার সময় নয়। আমরা রাজকন্যার পরিচারিকা। প্রতিদিন তাঁহার স্নানার্থ জল আহরণ করিয়া থাকি। যে জল আমাদের কক্ষে দেখিতেছেন, তাহা দ্বারা পাষণনির্মিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অত্যন্ত পূর্ণ করিয়া রাখিব, কলা নৃপনন্দিনী ইহাতে স্নান করিবেন, অতএব অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন, তবে পুনরায় আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মন্ত্রিপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহার বাজকন্যার পরিচারিকা, ইহাদিগের নিকট বাজপুত্রীর অনেক সংবাদ পাইতে পারিব।

পরিচারিকাগণ পুনরায় জল লইতে আসিলে মন্ত্রিপুত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছিলে তাহার বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি। পূর্বপরিচিতা পরিচারিকা বলিল, মহাশয়! আমাদের রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি সাতদিন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। তাঁহার ক্লেশগুণের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে কতগত রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, কেহ এক কেহ দুই বা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া পরিশেষে অসমর্থ হওয়াতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সম্ভ্রুতি যে একটি রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার সমবয়স্ক এবং পরম ক্লেশবান। সেই রাজপুত্র অসাধারণ গুণে ছয় দিবস রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া গতকল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত এ রাজ্যের সকলেই কাতর হইয়াছেন। সেই রাজপুত্রের নাম স্কুমার। এইরূপ পরিচয় দিয়া কিস্করী স্মরণকে সোধেধন পূর্বক কহিল, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনিও বিদেশী পণ্ডিত, আমরা আপনার রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নিষেধ করিতেছি, কখনো জলপুত্র অনলে প্রবেশ করিবেন না। বোধহয় কাৰ্য্যান্তরে বিদেশ পরিভ্রমণ ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, কাৰ্য্য সমাপন করিয়া অবিলম্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, তোমাদিগের সদুপদেশে নিতান্ত স্বখী হইলাম।

কিষ্করীরা জলানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল। মন্দিপুত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন! বন্ধু তবে এই রমণীর মোহিনীপাশে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিষ্কিন্তু হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আরও অনেক রাজপুত্র সেই কুটয়শ্বে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করা আমার নিতান্ত কর্তব্য। তন্নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, পরোপকারে মৃতব্যক্তির জীবন সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে কোন উপায় স্থির করিলেন। এই সময়ে পরিচারিকাগণ বারি-পূর্ণ ঘটকক্ষে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পথিক! কি চিন্তা করিতেছ? স্তম্ভ বলিলেন, অনেকক্ষণ ভ্রমণ করাতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জল দাও, তবে নিতান্ত উপকৃত হই। পরিচারিকাগণ বলিল, পাত্র বাহির করুন, জল প্রদান করিতেছি। পথিক বলিলেন, আমার নিকট পাত্র নাই, পরিচারিকাগণ বলিল, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, পাত্র আনিয়া জল প্রদান করিব। পথিক বলিলেন, বিলম্ব সহ্য না। পরিচারিকারা বলিল, তবে উপায়? পথিক বলিলেন, আমি অঞ্জলি পাতিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া কুন্ত হইতে প্রদান কর। তাহারা স্বীকৃত হইল। মন্দিপুত্র জলপান করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে যে বারিস্পর্শে মনুগ্রাশরীর কপি হয়, সেই বারি কোশলক্রমে কলসীর জলে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পরিচারিকাগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না; স্বতরাং প্রফুল্লচিত্তে রাজবাটিতে গমন করিল এবং রাজপুত্রীর স্বানার্থ সেই জল রাখিয়া দিল।

পাঠকগণ! বোধ করি রাজকন্য়ার দুর্ব্বস্থার বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছেন। আমরাও তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বারি দ্বারা স্নানাগারস্থ কৃত্রিম হৃদ পরিপূর্ণ করিয়া পরিচারিকাগণ স্বানার্থ নৃপনন্দিনীকে আহ্বান করিল। তিনি অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। সেই জলে অবতরণ করিবামাত্র তিনি কপিকায়ী প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত একটি বানরী হইলেন। রাজকুমারী আপনার অঙ্গ আপনি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহচরীগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে সেই জলে অবতরণ করিল, অমনি তাহারাও তৎক্ষণাৎ বানরী হইয়া রাজকন্য়ার সঙ্গিনী হইল। চতুরা নাম্নী দাসী স্বচক্ষে এই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে চমৎকৃত হইয়াছিল, পরে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল যে কৃত্রিম হৃদস্থ জলের

গুণেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অতএব সে জন স্পর্শ না করিয়া দ্রুত-পদে রাজমহিষীকে সংবাদ দিতে চলিল, এবং অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে কাতর বচনে বলিল, ঠাকুরানি! সর্বনাশ উপস্থিত। রাজনন্দিনী স্নানার্থ কৃত্রিম হৃদয় বারিস্পর্শ করিবা মাত্র বানরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন। রানী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন হৃদের নিকটবর্তিনী হইয়া দুহিতার দুঃখস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন শোকে হতজ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং শিবে কবাঘাত করিতে করিতে কণ্ঠকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন হৃদমধ্যে অবতরণ করিলেন, আপনিও একটি বৃদ্ধা বানবী হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! চতুর্দিক বানবীময় হইয়া উঠিল!

রাজা সভামণ্ডপে বসিগা অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিচার করিতেছেন, এমন সময় চতুরা দাসী রোদন-বদনে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, ধর্মাবতাব! ওদিকে সর্বনাশ উপস্থিত। রাজমহিষী, রাজকন্যা, এবং তাঁহার সখীগণ সকলেই বানবী হইয়াছেন। পুত্রমধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরীদলে পরিপূর্ণ। মহারাজ! শীঘ্র চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় করিবেন। রাজা এই পবমাম্বল্য অদ্ভুতোক্তি শ্রবণমাত্র নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল পরে দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চতুরে! তুমি কি বলিতেছ? তোমার একপ ভাব কেন হইল? বুদ্ধি স্থির কর। চতুরা পুনরায় করপুটে বলিল, মহারাজ! আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মহারাজের নয়নগোচর হইলেই সত্যাসত্য প্রকাশ হইবে।

রাজা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে কণ্ঠাস্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। পুত্রী যেন জনশূন্য বিজনবনসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। যে রাজপুত্রী সর্বদা আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণিত হইত, এইক্ষণে সেই পুত্রীতে অনিবার বানরধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে! ভূপতি ক্রমে ক্রমে দাসী সমভিব্যাহারে রাজকন্যার অবগাহনস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকনান্তর এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন। যেন তিনি কি অবনৌমণ্ডলে, কি শূন্য মার্গে, কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। মহিষীবানরী মহারাজকে দর্শন করিয়া নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ সেই বিপত্ত্যারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে

লাগিলেন। হে ভগবন্! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমার কি গুরুপাপে সমস্ত পুরবাসিনী বানরী হইল। আমি কিরূপে সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইব? এইক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে কাল! কেন তুমি তোমার করালগ্রাসে আমাকে কবলিত করিতেছ না? আমার প্রতি তোমার কি এমনই ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, পরিবাবগণের এই দুর্দশা দর্শনেও জীবিত বহিয়াছি। রাজা এবস্ত্রকাবে আক্ষেপ করিয়া সভাস্থ জনগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সভাগণ মহারাজের মুখশ্রী বিবর্ণ দেখিয়া চতুর্দিকে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বিজ্ঞমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! দাসী যাহা বলিয়া গেল, বোধকরি, তাহা অসত্য নহে। নৃপতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুলোচনে গদগদ স্ববে কহিলেন, মস্ত্রিবর! জগদীশ্বর নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। দাসীর বাক্য সকলই সত্য,—যাহা আমি কখন স্বপ্নেও জ্ঞানি না এবং কাহারও মুখে শুনি নাই, অতএব তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। কথাস্তঃপুরীস্থ সমস্ত রমণীই বানরী হইয়াছে। বোধকরি, এবস্ত্রত আশ্চর্য্য ঘটনা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কেহ কখনও নয়ন-গোচর কবা দূবে থাকুক, শ্রবণও করে নাই। এক্ষণে কি কর্তব্য, স্থির করিয়া এ অসীম বিপদমাগর হইতে আমাবে উদ্ধার করুন।

মন্ত্রী মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভূপতিও নিজাসনে স্তানবদনে উপবিষ্ট হইয়া কি কর্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে স্তমস্ত স্বকায্য সাধন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি অতি প্রাচীন গণক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করি। পরমেশ্বরের রূপায় এবং তপস্বিবরের বরপ্রভাবে স্তমস্ত তৎক্ষণাৎ অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হইক, বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কহিলেন, মহারাজ! আপনার বড় অমঙ্গল উপস্থিত দেখিতেছি। রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে গলবন্ত হইয়া বলিলেন, ঠাকুর! কি অমঙ্গল দেখিতেছেন অতঃপর করিয়া বলুন। স্তমস্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার অমঙ্গলের কথা আর কি বলিব, জ্যোতিষে গণিয়া দেখিলাম, অস্তঃপুরের সমস্ত কামিনী বানরী হইয়াছে। আপনার পাপের সীমা নাই। জগদীশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য! উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার। আহা, কেবল অধর্ম্মা-চরণেই না একরূপ বিরূপ দশা ঘটিল। সভাস্থ সমস্ত সভ্য ব্রাহ্মণের এই আশ্চর্য্য

তাবী গণমা শ্রবণে যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাহা প্রিয় পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

রাজা কৃতাজ্জলিপুটে কাতর বচনে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর! আমার এ পাপ কিসে মোচন হইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! এ ত যৎসামান্য পাপ নহে যে, ব্রাহ্মণতোজন এবং দান-ধ্যান করিলেই বিমোচন হইবে; এ গুরুতর পাপ, সহজে মোচন হইবার নয়। রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! এমন গুরুপাপ কিসে সংঘটিত হইল? গণক ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার দোষে এ পাপ জন্মে নাই, আপনার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। আপনিই বিবেচনা করুন, রাজকন্টার পাণিগ্রহণাশে কতশত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান আগমন করিয়াছিলেন। কন্ডাব মোহিনী মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সকলেই সমস্ত ধনে জ্বালাগুলি দিয়া চিরকাবাগাবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আহা! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিবাহ-আশে প্রথমে ধনসম্পত্তি বিনাশ, শেষে জীবনাশে নিরাশ। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তোমার যথার্থ বিচার। মহারাজ! বিবেচনা করুন, এ কি সামান্য পাপ।

মহারাজ! আপনিই বিবেচনা করুন, কারাস্থ যুবকগণের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে এবং তাহাদের পিতামাতার অন্তঃকরণেই বা কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। রাজা ও অমাত্যবর্গ স্তম্ভের এই সমুচিত বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সভাস্থ সভ্যগণ স্তম্ভের নিকট গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! এখন উপায় কি দেখিতেছ, আপনি ভিন্ন এখন আর কেহই এ বিপদ হইতে রক্ষাকর্ত্তা নাই। স্বেচ্ছায় স্তম্ভ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ পাপ সহজে বিমোচন হইবার নহে, আমার সাধ্য নাই যে মহারাজকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করি। তবে কল্যা মহারাজের বহির্দ্বারস্থ সরোবরতটে এক সন্ন্যাসী আগমন করিবেন, তিনি যত্বপি সদয় হন, তাহা হইলেই উদ্ধারের উপায় হয়।

স্তম্ভের মুখে এতদ্বিবরণ শ্রবণে রাজা কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন, দ্বিজবর! সন্ন্যাসীর আগমন পর্য্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করিলে উপকৃত হই। স্তম্ভ বলিলেন, মহারাজ! আমি দ্রব্রত ব্রাহ্মণ, একস্থানে দুদিন থাকিলে চলে না। ভগবানের কৃপায় আপনি বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন। পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে।

রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর ! আমাকে হতাশ করিবেন না । স্মস্ত মহারাজকে অশেষপ্রকার প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া গমনে উদ্ধৃত হইলেন । রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্বক আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর ।

স্মস্ত কহিলেন, মহারাজ ! স্বর্ণমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাম্রমুদ্রাও গ্রহণ করিব না । যখন এ দারুণ বিপদ হইতে মুক্তিনাভ করিবেন, সে সময়ে অহুগ্রহ করিয়া যাহা প্রদান করেন, শিরোধার্য করিয়া লইব । স্মস্তের এক্রপ সৌজা দর্শন করিয়া সভাস্থ সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহার অগণ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষেপ করেন, আবার তিনিই তাহার মুক্তিপথ প্রকাশ করিয়া দেন । বিবেচনা করন, এই ব্রাহ্মণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া অব্যক্ত সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিলেন । অতএব তিনি যে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে । মহারাজ ! ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন ।

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল । নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোবঞ্জন করিতে করিতে পূর্বদিক হইতে উদ্ভিত হইলেন । ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন । নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জগুও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না । দুঃখের রজনী এত দীর্ঘ যে, কোনমতেই অবসান হইতে চাহে না, মহারাজ ক্ষণে ক্ষণে নিদ্ভিষ্ট নক্ষত্র দর্শন করিয়া নিশার শেষ বিবেচনা করেন । কিন্তু মন কোনরূপেই স্থস্থির থাকে না । একবার বোধ করেন যেন, তমোনাশিনী উষা পূর্বদিক হইতে আগমন করিল, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না । একবার বিবেচনা হয় যেন, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া স্মধুরস্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিয়া উঠিল । আবার ক্ষণকালের পরে সেভাবের কিছু থাকে না । রাজা এইরূপে চঞ্চল হইতেছেন, এমন সময়ে বিহগনিচয় দিনপতির আগমনবার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল । ভূপতি বিহঙ্গমুখে এতদ্বার্তা শ্রবণে মহাহর্ষচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, আর বিলম্বে কাজ নাই ; রজনী শেষ হইল । ইহাদের মুক্তির চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য । এদিকে নিশাপতি আগমনকাল নিকটবর্তী জানিয়া চাকরবর্গ লুকায়িত করিতে লাগিলেন । আগমনকাল নিকটবর্তী বটে, কিন্তু এ আগমন কাহার ? দিনপতির ?

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কাস্ত-বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।

ওদিকে স্তমস্ত সরোবরতীরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই শুভ অবসর উপস্থিত, এই সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারের উপায় করা কর্তব্য। ইহা স্থির করিয়া একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্বিদণ্ড বরপ্রভাবে জগদীশ্বরপ্রসাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর রূপ আবির্ভূত হইল। জটা, বন্ধল, শ্মশ্রু, জপমালা, কমণ্ডলু প্রভৃতি যোগিযোগ্য আভরণ সমস্ত, যেন শূন্য হইতে উপহাব দিলেন। যোগিক্রপী স্তমস্ত নবীনবেশে সরোবর-সোপানে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজসভাপণ্ডিতগণ বাজনিয়োগান্ত্রসাবে অতিসত্বরে সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। গমনমাত্রই ধ্যানোপবিষ্ট যোগিবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সবিস্ময়লোচনে সন্ন্যাসীরে নিবীক্ষণ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মায়াক্রপী সন্ন্যাসী মায়াধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া স্বাগত প্রশংসার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমরা? কি নিমিত্ত, কি অভিলাষে কৃতাজলিপুটে আমার নিকট দণ্ডায়মান আছ?

পণ্ডিতেরা একবাক্য হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমাদের অন্তরের বাক্য কি আপনার অন্তরে অবিস্তৃত আছে? এই নগরস্থ মহারাজ অসীম বিপদমাগরে নিপতিত হইয়াছেন, আপনি অন্ত্রগ্রহ প্রকাশ করিয়া একবার বাজবাটীতে পদার্পণ করিলেই বাজপুরী পবিত্র হয় এবং মহারাজও বিপদমুক্ত হন। সন্ন্যাসিক্রপী স্তমস্ত উত্তর করিলেন, আমি একরূপ ক্ষমতাবান নহি যে, তোমাদের রাজাকে ঐ ভয়ঙ্কর বিপদমাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারি।

এদিকে ভূপতি সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র স্বয়ং সরোবরতীরে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে করযোড়ে কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার চরণে স্রবণ লইয়াছি। সন্ন্যাসী মহারাজের কাতরতা ও দীনতা দর্শনে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণস্বরে কহিলেন, রাজন্! তোমার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। সেই পাপীয়সীর পাপেই একরূপ ঘটনা হইয়াছে। সেই দুষ্টার ছলনায় কতশত রাজপুত্র কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। রাজা পুনরায় কাতরতা প্রকাশ করাতে সন্ন্যাসী তৎসমভিব্যাহারে রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা নিজেই স্বর্ণময় সিংহাসন আনয়নপূর্বক সন্ন্যাসীকে উপবেশন

কবিত্তে দিলেন। সভাস্থ সভাগণ সন্ন্যাসীকে অর্ধচন্দ্রবৎ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পবে সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! কত দেশেব কত যুবরাজ তোমার কন্ঠার পাণিগ্রহণ-আশায় আগমন করিয়া তাহার মোহিনী মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কত অর্থ অপহরণ করিয়াছ, এ কি সামান্য পাপ! প্রথমতঃ ঐ সকল অবরুদ্ধ রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ দান কর, তাহার পর অন্য উপায় হইবে। নতুবা যাবজ্জীবন এই ঘোরতর বিপদাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ন্যাসীব সম্মুখেই রাজা কারাগারস্থ যুবরাজগণের নামধাম পরিচয় দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব অর্থের দ্বিগুণ প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাজপুত্র স্ককুমাৰ উপস্থিত হইলে বাজা কহিলেন, প্রভো! ইনিই কেবল ছয় দিবস কন্ঠার মনোবাহা পূর্ণ করিয়া একদিবস অক্ষম হওয়াতে কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। স্মমস্ত প্রিয়তম বন্ধুর দুৰবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। নরপতিকে কহিলেন, মহাবাজ! তবে এই রাজপুত্রকে বিদায় করিবেন না। ইহার দ্বারা কোন বিশেষ কাৰ্য্য সম্পাদন কবিত্তে হইবে। সন্ন্যাসীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, স্মতরাং মহারাজ তাঁহাকে বিদায় করিলেন না। তখন স্ককুমাৰ মনে মনে ভাবিত্তে লাগিলেন যে, হায়! আমি বন্ধুবাক্যবিরোধী হইয়া এত কষ্ট সহ করিলাম, তথাপি সে আশা ফলবতী হইল না। বে অদৃষ্ট! অগাণ্য রাজপুত্রগণ তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ লইয়া স্বদেশে গমন কবিলেন, আমি এমনি হতভাগ্য যে কারাগার হইতেও মুক্তি পাইলাম না।

মহারাজ সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরুদেব! আপনার আদেশানুসারে রাজপুত্রগণকে বিদায় করা হইয়াছে। কেবল যুবরাজ স্ককুমাৰ এই উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রথমতঃ রাজাস্তঃপুরের গ্রহশাস্তি হউক, তাহার পর স্ককুমাৰের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করা যাইবেক। রাজা সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে স্তস্তঃপুরে গমন করিলেন। স্মমস্ত প্রথমতঃ পুতবারি-প্রভাবে মহিষীকে মানবী করিলেন। রাজা এবং অমাত্যবর্গ সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে এককালে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ক্রমে ক্রমে স্মমস্ত বানরীকে মানবী করিলেন, কিন্তু রাজকন্ঠা রত্নবতী বানরীই রহিলেন। রাজা গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, প্রভো! সকলেই রক্ষা পাইল, কিন্তু কি দোষে কন্ঠাটি

বানরী হইয়া রহিল ? সন্ন্যাসী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, রাজন্ ! তোমার কণ্ঠার গুরুতর পাপ ; তাহাকে মুক্ত করা আমার সাধ্য নয় । রাজা তখন সজলনয়নে বলিলেন, যদি কুমারীটি বানরী রহিল, তবে আমার জীবনে কি ফল ? রাজ্যোই বা প্রয়োজন কি ? এবং এসকল পরিবারই বা থাকিয়া কি করিবে ? আমার আর তিলাঙ্ক বাঁচিবার সাধ নাই । এই প্রকার নির্বেদ প্রকাশ করিয়া রাজা পুনর্বার সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ ধোত করিতে লাগিলেন । কহিলেন, গুরুদেব ! আপনি আমারে এই দুস্তর বিপদপারাবার হইতে নিস্তার না করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? আমি আপনারে এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করিতেছি, রত্নবতী বস্তুটিও আপনারে দান করিব । কেবল তাহার পূর্ব রূপটি দর্শন করা আমার ইচ্ছা ।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ ! তোমার যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তবে ষথার্থই আমাবে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দিয়া রত্নবতী দান করিতে হইবে । রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন । সন্ন্যাসী কয়েকটি কৃত্রিম মঙ্গ পাঠ করিয়া পাত্ৰস্ত বাবি প্রক্ষেপপূর্বক বানরী বাজকুমারীকে মানবী করিলেন । রাজা ও রাজপুরীস্ব সকলে তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন । বাজপুরী আনন্দময় হইল । রাজা বাহুপ্রসারণপূর্বক তনয়াকে কোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রুধারে তাঁহার সর্কশরীর সিক্ত করিতে লাগিলেন । রত্নবতী পূর্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, অথচ অস্তঃপুর লোকাকীর্ণ দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতৃকোড়ে মস্তক নত করিলেন । রাজা অঙ্গুলিদ্বারা কণ্ঠার চিবুক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! পুনর্বার তোমারে কোড়ে লইব এ আশা ছিল না । পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই ঘোগীবরের প্রসাদে অল্প হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন । রত্নবতী এই কথা শুনিয়া সেই ভুবনমোহন কটাক্ষ সন্ন্যাসীর দিকে একবার ফিরাইলেন । ছদ্ম ঘোগিকল্পী স্বমন্ত রাজকণ্ঠার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । ভাবিলেন, পরমেশ্বর এই স্বর্ণলতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আভরণ করিবার অভিপ্রায়ে স্বজন করিয়াছেন ? প্রিয়বন্ধু স্বকুমারের অদৃষ্ট কি স্বপ্রসন্ন, এই সৌন্দর্য্য-সর্বোবরের পদ্মফুলটি আজ তাঁহার হৃদয়-সর্বোবরে শোভা সম্পাদন করিবে ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিষয়-ত্যাগী ঘোগী, গৃহী হইতে আমার অভিলাষ নাই । তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, অর্দ্ধেক

রাজ্যসহ এই কল্যাণের আশ্বাসে দান করিলে, কিন্তু আমি তাহা লইয়া কি করিব ? আমি কহিতেছি যে, স্বকুমার রাজকুমার আপনার হৃদিতার জন্য সুদীর্ঘকাল কারা-বাস করিলেন, তাঁহারেই দান কর। রাজা তচ্ছবণে উল্লসিত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে স্বকুমারকে রত্নবতী দান করিলেন। নগর উৎসবময়, রাজবাটী মঙ্গলময়, এবং রাজপথ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে বাসরগৃহে মহিলাগণ বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ গবাক্ষদ্বারে বদনার্ঘ্য করিয়া, কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা অগ্রগাম্বিনী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ বাসন্তীতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ওদিকে সন্ন্যাসী অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রী ! মহারাজকে বল, আমি অণু রাজপুত্রের সহিত বাসরগৃহে যামিনী যাপন করিব। মন্ত্রী এই কথা রাজাকে বলিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মন্ত্রী স্বকুমারের সহিত সন্ন্যাসীকে বাসরে লইয়া গেলেন। রাজকুমার সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পূর্বাধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেইসকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথাক্রমে হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল। এই অবসরে সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ করিয়া ঐষৎ হস্তবদনে স্বকুমারকে কহিলেন, বয়স্ক ! চিনিতে পাব ? এখন বল দেখি, ধন বড় কি বিত্তা বড় ? যুবরাজের শরীর লোমাক্ষিত হইল। বিশ্বয়ান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই আশৈলব-পরিচিতি-বন্ধু স্বমস্ত সম্মুখে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষবিধাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাক্ষর্যমানে বন্ধুকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাহার মন এতনি বিহ্বল হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্রপুস্তলিকার ন্যায় অনিমিষলোচনে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জনমিতরঙ্গের ন্যায় প্রশমহিজোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে লাগর যেমন বাহুপ্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখজলধি চিন্তাবাহুর প্রতিঘাতে ক্ষীত হইয়া ক্ষয়কে আঘাত করিতে লাগিল।

কল্যাজামাতা বাসরগৃহে ক্রুর প্রেমালাপ করে, পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিনী হন, তাহাতে আবার বাসরগৃহে সন্ন্যাসী আছে, এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কোতুহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহারা গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারা গৃহমধ্যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর রূপপরিবর্তন, জামাতার সহিত আলিঙ্গন, জামাতার ক্রন্দন এবং পরস্পরের স্নেহ-সস্তাষণ দর্শন করিয়া

বিস্ময়াকুল মনে দ্রুতপদে রানীকে সংবাদ দিলেন। রানী সেই দ্ব্যাপার দর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়াই শয়নগৃহে গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করুন। সন্ন্যাসীকে বাসরগৃহে রাখিয়াছেন বলিয়া কণ্ঠাগণ কেহই তথ্য ষান নাই। জামাতা, রত্নবতী, আর সেই সন্ন্যাসী তিনজনেই বাসরে আছেন, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী যুবাক্রপ ধারণ করিয়াছেন। জামাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বাক্য শ্রবণে অতি ব্যস্ত হইয়া বাসরগৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই, একটি দিবা পুরুষের সহিত জামাতার কথোপকথন হইতেছে, রত্নবতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রাজা রত্নবতীকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। রাজার স্বব শুনিয়া স্বকুমার আপনিই দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, “সন্ন্যাসী কোথায় ? এই সুপুরুষ যুবাপুরুষ কে ?” এই প্রশ্ন করিলেন। স্তম্ভ নতশিরে উত্তর কবিলেন, মহারাজ ! আমিই সেই সন্ন্যাসী। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, এই আশ্চর্য্য ঘটনার আত্মোপাস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে ! স্তম্ভ প্রথমে তাহাঙ্গিরের বাল্যসখা, উভয় বন্ধুতে তর্ক, মৌমাংসার্থ দেশভ্রমণে বহির্গমন এবং কপিক্রপী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি অবধি পরস্পর বিচ্ছেদ ও রত্নপুরে আগমন, পরিশেষে এই বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অভিনিবেশপূর্ব্বক এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্তম্ভের বিজ্ঞা-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, বৎস স্তম্ভ ! তুমি বলিয়াছিলে ধনাপেক্ষা বিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, তাহা যথার্থ, তোমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে। এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ তথ্য থাকিয়া রাজা শয়নগৃহে গমন করিলেন। বজ্রনৌ প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রিকণ্ঠার সহিত স্তম্ভের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। স্বকুমার ও স্তম্ভ কিছুদিন শওরালয়ে বাস কবিয়া সঙ্গীক স্বদেশে গমন করিলেন।

গোয়াই মিজ অথবা গৌরী-সেতু

ত্রৈতাযুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধাবিতে ।
বেঁধেছিল সিন্ধুসেতু বানর সহিতে ॥
নল নীল হনুমান জাম্বুবান আদি ।
সমতুল কপিকুল নাহি অগ্রবাদী ॥
প্রাণপণে সযতনে সবে করি বল ।
বাঁধিল দুঃস্থ সিন্ধু মরি কি কোশল ॥
ধন্য ধন্য ধন্য বীর ধন্য রঘুমণি ।
সেতু বেঁধে উদ্ধারিলে আপন বমণী ॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থস্থান ।
কতই হয়েছে মরি তাহার সন্মান ॥
এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ ।
সাজায় ভারত-মায়ে মনোমত সাজ ॥
এমন নিষ্ঠুর রাজা দেখি না কোথায় ।
লৌহহার পরাইছে মায়ের গলায় ॥
ওদিকে হয়েছে সারা পশ্চিম প্রদেশ ।
বাকি ছিল তাও হল বাঙ্গালার দেশ ॥
ধিক তোরে কলিরাজা বলিব কি আব ।
বৃদ্ধা মার গলে দেও লৌহময় হার ॥
বাঙ্গালী হবে না এত নিষ্ঠুর হৃদয় ।
তাই ভেবে রাজামুখ করেছ আশ্রয় ॥
রাজামুখ কটা চ'ক বড় বুদ্ধিমান ।
কৌশলে মায়ের গলে মালা করে দান ॥
কলিকাতা ঢাকা আর কেন ফাক রয় ।
দেও হার গলে তুলি কলিরাজ কয় ॥

অমনি মাজিল বীর কত শত শত ।
 জগতী হইতে সবে হইল নির্গত ॥
 সে কালের মত বীর এরা কেহ নয় ।
 অসি চর্ম বর্ম আদি কিছু নাহি লয় ॥
 দড়া দড়ি খুট থস্তা এদের সম্বল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

বাঙ্গাল কাঙ্গাল বড় কিছু দড় নয় ।
 ধবল মুখের বোলে কম্পিত হৃদয় ॥
 ছিলাম জঙ্গলে সবে বাঙ্গাল দেশেতে ।
 কটা চ'কে তোষি কত প্রাণের ভয়েতে ॥
 ঘরবাড়ী ভেঙ্গেচুরে করে ছারখার ।
 তবু বলি রক্ষা কর ধর্ম-অবতার ॥
 দেখিতে দেখিতে গৌরীতটে উপনীত ।
 হুজুর মজুর লয়ে বড়ই দুঃখিত ॥
 বেগবতী শ্রোতস্বতী গৌরী ভয়ঙ্করী ।
 দেখে ভেবে ভয়াকুল উপায় কি করি ॥
 এর পারে লৌহহার কেমনে লইব ।
 কেমনে লঙ্ঘিব এরে কেমনে ঘাইব ॥
 সকলেই এই ভেবে হইল অস্থির ।
 বাঁধিব গৌরীতে সেতু শেষে করি স্থির ॥
 সেতু বেঁধে পার হব পারে নব হার ।
 দেখিব গৌরীর গর্ভ দেখিব এবার ॥
 দলে দলে খেতকায় জুটিল আসিয়া ।
 কেমনে বাঁধিবে গৌরী ভাবিছে বসিয়া ॥
 পরামর্শ হল শেষ অশেষপ্রকার ।
 বাঁধিব বাঁধিব সেতু বাঁধিব এবার ॥

দলের প্রধান যিনি বসি উচ্চাসনে ।
 করিলেন আজ্ঞা সবে মধুর বচনে ॥
 গোঁরীর পশ্চিম তটে কিছু ভয় নাই ।
 চারিদিকে ঘিরে আছি আমরা সবাই ॥
 স্ত্রনিয়মে সব কার্য্য সমাধা হইবে ।
 অল্প সংখ্যা লোক মাত্র এপারে থাকিবে ॥
 পূর্ব পারে আমাদের থাকিবে সকল ।
 ধন্য ধন্য রাজ্যমুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

পূর্বপারে আমাদের কোন মিত্র নাই ।
 সতর্কে থাকিতে হবে একত্রে সবাই ॥
 আমরা বিদেশী এসে ঘিবিগাছি দেশ ।
 কাজেই হইবে মনে তাহাদের ঘেঁষ ॥
 ঢাকাই বাঙ্গাল দল আমাদের দলে ।
 আসিয়া মিলিছে তারা ফল পাবে ব'লে ॥
 কিন্তু তারা এদেশের কিছুই জানে না ।
 এদেশে তাদের কথা কেহই বোঝে না ॥
 ছলে হ'ক বলে হ'ক কৌশল কবিয়া ।
 দিতে হবে দেশী লোক দলে মিলাইয়া ॥
 স্বধু চাষা নিলে কিছু উপকাব নাই ।
 সব দল হতে কিছু কিছু লওয়া চাই ॥
 চাষাদের কুলি ব'লে কর সম্ভাষণ ।
 তাতেই সম্ভষ্ট হবে তাহাদের মন ॥
 শাদা বস্ত্র জুতা পায় যাদের দেখিবে ।
 বাবু বলে সম্মাদব তাদের করিবে ॥
 হিন্দুস্থানী মারয়ারী থোটা বুনগণ ।
 বাছিয়ে লইবে সংখ্যা করিয়ে গণন ॥
 এসকলে কোন কালে হবে না প্রশয় ।
 আমরা করিব তাহা যাহা মনে লয় ॥

হবে না হবে না ঐক্য, এ দল ও দল ।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

অর্থের অসাধ্য কিছু নাই এ মহীতে ।
উপস্থিত হল সব দেখিতে দেখিতে ॥
কাষ্যকর্ত্তা হইলেন লেসলী প্রধান ।
ইহার বুদ্ধিতে সেতু হইবে নিশ্চয় ॥
বেনিডিক্ট এসিষ্টেন্ট হইল তাঁহার ।
নিকলসন্ গ্রাস্ কেঁরি গুণের আধার ॥
রাঙ্গা কান্দা শাদা মুখ সাহেব-তনয় ।
ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে উপস্থিত হয় ॥
বাধিতে গৌরীর সেতু হবষিত মন ।
শাদা বস্ত্র জুতা ধাবী জোটে অগণন ॥

বাপের তাড়ান কত মাঘের খেদান ।
জোটা মাত্র পদ পেয়ে বাড়িল সম্মান ॥
রাম রুক্ষ, যত্ন যত্ন, প্রসন্ন রাখাল ।
নসী, শশী, নন্দ, চন্দ্র, গোবিন্দ, গোপাল ॥
সূর্য্য, শীল, আইজদী, মহেন্দ্র, মহেশ ।
গুপ্তবাবু জিতেদ্রিয় গুণেতে অশেষ ॥
আর কত বাবুগণ কে পারে গণিতে ।
কতজন সাজে বঙ্গে কে পাবে বর্ণিতে ॥
নানা রঙ্গে বাজিরাজি সাজায় বিস্তর ।
মহিষ বলদ মেঘ কুবু-র শূকর ॥

সংগ্রহ করিছে কত নানামত ফল ।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

দাঁড়াইল গৌরীতীবে সারি সারি সবে ।
দেখি চমকিত লোক এরা কারা হবে ॥
গৌরী পার হবে ব'লে সাজিল সকল ।
বাজিল বাশির বাজ ইঞ্জিনারী কল ॥
ষ্টীমার পক্টুন জোড়া বোট ডিঙি ।

ফেলাট ঢাকাই বোট বড়লান ডিঙি ॥
 আসিল এপারে সবে করিবারে পার ।
 দেখি হরষিত-চিত মবি কি বহিার ॥
 সকলেই পাবে যাবে বলে দাঁড়াইল ।
 হাসি হাসি কর্তা আমি কহিতে লাগিল ॥
 ক্রমে পাব হও সবে হয়ো না অস্তিব ।
 হয় নাই এ পারের কোন কার্য্য স্থির ॥
 কে থাকিবে কার্য্যকর্তা, কুলি কতজন ।
 কে কবিবে বার্তাবহকার্য্য সংঘটন ॥
 জীবামে রাখিয়া যাই কার্য্যভার দিয়া ।
 বার্তাবহ কর্তা দেই সূর্য্যকে করিয়া ॥
 সূর্য্য যদি বার্তাবহকর্তা হয়ে বয় ।
 স্তনিয়মে সব কার্য্য হইবে নিশ্চয় ॥
 অপর এপারে থেকে না পাইবে দিশে ।
 থাক সূর্য্য এই পারে মনেব হরিষে ॥
 এত বলি সবে মিলি তবী আরোহিল ।
 বদর বলিয়া মাঝি তরণী খুলিল ॥
 ঝুঁমারে ধপ ধপ করিতেছে কল ।
 বোটে দাঁড় মারে দাঁড়ী করে কত বল ॥
 দরিয়া গাজি বলে কেহ ছাড়িয়া তরণী ।
 পড়িছে ছিড়িয়ে দাঁড় উঠিছে অমনি ॥
 ওপারে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে ।
 গৌরী পার হলো সবে হাসিতে হাসিতে ॥
 ভীষণ তরঙ্গ গৌরী করে কল কল ।
 ধন্য ধন্য রাজ্জামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 উঠিল কাসীমপুরে একত্রে সকলে ।
 নিরুপিত স্থানে স্থানে সব যায় চ'লে ॥
 কাসীমপুরেতে কেহ, কেহ বা কয়্যায় ।
 রহিলেন বাসা করি ষথায় তথায় ॥

কোন বাবু বিবি আনি রাখিলেন ঘিরে ।
 কেহ মাঠে কেহ গ্রামে কেহ গৌরীতীরে ॥
 শত শত বারনারী আসিয়া জুটিল ।
 কেহ নিজের ঘরে কেহ বাসায় রহিল ॥
 সাহেবের বিবি সব গাউন পরিয়া ।
 সকালে বিকালে মাঠে বেড়ায় খুরিয়া ॥
 ‘বিড়ালক্ষী বিধুমুখী’ কটা কটা কেশ ।
 মুখে গন্ধ, সব মন্দ স্তম্ভু ভাল বেশ ॥
 কেবা বা কার ভালবাসা, কেবা কার নারী ॥
 অঙ্গভঙ্গ রঙ্গ দেখে চিনিবারে নারি ॥
 সকলেই করে কর, করিছে দলন ।
 সকলেই মুখে মুখ, করিছে চুষন ॥
 দেখিয়া অবাক মোরা, বাঁচি না লজ্জায় ।
 কেবা কার চেনা ভার, এত বড় দায় ॥
 এ দেখে এ দেশে নারী-স্বাধীনতা কাজে ।
 মত দিতে বিধিমতে হৃদে শেল বাজে ॥
 সুরেশ্বরী ধাতেশ্বরী বোতল সহায় ।
 উপস্থিত হইলেন আসিয়া কয়ায় ॥
 গলবস্ত্রে কত বাবু কবে জোড় কর ।
 কত মতে করিতেছে মায়ের আদর ॥
 বারান্দাগণ সবে প্রাঙ্গণে আসিয়া ।
 কহিছে কাতরে কত মিনতি করিয়া ॥
 থাক মা এপারে থাক স্রার ঈশ্বরী ।
 সেবিব তোমাতে মোরা, ওমা ধাতেশ্বরী ॥
 সাহেবেরা করিবে না তোমার আদর,
 ক্ষতি নাই তাতে দুখ, করো না অন্তর ॥
 আমরা করিব সেবা, তোমার চরণ ।
 গটুহেল ক’রে দিব, রাক্ষা মুখগণ ॥

আসিতে দিওনা কাছে, সাহেবের দল ।
ধন্য ধন্য রাজ্যমুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

শিকলে আঁটিয়া কল দোলাইল কত ।
রথ কল টানা কল, কল নানা মত ॥
জল তোলা, মাটি কাটা, কাদা করা কল ।
কত কল পল্টুনেতে, মরি কি কৌশল ॥

স্বত্বধর বুন কুলি, খাটে অগণন ।
প্রাণপণে খাটে কত দেশী বাবুগণ ॥
শিকলে আঁটিয়া কত বড় বড় চঙ্গ ।
পুঁতেছে গৌরীর গর্ভে ক'রে নানা রঙ্গ ॥
ধপ ধপ করে ওঠে, এঞ্জিনের ধুম ।
পল্টুনে গৌরীর গর্ভে লেগে গেল ধুম ॥
গৌরীজন কলে ওঠে এত বল ক'রে ।

দু দিন শুকায় গৌরী যেন যাবে ম'রে ॥
ছলে বলে স্বকৌশলে গৌরীর বুকেতে ।
ক্রমে লৌহস্তম্ভ সব লাগিল পুঁতিতে ॥
পাথর ফেলিল কত গৌরীর জীবনে ।
মারিবে জীবনে গৌরী আশা আছে মনে ॥
তরঙ্গের রঙ্গ আর দেখা নাহি যায় ।
কেবল কান্দিছে গৌরী ক'রে হায় হায় ॥
এদিকে খালাসী দল আল্লা আল্লা ব'লে ।
পুঁতিছে লোহার থাম জঁতা কলে বলে ॥
হা ইলেছা ব'লে সবে টানিতেছে কল ।
ধন্য ধন্য রাজ্যমুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।

কারো কারো বাসায় নিশিতে বড় রং ।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় সং ॥
সাহেব মাতিছে মদে বিড়ালাক্ষী নিয়ে ।
পড়িছে বিবিধ গায় ঢলিয়ে ঢলিয়ে ॥

মাতামাতি লাফালাফি কত গীত গায় ।
 তালে তালে নাচিতেছে শাখামুগ প্রায় ॥
 সেরী চেরী ত্রাপ্তি ধরা মেজের উপরে ।
 মেজের আলোয় আবো বড় শোভা করে ॥
 যার যাহা হচ্ছা তাহা কবিত্তেছে পান ।
 দারা রারা স্ববে কেহ কবিত্তেছে গান ॥
 কোন বিবি স্তরা ঢালি গেলাসেতে করি ।
 দিতেছে সাহেব-মুখে আ মবি আ মরি ॥
 বিড়ালাক্ষী শাদামুখী ধবল বসন ।
 বাতিব আলোতে আরো উজ্জ্বল বরন ॥
 বুক উচ্চ কুচ গিরি অর্দ্ধ আবরণ ।
 কে বলিবে আছে তাব উপরে বসন ॥
 শাস্তিপুরে ডুরে পবা আমাদেব মেয়ে ।
 শতগুণে ভাল তাবা বিবিদেব চেয়ে ॥
 ওদিকে কতক বাবু ব'সে নানা দলে ।
 কেহ ব'সে গীত গায় কেহ পড়ে ট'লে ॥
 ধাঙেশ্বরী ভাজা চাল, ভাজা ছোলা নিয়ে ।
 এ উহাব গালে দেয় আমোদে মাতিয়ে ॥
 দিশী মদ দিশী বাবু দিশী বিবিগণ ।
 সাদা জলে রাজা চ'ক সাদা করি মন ॥
 তবলার বোলে মন উঠিছে ফুলিয়া ।
 নাচিছে কামিনীকব আদরে ধরিয়া ॥
 উন্নত হইয়া কেহ বাবনারীসনে ।
 কি আশে বিদেশে আসা নাহি ভাবে মনে ॥
 কোন বাবু শিরে পাগ ঝাঁঝিয়া তথায় ।
 চামর লইয়া হাতে রামায়ণ গায় ॥
 ধিক ধিক নাচ আর কেদারার বোল ।
 গাঁজাখুরি গানে আরো বাড়িতেছে গোল ॥

বেড়াইতেছে বারনারী বাজাইয়া মল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 প্রভাতে বাজিল বাঁশি কামারশালায় ।
 যার যার যেই কাজ সেই কাজে যায় ॥
 ক'রশালে কি কৌশল করিয়াছে কলে ।
 সব কল চলিতেছে এঞ্জিনেব বলে ॥
 এঞ্জিনে ঘুবিছে চাকা চক্ষের পলকে ।
 ধাঁদা লেগে যায় চক্ষে অগ্নির ঝলকে ॥
 কত কল কত চাকা ঘোরে অনিবার ।
 কেবল এঞ্জিন সব কল মুলাধার ॥
 চিবিতেছে বাহাহুরি কাঠ শত শত ।
 লোহাতে চিরিছে লোহা কত আর কত ॥
 স্তরকি হইছে ইটে সিন্দূরের প্রায় ।
 যার যাহা ইচ্ছা করে এঞ্জিন প্রভায় ॥
 ওদিকে রথের কলে শিকল ঝাটিয়া ।
 বড় বড় চোঙ্গ আনে অনাসে টানিয়া ॥
 তিনশত লোকে যাহা টানিলে না চলে ।
 ছয়জন টানি লয় কলের কৌশলে ॥
 কত বল ধরে কল কৌশল এমন ।
 শত মণ লোহা লয়ে যায় দুইজন ।
 থাম পোঁতা হলো শেষ বিশেষ যতনে ।
 টানিছে গাড়ীর সবে হরষিত মনে ॥
 এখন ভাবনা নাই থাম পুঁতিয়াছি ।
 বাজিব বাজিব সেতু ভরসা পেয়েছি ॥
 গাড়ীর টানিতে কত আহত হইল ।
 অর্থলোভে কত চাষা প্রাণ হারাইল ॥
 ঘুরিছে উপরে কল শিকল লইয়া ।
 হঠাৎ ছুটিল হাত, মরিল পড়িয়া ॥
 মাথা ভেঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে কত জন ।
 হস্ত পদ ভাঙ্গা কত কে করে গণন ॥

হস্ত পদ ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে পায় ।
 তবু জোর করি লয় ডাক্তারখানায় ॥
 নেটিভ ডাক্তার তারা প্রসন্ন এয়ার ।
 এয়ার সিবিল বটে সাহেব এয়ার ॥
 হস্ত পদ ভাঙ্গা পেলে কেটে ফেলে তায় ।
 আর্ন্তনাদে কান্দে সবে করে হায় হায় ॥
 গার্ডার টানিতে সবে হইল কাতর ।
 দিবস-রজনী কাজ করে নিরন্তর ॥
 লোরী কলে ঠেলিতেছে—ধন্য রে কোশল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 গার্ডার লাগান শেষ হইল যখন ।
 আনন্দে মাতিল সব কর্মচারিগণ ॥
 শ্বেত পীত লাল নীল পতাকা বিস্তর ।
 বান্ধিয়া গার্ডার শিরে সাজায় তৎপর ॥
 অগণন জনগণ দাঁড়ায় দুকূলে ।
 সেতু বান্ধা হলো শেষ দেখে কুতূহলে ॥
 তরী আরোহিয়া কত শ্বেতকায়গণ ।
 আসিছে গোরীর সেতু করিতে দর্শন ॥
 দিনমণি অস্ত যায় পশ্চিম অচলে ।
 দেখিয়া চলিছে কল আর বলে বলে ॥
 গার্ডার লাগান সাবা হইল যখন ।
 আনন্দমাগরে মন ভাসিল তখন ॥
 করতালি কোলাকুলি হবে ছরে বোল ।
 তিন ঘণ্টা হলো তবু নাহি গেল গোল ॥
 মশাল করিয়া হাতে নাচিতে লাগিল ।
 হরষে সরস প্রাণ আবুল হইল ॥
 কেহ বোটে কেহ তীরে কেহ বা নৌকায় ।
 করিতেছে লাফালাফি যত শ্বেতকায় ॥

এতদিনে হলো আজ শ্রমের সফল ।

ধন্য ধন্য রাজাগুথ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

সেতু বেঁধে লৌহ-হার লয়ে গেল পারে ।

ধন্য রে বিলাতী বুদ্ধি ধন্য বে সবারে ॥

পূর্বপাবে লৌহ-হার গেল কত দূর ।

রথে চড়ি দেখিবেন মেয়ো বাহাদুর ॥

এ রথ সে রথ নয় মনোরথ-গতি ।

আসিবেন বাস্পরথে চড়ি মহামতি ॥

সমস্ত ভারতভার শিরে আছে যার ।

সহিবে গোৱীর সেতু আজি তাঁর ভার ॥

লেসলীর কারিকুরি আজি জানা যাবে ।

যদি সেতু ঠিক রয় পুরস্কার পাবে ॥

আমপাতা বাঁশপাতা গাঁদাফুল দিয়া ।

রাখিল মনের মত সেতু সাজাইয়া ॥

দুব দুব করিতেছে লেসলী-হৃদয় ।

না জানি আমার ভাগ্যে আজি কিবা হয় ॥

শারীরিক মানসিক পরিশ্রম যত ।

বুঝি আজ ভাগ্যদোষে সব হয় হত ॥

কত অর্থ ব্যয় হলো আমাব কথায় ।

যদি সেতু নাহি রয় কি হবে উপায় ॥

লোকের গঞ্জন প্রাণে সহিবে কেমনে ।

জীবন তাজিবি আজি গোৱীর জীবনে ॥

লর্ড মেয়া বাহাদুর গুণের আধার ।

দেখিবেন গোৱী-সেতু সবে চমৎকার ॥

সেতু উপলক্ষ করি হবে আগমন ।

কাসিমপুরেতে তাঁর হবে পদার্পণ ॥

কাশীতুল্য মান্য হবে কাসিমপুরের ।

নবতীর্থস্থান হবে কুল উদ্ধারের ॥

দর্শনে পাইবে ফল মোক্ষফল সবে ।
 এ তীর্থে ধর্মের ভেদ কিছু নাহি রবে ॥
 সকল ধর্মেতে হবে সম অধিকার ।
 দেখা মাত্র শত কুল হইবে উদ্ধার ॥
 লর্ড মেয়ো বাহাদুরে দেখিবার তরে ।
 গৌরীর দু-তীরে লোক কোলাহল করে ॥
 কেহ বলে ঐ দেখো দেখা যায় ধূম ।
 আসিছে কলেব গাড়ী ক'রে কত ধূম ॥
 দেখিতে দেখিতে রথ নক্ষত্র-সমান ।
 ধূম ছাড়ি ছুড়ছড়ি করিল প্রস্থান ॥
 চক্ষের পলকে সেতু হয়ে গেল পার ।
 দেখে চমকিত লোক সন্তোষ অপার ॥
 থামিল রথের গতি সেতু পার হয়ে ।
 দেখিল ওপাব-বাসী নিকটেতে বয়ে ॥
 মহামান্য গণনীয় মহোদয়গণ ।
 লর্ড মেয়ো বাহাদুর অতি বিচক্ষণ ॥
 নামিলেন রথ হতে লয়ে দল বল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 যমুনা পদ্মার সনে মিলেছে যথায় ।
 হার লয়ে সবে ব'সে ভাবিছে তথায় ॥
 ঢাকায় হলো না যাওয়া, হলো না এবার ।
 সাধ্য নাই পদ্মা-পারে লয়ে যাইবার ॥
 কিছু দিন এই স্থানে থাকিতে হইল ।
 সম্মুখে আসিয়া পদ্মা বড় বাধা দিল ॥
 এদিকে গৌরীর সেতু করি দরশন ।
 লর্ড মেয়ো করিলেন রথে আরোহণ ॥
 ছইল ঘুরিল জোরে বাঁশরী বাজিল ।
 হুস্ হুস্ করি কল চলিতে লাগিল ॥

গৌরী-সেতু হলো শেষ বিশেষ জানিয়া ।
 হরষে সকলে যায় আবাসে চলিয়া ॥
 ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল ।
 শিলটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল ॥
 বাবুগণ বিবি লয়ে হইলেন পার ।
 সঙ্গে করি লইলেন যার যার তার ॥
 ক্রমে ক্রমে সব গেল কিছু রহিল না ।
 দুদিনে ভাঙ্গিল ঘর কিছু থাকিল না ॥
 কেবল রহিল হজ্জ সেতুর রক্ষক ।
 রক্ষক বলিছে কিন্তু নামেতে দর্শক ॥
 অকস্মাৎ একদিন সেতু-দরশনে ।
 গিয়ে প্রাণ গেল তার গৌরীর জীবনে ॥
 সেতু' পরি চড়ি জন মাপিছে যখন ।
 অমনি গৌরীর গর্ভে হইল পতন ॥
 আর কি উঠিতে পারে গৌরী-গর্ভ হতে ।
 হাজার হরিল প্রাণ দেখিতে দেখিতে ॥
 কান্দিছে হাজার মেম করি হায় হায় ।
 সেম্ সেম্ ও গোরাই যাব রে কোথায় ॥
 হায় কটি ছেলেমেয়ে অপোগণ্ড দল ।
 কোথা যাবে কি খাইবে ও গোরাই বল ॥
 হজ্জ মল হেজ্জ এলো কিছুদিন তরে ।
 অঙ্গনা লইয়ে সঙ্গে কত মজা করে ॥
 হইল না চির-সুখী তাহার কপাল ।
 ইয়ং হইল কর্তা নন্দের গোপাল ॥
 ধন্য রে লেসলী তোর ধন্য বুদ্ধিবল ।
 বাঁধিলে গৌরীতে সেতু ধন্য রে কোশল ॥

জমীদার-দৰ্পণ

বাটাকাৰু ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	—	জমীদার
সিৰাজ আলী	—	জমীদাৰেৰ জ্যেষ্ঠভাতা
আবু মোল্লা	—	অধীন প্রজা
জামাল প্রভৃতি	—	জমীদাৰেৰ চাকৰ
		সাক্ষীদ্বয়
আবজান ব্যাপারী	—	জুৰি

নট, সূত্রধার, মোসাহেব চাৰিজন, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাৰিষ্টাৰ, ডাক্তাৰ সাহেব,

ইন্সপেক্টৰ, কোর্ট-সাব-ইন্সপেক্টৰ, উকিল, মোক্তাৰ, পেশকাৰ,

কনস্টেবল, চাষা, আৱদালী, দৰ্শকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ

নূরুল্লেহাৰ	—	আবু মোল্লাৰ স্ত্রী
আমিৰণ	—	আবু মোল্লাৰ ভগ্নী
কৃষ্ণমণি		
নটী		

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র—(পদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম ! তোমার ধর্ম লুকালো ভারতে ;
জমীদার-অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে !
পাতকীর কণ্ঠদোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়
না মানে যেমন বাঁধ স্রে ত্রস্বতী নদী,
দ্রুতবেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া ঢুকল ।
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম,
জমিদার ! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্বনর-ধনপ্রাণমান-রক্ষাকাবী ।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী !
ববি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীবে
কবেন শীতল কবে ভুবন শীতল,
সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
নদনদী জলাশয় খরতর কবে ।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
অরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুহানলে জলে তথা ঢাকা হতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর ।

[নটের প্রবেশ]

নট—একা একা পাগলের মত কি বলছেন ?

সূত্র—কেন ? অগায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি ?

নট—আমি সত্য অসত্যের কথা বলছি, ভয়ের কথাও বলছি, বলি কথাটা কি ?

সূত্র—কথা এমন কিছু নয়। কলিকালেব প্রজারা মহা স্বেচ্ছা আছে। কলিরাজও প্রজার স্বত্বচিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে স্বেচ্ছা থাকবে এরি সম্মান করছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাভ্য করছে তাব খোঁজখবর নেই।

নট—কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল-দুর্বল, ছোট-বড়, ধনী-নিধন, স্থখী-দুঃখী, সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন-দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান!

সূত্র—(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে একরকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহবেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহবে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শাস্ত—বড় ধীব, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে জাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পাব পায় না। বলব কি, জানওয়ারেবা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট—কি কথাই বললেন, বাঘ বুঝি আব জানওয়ার নয়?

সূত্র—আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাস! পোশাক পরে, দিকির সৰু চালের ভাত খায়। মাড়ে তিনহাত পুরু গদিতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদির আশে-পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই করছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনেব স্বেচ্ছা কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমানভয়ে নিজে কোন কাষাই করে না। ভগবান তাদের হাত-পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো! দিকির পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাণ্ডসামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়! কি করে? আহা-রেব সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট—দল আবার কেমন?

সূত্র—যেমন হিন্দু আর মুসলমান ।

নট—ঠিক বলেছেন । ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা এখনও মনে হলে পিলে চমকে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে । উঃ, কি ভয়ানক !

সূত্র—এখন পথে এস । আমিও তাই বলছি ।

নট—যাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র—কেন বলব না ? আপনি তো বলেছিলেন, যদি কোন দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনেব কথা বলবো । আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে !

নট—কি করে ?

সূত্র—একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না !

নট—(চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পবন ভাগা ।

সূত্র—আব বিলম্বে কাজ নাই । আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো । যত কথা মনে আছে সকলি বলবো ! এমন দিন আর হবে না । কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলেব নকশা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত কবতেই হবে !

নট—তাই তো ভাবছি, কোন্ নকশা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে ।

সূত্র আপনি শুনে নাই ‘জমীদার-দর্পণ’ নাটক যে নকশাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল তুলেছে ।

নট—তবে আব কথা নাই, আস্থন, তারই যোগাড় কবা যাক ।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পুষ্পাঞ্চলে ধরিয়া নটীর প্রবেশ]

নট—বেশ, ইনি তো মন্দ নন । আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন ? পুরুষের মন পাওয়া ভার । নারী-জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই । তা যাক, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে । এই অবসরে মালা গোঁথে নেই ।

[উপবেশন এবং মালা গোঁথিতে সঙ্গীত]

(রাগিণী মল্লার—তাল আড়া)

পাষণসমপ্রাণ পুরুষ নিদয় অতি ।
 মনে এক মুখে আর—ভিন্নভাব অগমতি ॥
 কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
 হাসি হাসি কত কত কথা বলে, মজায় অবলা-জাতি,
 নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
 দ্বিপদ ষট্ পদগুণ, কি হবে এদের গতি ॥

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো ।

[নটের প্রবেশ]

নট—প্রিয়ে ! সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম !

এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি ?

নটী—না, আমার কোন কথা নাই । আপনি যা মানস করেছেন আমি কি আর
 তাতে কোন বাধা দেই ? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি
 গেঁথেছি । এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে ।

নট—(সহাস্তে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন ?

নটী—(মুহূ হাসে) এও এক স্থখ !

নট—প্রিয়ে ! মালাতো পরালে, এখন আর একটি গান গাও ।

নটী—আর কি গান গাইব ? মনেব কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বললে আমি
 বলবো না ।

নট—তাতে আর ক্ষতি কি ?

উভয়ের সঙ্গীত

[লক্ষ্মীয়ার স্বর—তালে কাওয়ালী]

মরি দুর্বল প্রজার 'পরে অত্যাচার ।

কতজনে করে, করে জমীদার ॥

তারা জানে মনে, জমীদার বিনে

নাহি অণু কেহ দুঃখ গুনিবার ।

প্রজা কত সহ্যে, কিছু নাহি কহে:

মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর ॥

জমীদার ধরে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার ।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাক্ষপণ

নেপথ্যে সংগীত

[রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী]
ওরে প্রাণ মিলনসলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেমবারি পান ।
মনপ্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষবাণ ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাক্ষ

কোশলপুর

(হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা)

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায়—দেখেছো ?

প্র মো—হুজুর দেখেছি ।

হায়—কেমন ?

প্র মো—সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই !

হায়—কিন্তু ভারী চালাক, কিছুতেই পড়ে না !

প্র মো—(সহাস্তে) সে কি ? সামান্য জ্বীলোক কিছুতেই পড়ে না ।

হায়—তোমরা বোধ কর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব-
চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য !

প্র মো—অণ্ড লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়—টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গয়নার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না !

প্র মো—ওর স্বামীও তো এমন স্ত্রী পুরুষ নয় যে, তাতেই ভুলে বয়েছে ।

হায়—না, তাই বা কি করে ? আবু মোল্লা নব কার্তিক ! বিধিব নিকর দেখ !

চাষাব হাতে গোলাপ ফুল, এ কি প্রাণে ময় ? “হায বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায় !”

প্র মো—(ক্রোধে) কি আর বলবো । যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন ! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধরেও হয় না ; হওয়ার আরও উপায় আছে ; একদিন—

হায়—আমি যে না বুঝি তা নয় । যে কাজ তা তো জানতেই পাচ্ছে। তাই আবার যদি বলপূর্বক করা হয়, সে আবও অগায় । অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অণ্ড কোন কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে । আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁকেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অণ্ড উপায়—

প্র মো—কি এঁকেছেন হুজুর !

হায়—একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক । এদিকে একটু নরম-গরম আরম্ভ করে ওদিকে রুমমণিকে পাঠিয়ে দেই । সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্সার পব একবাব বৈঠকখানায় গে’ দেখা কর, সব গোল চুকে যায় !

প্র মো—বেশ যুক্তি হয়েছে হুজুব, বেশ যুক্তি হয়েছে । এখনই চাব-পাঁচজন সর্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হলে আজ রাত্রেই—

হায়—আজ রাত্রেই ?

প্র মো—রাত্রেই—এখনি—

হায়—যেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান—যেন উন্নত ! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল !

[সর্দারবেশ, জামালের প্রবেশ]

জাম—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর—

হায়—আর সকলে কোথায় ?

জামা—(ঘোড়হস্তে) সকলেই দেউড়িতে হুজুর ।

হায়—পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও।

জামা—যো হুজুর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

হায়—দেখা যাক ! ফাঁদ তো পাতলেম ; এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই ! (মুহুরের) সাবেক আমল হলে কোন্ দিন কাজ শেষ কবে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল ; তা যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র মো—বোধহয় এইবাবেই হবে। আর অন্য চেষ্টা করতে হবে না। এইবারেই হবে।

হায়—কৈ তা হয় ? ক'মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাটাহাটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্র মো—অধঃপাতে গেছেন ! আপনাদের পূর্বপুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত !

হায়—ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমবা যে কিছু না করতে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংবেজী আইন, বিধদাত ভাঙ্গা !

প্র মো—সে বোজও এদেশে নাই।

হায়—এক বকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে ? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন-আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মারপ্যাঁচ বোঝে।

প্র মো—হুজুর যে কন্দী এঁকেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজান দান, নামাজ পড়িবার পূর্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উঠেঃস্বর]

“আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর।
আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্,
আশ্‌হাদো আম্মা মোহাম্মাদুন্নাবি রাসুলুল্লাহ্। আশ্‌হাদো আম্মা মোহাম্মাদুন্নাবি
রাসুলুল্লাহ্। হাইয়া আলিস সালাহ্, হাইয়া আলিস সালাহ্। হাইয়া
আলাল ফালাহ্। হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্
আকবর। লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্।”

হায়—নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি । ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক । (গাজোখান)

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিণী সিন্ধু—তাল জং]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি ?

মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি ?

মধুমাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,

হেন ছদ্মবেশী তাব অধর্মেতে ভয় কি ?

সতীর সতীত্বধন হরিবাবে কব পণ,

মুখে বিভূ-পদে মন, এদের, অন্তকালে হবে কি?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লাহ বাহিব বাটীর ঘর

(সর্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লাহ)

আবু—(কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখানা নিয়ে আসি ; মনিব ডেকেছেন, না গিয়ে বাঁচতে পারি ?

জামা—নেওয়াতী রাখ, তোরা নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে পারিস তো একটু দাঁড়াই । নৈলে চল (গলাধাক্কা)

আবু—(সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদেব, চাদরখানা আনি । আমি কোমর-খোলাই দিচ্ছি । অপমান করো না ।

জামা—রাখ তোব চাদব, দিবি তো দে আগে দে ।

আবু—কিঞ্চিৎ কোমর-খোলাই দিচ্ছি ।

জামা—দিচ্ছি কি ? ক'টাকা দিবি ? আগে টাকা আন, তবে বসবো, তোরা কথায় বসবো ? তেরা বাত্‌মে বায়ঠেগা ? চল (গলাধাক্কা)—

আবু—দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি ।

জামা—আন পাঁচজন্য কোমর-খোলাই পাঁচ টাকা আন, বসছি । তা না দিস, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারিমুখো করুবো । (ঘাড়ধারণ ।)

আবু—দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত করবেন না, আমি কোমর-খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা—টাকা দিচ্ছি তো কত বারই বললি, টাকা আন না।

আবু—আমি নিতান্ত গরীব। (কৌচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্ত এই দুটি টাকা।

জামা—(মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে-আলা! আমরা ভিক্ষে কবতে এসেছি? দুটো টাকা নেব? চল (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার-পাঁচটা মৃষ্টাঘাত)।

আবু—দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।

[নেপথ্যে (অন্তবাল হইতে ষ্ট্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) ত্যাগ আর কি করবে, যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু—(হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন, এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা—(টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীগণের প্রতি) বসো হে বসো।

আবু—(তামাক সাজিতে সাজিতে) আমি তো কোন অপরাধ করিনি; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথা মধো যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বললে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সহি। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাজা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবা হুকায়ে কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও ঘোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমের বা কি করেছি যে হক না-হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, “রাজা বাদী, উত্তর :নাদি!” আপনারা বসুন, আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামা—না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারি নে' যাব। যেমন আছে
তেমনি চল, হুকুমত কাজ করতে হয়। এ তো তোমার অপমার ঘরাণ্ড কথা
নয়, হুজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি
জানেন।

আবু—এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা—আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে, চলো।

(সকলের গাত্রোথান)

আবু—তবে চল, কপালে যা থাকে তাই হবে!

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

[বাগিনী ঝিঝট থাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?

অধীনতাপাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥

ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর

দেখে আসি একবার, প্রেয়সী-বদন ॥

তু'জন তু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে

কেহ মিছে বোষ ভরে, মারে অকারণ।

দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে

আনিতে দিল না মোরে আমারি বসন ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও

প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়—(তাস দেখিতে দেখিতে) বিস্তি নাই?

দ্বি মো—কি বড়?

হায়—বিবি বড়!

দ্বি মো—প্রত্যেক হাতেই যে বিবি বড় ? আপনার নিকটে বিবির বড় বাড়া-
বাড়ি দেখতে পাচ্ছি ! বিবি যে আর ছাড়ে না !

হায়—বিবি ছাড়ে বৈ কি, সাহেবই ছাড়ে না ! খেল না । দেখুন দেখি সেই বিবির
জন্তে কতখানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাহেবের পানে ফিরেও তাকায়
না ! বড়ের দশ আমার ।

দ্বি মো—আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এ তো চির-
কালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে ।

হায়—সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না । যাব জন্ত একেবারে
আহার-নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর
দেখতে ইচ্ছে করে না । বলবো কি, জীবন্তে মবার যাতনা ভোগ করছি ।
অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না ! কাবার বিস্তি !

দ্বি মো—(তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে, দেখে খেল ! গোচ বড়
ভাল নয় !

প্র মো—কাবার ইস্তক ।

দ্বি মো—তবে ঠ'ক্লেম ।

ত মো—কাজেই, ওঁদের পড়তা পড়েছে. পড়তা প'লে এই হয় । (গান)
'পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হৃদয় তখন, মেরে তাস করিতাম
হত লো ।' এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার ।

হায়—হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে ।
আব এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ
ধব (তাস একত্রে করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি ।

দ্বি মো—(হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই
সব হবে ।

হায়—কি হবে ? এত ভয় কেন ?

দ্বি মো—আবার ভয় কেন ? সব হবে—গোলামেই সব হবে ।

হায়—ওহে ! আমরা সাধে জিতছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওদিগের খবর
শুনেছ তো ?

দ্বি মো—কতক কতক ! কৈ এতক্ষণও যে আনছে না ? বোধহয় পালিয়েছে ।

হায়—পালাবে কোথায় ? একটু বসো না, এখনি দেখতে পাবে ।

তু মো—দেখবে, এই দেখ (তাম নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে !

হায়—এমন সময় এমন কাজ কল্লে ? হাতে না তুলতেই হন্দর—

প্র মো—(দূরে সন্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আনছে ।

হায়—চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এইবারে খেলাটা হয়ে থাক ।

(সন্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা—হজুর ! আবু হাজির ।

হায়—কাঁহা হায় ? পঞ্চাশ ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু ! তুই জানিস

আমি তোর সব কর্তে পারি ? তোর ভিটেয় খুশু চরাতে পারি ?

আবু—(ভয়কাতর স্বরে) হজুর ! আপনি সব কর্তে পারেন ; আপনি রাজা ;

জানজাহানের মালিক ; মাঙ্গেও মাঝতে পাবেন ; রাখলেও রাখতে পারেন !

হায়—তোর এতদূর আশ্পর্দা ? আমার সঙ্গে অ-কৌশল ? তুই ভেবেছিস কি ?

আমি তোকে সোজা কর্বই কর্ব ! কাবার পঞ্চাশ—জামাল ! হারাম-জাদাসে পঁচাশ-বোপেয়া, জ'ববানা আদা কর !

জামা—যো হুম !

আবু—(ঘোড়করে) হজুর ! আমি কি ঘাট করেছি ?

হায়—চোপরাও হারামজাদা ! আবতাক্ হামরা সামনে মুখোলকে বাৎ কাহতা-

হায় ! আভি লে যাও ! লে যাও ! (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘন্টে কা দারমিয়ান বোপেয়া আদা কর ।

জামা—(মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল !

মোল্লা—খোদাবন্দ ! আমায় মাপ করুন ।

হায়—মাপ ক্যা, অ্যা মাপ হ্যায় নাই ! জামাল ! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায়

ইট চাপিয়ে দে', তা না হলে ও ঢাকা কখনও টাকা দেবে না !

জামা—(চোদ্দ পোয়া করন)

আবু—খাঁ সাহেব, আমার মাথায় ইটই দিন আর আমায়ে কবরেই দেন, আমায়

দিয়ে এত টাকা হবে না । বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন !

হায়—হারামজাদা ! আমি তোর ঘর বেচবো ! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা

এনে দে। (সৰ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনি !

[একজন সৰ্দারের প্রস্থান]

আবু—হজুর ! আমি বড় গরীব, কুপুষ্টি গলায়, বিষয়-আশয় হজুরের অজানা কি ?

এত টাকা কোথেকে জোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ ! মাপ করুন !

প্র মো—কেন ? তোমার কুপুষ্টি এমন কে ?

দ্বি মো—আরে জান না, ছোটলোকের ঘরে যার একটু স্বন্দরী বিবি তার এক পুষ্টিতেই একশ' ! নিতিনি নতুন ফরমাস—নিতিনি নতুন আবদার !

প্র মো—ওর বিবি বুঝি খুব খুশ্বরং ?

দ্বি মো—উরির মধ্যে ।

হায়—তবে অবশি টাকা দিতে পার্কে । তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছে থেকেই হোক, টাকার তার অভাব কি (ইট নইয়া সৰ্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে ।

(সৰ্দার কর্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু—দোহাই সাহেব ! আর সময় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গে, ঘটি-বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি ! হজুর ! কপালে যা ছিল, তাই হোলো ! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হইনি ! এর চেয়ে মরণই ভাল !

হায়—চোপরাও, চোপরাও । (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেলবে ? না আর কাজ নেই ! (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান ।

চ মো—(নিকটে গিয়া) বলুন ?

হায়—(কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না ! গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন !

চ মো—যাচ্ছি !

হায়—যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব !

আবু—(চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্তা ! আমার জন্তে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্কুলি প্রদর্শন) দেব !

চ মো—(হায়ওয়ান আবার নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে ? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না !

হায়—(মুহূর্ত্তে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্তে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি !

চ মো—(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর ! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয় ? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা পরস্যা আদায় হবে না ! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আস্তক ।

হায়—তা হবে না, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না । তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পঞ্জন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক ! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই করবো ; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না ।

চ মো—আপনি সব করতে পারেন । আমার কথায় যে এই কল্লেন এতেই রুতার্থ হলেম !

(প্রস্থান)

হায়—জামাল ! আবুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখ । সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় কববো । এখন দেউড়িতে নে যা ।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি মো—আমি এ ঠার ঠৌর কিছুই বুঝতে পারছি না ।

“সীতা নাডে অঙ্গুলী, বানরে নাডে মাথ’
বুঝিতে না পারি নরবানরের কথা ।”

হায়—বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে !

দ্বি মো—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে ! তখন আর ঠারেঠোরে বলা চলবে না । “ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ দাদার কডি”—প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই !

হায়—(মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অবিকারী মশায় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না ।

দ্বি মো—চুপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্ছে না । যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে করবেন ।

হায়—সেজ্জা আপনাকে বড় ভাবতে হবে না । আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল, আড্ডায় যাওয়া থাক !

দ্বি মো—গুলিতে যে হাড় কালি হয়ে চললো !

হায়—চুপ কর হে চুপ কর ; বেশী ব’কো না, মাথা ঘুরবে !

(সকলের প্রস্থান)

পটাক্ষপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্তর-বাড়ি

(নূরমাহাব ও আমিবণ আসীনা)

আমি—(কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আবু কাঁদলে কি হবে । জমীদারের হাত
কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিলেই হবে ।

নূর—পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব ? আজ যে কবে প্যাগদাব কোমর-খোলাই পাঁচ
টাকা দিয়েছি তা আর কি বলবো । আর একটি পয়সাও ফিকির নাই,
জিনিসপত্র ঘব কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হতে পারে । তা এ
অবস্থায় কে-ই বা কিনতে সাহস কবে ? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই ।
আমি কি করবো ? এত টাকা কোথায় পাব ? তিনি কাছারিতে আটক
রইলেন, আমি মেয়েমানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো ? গরীব বলেও
কি তাব দয়া হলো না ? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তেঁা আমরা চক্ষেও
দেখিনি । আজ আর কোথা হতে দেব ।

আমি—না দিয়ে কি আর বাঁচবে ? জবিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের
মাটিতে পালাবে, মনেব কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়ো না !

নূর—পালাব ! সে তো পরের কথা, বাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই
মারবে, কত বাবই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে !
তাঁব হাতে একটি পয়সাও নেই (বোদন) । টাকাব জন্য তাকে মেঝে
মেঝে একেবারে খুন করে ফেলবে ।

আমি—মাটির হাকিমে মেঝে ফেললে তুমি কি করবে ? তাঁর নামে তো আর
সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পারবে না ? নালিশ কলে এই হবে,
একদিন তোমার ভিটেয় পুরুব কবে দেবে । জমীদারের সঙ্গে কার কথা,
সে কি না করতে পারে !

নূর—পারেন বলে কি একেবারে মেঝে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের বিচের ?
জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা
তা গেলো মাটি চাপা ! উল্টে দিনে ডাকাতি !

আমি—চুপ কর চুপ কর, ঐ কেষ্টগনি আসছে। যদি কিছু ওর কানে গে থাকে,
তবে এখনই বলে দেবে। যা গো, ওতো সামান্টি মেয়ে নয়!

নূর—তাই তো, ও আবার আসছে কেন? ওকে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে
যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কৃষ্ণগনির প্রবেশ)

কৃষ্ণ—“জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!”—মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা, তোমায় আজ এমন
দেখছি কেন গো? কৈদে কৈদে ছুটো চোখ যে একেবারে বাঙা করেছে,
ওমা, এ কি গো?

আমি—ও মবে গেছে, ও কি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধবে নে গেছে,
তুমি শোননি?

কৃষ্ণ—ছুই চক্ষের মাথা পাই মা! আমি কিছুই শুনিনি! ধবে নিসে গেছে, সে
কি? কেন, আবু তো দোষ করবাব লোক নয়।

আমি—শুধু ধবে নিয়ে গেছে! ধবে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হৈকেছে; আরও
কত অপমান কচ্ছে, টাকার জন্য মাথায় ইট দিয়ে খাড়া কবে নাকি
রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না; এত টাকা
কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কৃষ্ণ—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা-হা, এত করেছে? তা কৃষ্ণ! কি কববে বাছা!
জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—
জমীদার টাকা নেবার জন্তে ধল্লো আব এডান নেই। তবে একে ভয়ও
করতে হয়—তার কথা শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বায়।

নূর—দুর্জনে সর্কলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই
দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে
এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোথেকে দেব? ঘরদোর ঘটিবাটি বেচলেও
তো পঞ্চাশ টাকার অর্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার?
হাকিমে এমন করে বিচারে মািলে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি
হাকিমের পর হাকিম থাকতো, তবে এর বিচের হতো!

কৃষ্ণ—ও মা! হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে?
হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে

করবে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় করবে।—মা! বেলা
গেলো আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দাও, যাই, আর কি করবে
মা! (দীর্ঘশ্বাস)

নূর—(ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ—(পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নূর—(ভিক্ষা লইয়া ভিখারিনীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ—(ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে
পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জন্ত একেবারে পাগল। দেখ না, একমাস
হলো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়।

নূর—(সক্রন্দনে) আমি আবাব কি মনে করবো!

কৃষ্ণ—আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা
হলে যত রাগ দেখেছো একেবারে জল হয়ে যাবে। তুমি উল্টে আবাব তার
ডবল ঘরে আনতে পারবে!

নূর—আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি
আমায় এই কথা বলে? তাঁর কি এমন কষ্ট কবা উচিত? অধীনে আছি
বলেই কি এমন অধর্মের কাজ করবে? এই কি তার ধর্ম?—এ বড় দারুণ
কথা, আমা হতে এমন কষ্ট হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ
থাকতে আমা হতে এমন কুকাঙ্গ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখনও
যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি
দিয়ে মরবো!

কৃষ্ণ—(জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবাব জমীদার, এ কথা কে
শুনবে? কেউ জানতে পারবে না। জানলেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে
আনে মা! তুমি রাজার রাজধানীর মত স্থখে থাকবে! দেখ, জমীদার, সে
কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে;
জাববান কল্লোও তো করতে পাবে। সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বে
না! তবে কেন অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার
কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি যা বলেন, তাইতে
রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের
নজরে পড়ে কত কোণের বো পঙ্কজ এ কাজ করেছে! চৌবুরীদের কথা

শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত! পাড়া-পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘব কাউকেও ছাড়েনি! যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে! কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটে-মাটিতে একেবারে উলকুড উঠিয়ে দিয়েছে! মা, আমি তোমার ভালোর জগেই বলছি, মানে মানে থাকি ভাল, শেষে মানও যাবে আর জানতেও পাচ্ছে—বুঝেছ—

নূর—বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পারবো না, জান থাকতে তো নয়! আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন। (ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশবাস্ত গমনোত্তর)।

কৃষ্ণ—দাঁড়াও না শু—

নূর—আমি শুনবো না (আমিরণেব নিকট গমন)।

কৃষ্ণ—শুনলে না শুনলে না! আচ্ছা, যাই আগে, থা সাহেবের কাছে এই সতীপনাব যা শুনাতে হয় তা হবে অকল। শেষে জানতে পাবেন আমি কেমন ‘কৃষ্ণমণি’।

(সম্ভ্রমে প্রস্থান)

আমি—কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ?

নূর—তোমাব আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আব মুখে আব আনবো না। ছি, ছি, বড মানুষের এই আচরণ।

আমি—কি কথা, বল না শুনি?

নূর—তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি—(গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত!—পজ্জন্তু পার পায় না! তুমি আমি তো ছার কথা! বলতেও লজ্জা করে বন; শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইবে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে। যেখানে যান সেইখানেই মরেন, একদিনেব জন্তুও ছেড়ে থাকতে পাবেন না! বাঈ! বাঈ! বাঈ! বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বডলোক। সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার গাজ ফলে ফলে ওঠে! সংকাজের বেলায় এক পয়সা মা-বাপ! কিন্তু ওদিক কল্লতরু! চুল পেকেছে,

দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া টিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁতপড়া বাঘের মতন এখনও জিভ লকলক করে : সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাই ! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী যুগিনী, চাড়ালনী, কলুনী, চারজাতের চাবজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাতীরে রঙ্গিনী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিকির স্ত্রী ফেলে পাডাতেই কাল কাটালেন । তা বোন, এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই ! তা বলে আর কি করবে বল ? যে গতিকে পারে তোমাব মাথা খাবেই খাবে । তা এখন চল, ওদিকে—

নূর— ওদিকে আব তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি । আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত বকমেব কথাব ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে ! খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যাব পর পব মিছিমিছি শিকারের ছুতো কবে বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! আমি আজ সকলি বুঝেছি ! আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তা'ব দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমাব কি হবে ? আমি কোথায় পালাব ? এখন যদি আমাকে ধবে নিয়ে যায় তবে আমাব কি দশা হবে ? কাব কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই ?

পটাস্করণ

(নেপথ্য গান)

(বাগিনী বাগিনী—তাল আডার্ঠকা)

আব কে আছে আমাব

এ দুঃখ-পাথাবে কে বা হবে কর্ণধাব ?

যে তরিতে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,

না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, কুবি অনিবার ।

আমাবি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী

বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার ।

জুনেছি ভারতেশ্বরী, দুঃজন-দণ্ডকাবী

তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আদীন)

হায়—ওহে বসো বসো, কেবলই টানছো, দু-একটা গল্প চলুক !

তু মো—হুজুর ! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র মো—বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলেব গাড়িও চলেছে বটে, কিন্তু—

তু মো—(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি ?

প্র মো—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না ; ছমাস পরেই হোক,
আর ছমাস পরেই হোক, ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে । যত বেটাৱা গাড়ির মধ্যে
থেকে উঁকি মেবে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায়, তারা গৌরীৰ জল খাবেই
খাবে ! গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন ।

হায়—না হে না, ভাঙ্গবে না । শুনিছি ভাবি ভাবি লোহার খাম পুতেছে ।

প্র মো—হুজুর খাম পুতলে কি হবে ? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায়—নড়বড়ে, কি বকম ?

প্র মো—শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিশ কবেছিল যে পুলের ভার আর
সইতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেসলী সাহেব পুল বেঁধে
বেলাতমুখো হন, আমি একদিন ভেঙ্গেচুরে একেবারে কুমাবখালি গিয়ে
ধরোঁ !

হায়—এ তো গুনলেম । জোংদার বেটাৱা খ্রীষ্টান হবে বলে পাদবী সাহেবের
কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে ।

প্র মো—হুজুর, খ্রীষ্টান হওয়া মিছিমিছি । খ্রীষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়, তবে যে
গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে ! ওদের দলের যিনি কর্তা তাঁর
কোন মতেই বিশ্বাস নাই । আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক
রকমের লোক ! ভালমন্সব হোলে স্বভাব ষ্টরিত্র ওরকম হোত না । দেখতে
সেই লাঙল-ঘাড়ে চাষাদের মতো দেখায় ! মুসলমানের আবার আচার-
ব্যাহার ? ধর্ম কিছুই নাই বলতে কি, তারা কোরান কেতাব কিছুই মানেন
না । কোনো বিচার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ির ভেতরে
মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্তে মজবুদ ।

হায়—আমি জানি ওদের দলের যিনি কৰ্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কৰ্ত্তা।

প্র মো—হজুর! কুঠির কৰ্ত্তা একবার কৰ্ত্তার বড়কৰ্ত্তামু বার করেছিলেন। মাথায়
ইট চাপানো পর্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

“যখন দেখে আঁটাআঁটি

তখন কেঁদেকেটে ভিজায় মাটি।”

তারপর অমনি চোখ উন্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেভা হে?

হায়—সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র মো—সে কথা আর কি বলবো? কলিকালে সকলেই গেলো। বমজানের
টাদে রোজা বেথে মস্ত মস্ত কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেবা তসবি
টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে
অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায়—তা তো কইলেন, তারপর?

প্র মো—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার
জোরে কিনা হয়? ডিসমিস হয়েছে!

হায়—বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত নাচলো। শুনেছিলাম এ মোকদ্দমায় বড়
যোগাড় হয়েছিল।

প্র মো—যোগাড় করে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে?
হজুব, আর-এক কথা শুনেছেন? হিন্দুদের নিকে হোচ্ছে!

হায়—শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিন্দুব যেয়েব নিকে হতে পারে না? না
বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড কনে আর তার বরকে
বাসরঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেলছিল, ভাগ্যিস হারিশ ভাস্কর
ছিল তাই রক্ষে হলো। তবে—তবে তো বাবা! একেবারে আগুনে
পুড়িয়ে ফেলবে।

প্র মো—সে কথা যাক, এদিগের কি হলো?

হায়—আজ যে যোগাড় করেছি তা তো শুনিইছ!

প্র মো—হজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়—না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেন না, আমি কালও
দেখেছি, ওসব ভো কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্তে মিছিমিছি একটা

রটনা কছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি । এ কি ছেলের হাতের পিঠে ।

প্র মো—(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী ।

হায়—হোক, তায় ক্ষতি কি ?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায়—চালাক দাস ? খবর কি । গালভবে চিনি দেব না ছুটো ছিটে টানবে !

চ মো—(কুজ হইয়া আঙ্গুলী নাড়িয়া) ছিটেকোণার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায়—সে কি ? একেবাবেই যে শেষ করে ? বাপাবথানা কি ?

চ মো—কোনমতেই না । সে হাত মুখ নেড়ে কত কি বললে । আরো বললে, এদের উপর হাকিম থাকত তাহলে এব শোধ নিতেম । কি আশ্চর্য্য ! মেয়ে-মানুষের এমন কথা । কৃষ্ণমণি আরও অনেক বললে, সে কথা এখন বলবো না, আর এক সময় শুনতে পাবেন ।

হায়—কি ? তার স্বামীকে এনে কানমলা নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া কবে রেখেছি, আর তার এত বড় আশ্পর্দা । মেয়েমানুষের এত হেম্মত ! হাকিম দেখায় আমাকে ! তবে এব প্রতিফল এখনই দিচ্ছি । আব বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি । আপনি সর্দারদের ডাকুন ।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র মো—আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বৃকের পাটা ! আমি—

হায়—এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি । বড় সতী হোয়েছে । সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে ।

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

জামা—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়—দেউড়িতে যত সর্দার আছে সব যাও । মোল্লাকো জরুকো পাকাড় লাও ।

মোল্লাকে ছেড়ে দাও । আমি মোল্লা চাইনে, নূরমুহম্মদ চাই ।

জামা—হুজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই!

হায়—তোমাদের কি? এর জন্তে যদি আমার সর্বস্ব যায়, তাও স্বীকার,! নূর-
ম্নেহার কেমন সাচ্চা দেখবো! আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর
সহ্য হয় না! কি? মেয়েমানুষেব এত বড় কথা!

জামা—হুজুরেব হুকুম, চলেম!

(সেলাম পূর্বক জামাল-কামালের প্রস্থান)

হায়—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে!

(তৃতীয় মোসাহেবেব প্রতি --) গুহে টান না?

তু মো—(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)

গু থো—(আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়—গুধু গুধু টান। কেউ গান ধর না—

তু মো—আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।

গু থো—কর্ত্তা, আমি সারাদিন কিছুই খাইনি।

হায়—কিছুই খাসনি! এই যে এত ছিটে খেলি।

গু থো—কর্ত্তা, না জলটুকুও মুখে দিইনি।

তু মো—আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেগে যা! (দুটো
পয়সা দান)

(সেলাম পূর্বক গুলিখোরের প্রস্থান)

হায়—একটা গান ধর না।

তু মো—আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান
গাই।

(রাগিণী জঙ্গলা— তাল আড়খেমটা)

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে

দু'গালে চার চড় লাগাই তাব, দেখা পেলে

রাস্তার ধারে।

যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধ্বজা

মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড্ডায় এসে

আড্ডা করে।

তু-চার ছিটে উড়িয়ে দিলে চতুর্ভুজ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তাতে কেয়ার করে ?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেগি থুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে !

(প্র মো বাতীত সকলের উচ্চস্ববে গান)

প্র মো—এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তু মো—নয় তবে এটা কি ? ভায়া ভারি কলোয়াত।

প্র মো—ওরে তোব মাথা ! এটা আডাথেমটা আর রাগিণী শঙ্করা।

তু মো—কে জানে তোব খেমটা, আর কে জানে তোব শঙ্করা।

হায়—(উষ্ণ ভাবে) একটু চূপ কর হে চূপ কর ! (উচ্চস্ববে—) ওহে তোমরা
কি পাগল হয়েছ ? একটু চূপ কর না ! (মোসাহেব পূর্বমত উচ্চস্ববে
তাক্‌লাক্‌সিন ধিনিতাক)

হায়—(হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চূপ কর না ! তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই।
ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে ! (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ ? বড়
গোল হচ্ছে ! চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক !

সকলে—চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি ! (উচ্চস্ববে “আল্লা আল্লা”
করিয়া) (নেপথ্যে—উচ্চস্ববে—ছোট বিবি মলেম, (সকলের প্রস্থান)
আমায় নিয়ে চলো, এইবার গেলাম ।। দ্বিতীয়বার নেপথ্যে । এগোরে
নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারানীর তোরা এগোবে।

পটাস্কপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হাওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দারগণ এবং হাওয়ান আলী নূরমাহারের হস্ত ধরিয়া
দণ্ডায়মান । নূরমাহার হেঁট বদনে কম্পিতা)

হায়—কেমন ? এখন তো হাতে পড়েছো ! এখন আর কে রক্ষা করবে ?
বাড়িতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আর হাকিম নেই ? কই

কাকেও যে দেখতে পাইনে ! তোমার সে বাবারা কোথায় ? এখন দেখ না ! এসে রক্ষা করে না ! সতী সতী ক'রে বড় চুলে পড়তে ! এখন সতী কোথায় থাকবে ? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো জিরকুটি কল্লো কেন ? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে ? আরও এখনই দেখতে পাবে জান ! এতদিন আমার জানকে এত হয়রান করেছে জান ! এস তার প্রতিফল দিই ।

নূর—(স্বকরণে) আপনি সব কর্তে পারেন । আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ ! জাত মান রক্ষা করতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি । আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ ! (রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন !

হায়—এই তো কচ্ছি ! (নূরমাহারকে টানিয়া লইতে উত্তত)

নূর—(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমার ছেড়ে দিন ! গলায় কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন । আমি আপনার মেয়ে ! আপনি আমার বাপ ! আমার কাপড় অসামান হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন ।

হায়—(কমাল ছাড়া মুখ বন্ধন করিতে কবিতা) কাপড় নেওয়াচ্ছি !

নূর—(গোড়াইতে গোড়াইতে) পায় ধ-রি—আমা—

হায়—(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা তুইজন হারামজাদীর হাত ধরুন, আমি চুল ধবে টেনে নিচ্ছি !

(তৃতীয় ও চতুর্থ মোসাহেব বেগে হস্তধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক নূরমাহারকে ধরে অগ্রসর ।)

(প্রস্থান)

স্বি মো—(ক্ষণচিন্তাব পব) হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি । কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগতেই হবে !

জামা—দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লো আর অতুল কল্লো পারিনে । এ কাজটা বড়ই অগ্ৰায় হচ্ছে । মৌল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরান । এ কাজটা বড় অগ্ৰায় হচ্ছে ! কি করি ! এর অধীনে থেকে একেবারে সর্বনাশ হবে ! এর তো দিগ-বিদ্বিগজ্ঞান কিছুই নাই, অগ্ৰায় হোক, অগ্ৰায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল

থাকাই তার। আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের
ওরূপ ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনপ্রবেশ)

হায়—ওহে, তোমরা এখানে কি কচ্ছে? ওদিকে যে—যাও না এমন দিন—!
প্র মো—আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

হায়—(সর্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুশী করছো, আমি মনের মতো ধুন্ধী
করবো।

জামা—হজুর আমবা হকুম পেলে কাউকে ভয় কবিনে, তবে দেখবেন শেষে যেন
একেবারে দয় ডুবে না মবি! সময় বড় খাবাপ, মাবেক আমল হলে এতো
ভাবতেম না।

হায়—তার জন্তে ভয় কি? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল! জামাল ওকে
কি বকম ধল্লো?

জামা—আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম! কোনমতে আর ফাঁক
পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি
বাব থেকে আসি। আবার শুনলুম যাও, চাঁদনির বাত ভয় কি? তারপরই
দেখি নূরমাহার বাইরে এয়েছে! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূতো শূতো
আনতে লাগলুম! ও কেবল মুখে বল্লো, 'ছোট বিবি মলেম!'...তারপরই
আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন!
হজুর, আমবা যেন নষ্ট না হই!

হায়—তোমাদের ভয় কি? ঢাকার অসাধা কি আছে বল দেখি?

জামা—হজুর। সে ষথার্থ, কিন্তু আমবা গরীব, সেইটি যেন মনে থাকে।

হায়—মনের মত বখ শিখ কববো।

(প্র মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র মো—হজুর সর্বনাশ হয়েছে।

হায়—কি হলো?

প্র মো—আর কি দেখছেন, নূরমাহার কেমন কচ্ছে, বুঝি ঝাচে না।

হায়—বটে (ত্রস্তে উঠিয়া)

প্র মো—তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল বাতিরেকে অবশিষ্ট সর্দারগণের অপর দিক দিয়া
বেগে পলায়ন)

জামা—অদৃষ্টে কি জানি কি হয় ? গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। (হায়ওয়ান
আলী মোসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধবিয়া নূরুন্নাহারকে লইয়া প্রবেশ)

হায়—(মাটিতে বাথিয়া) যথার্থই কি হবে, না ওর সব মিছে ? ও কিছুই নয়, ও
এক কাপ করে বয়েছে !

দ্বি মো—না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল ! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড়
কচ্ছে !

হায়—(নিকটে যাওয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; তলপেট অতো
নড়ে কেন ?

নূব—(মূঢ়স্বরে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিলো । নাবীকুলে জন্ম নিয়ে
সন্তোষ বক্ষা করতে পারেন না । হায়, এই জন্মই কি আমার জন্ম
হয়েছিলো ! জন্মেই কেন হবে গেলাম না ! তা হলে এত লাঞ্ছনা সহিতে
হতো না ! কি কবি উপায় নাই, এ দুখে কাকে জানাব ! এমন সময়
প্রাণদন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না ! মা-বাপের মুখও দেখতে পেলাম
না ! প্রতিবেশীবাও আমাকে দেখতে পেলো না ! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা !
তোব মনে এই ছিল ! জমীদার হয়ে এমন কাজ করে । ধর্মের দিকে
চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর প্রাণে নয় । হায় হায়, এদের দমনকর্তা
কি আর কেউ নেই । এদের উপরে কি আর হাকিম নেই ! হায় হায়, জাত
গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল
তা নয় । পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো । খাঁ সাহেব ! আপনার
মনে এই ছিল ? এই কল্লেন ! খোদা আপনার বিচার কববেন ! শুনেছি যে
মহারানী সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড় । আমরা যেমন
তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তার প্রজা । তিনি কি এর বিচার
করবেন না ? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি
বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দোরাহ্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে
পাচ্ছে না ? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা ? আমরা গরীব

বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার—আ—মা—সয় না,
মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—তো—পা—য়—(মৃত্যু)

হায়—ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই।
মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটের-
টাণ্ড মলো! (বুকে হাত দিয়া) এখন উপায়?

(প্রথম মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি মো—আর উপায়। তখনই তো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা
করে করবেন। এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো!

হায়—চূপ চূপ। খুন খুন কবো না। যা হবার তা হলো, এখন কি করা যায়।
অদৃষ্টে মা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে
থাকতেই এব একটা উপায় করা চাই।

দ্বি মো—আমার বুদ্ধিস্বদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। যা
আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়—জামাল! তোমার বিবেচনায় কি হয়?

জামা—আপনি যে ইকুম করেন তাই করব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্রথম মোসাহেব এবং নিদ্রোস্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরা—আরে পাজি রে! এমন কাজ কল্লি? একেবারে হাবু খাঁব নাম ডুবালি?
তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিবকালই কি তোর এইভাবে গেলো! লক্ষ্মী-
ছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি করতে হয়? যত
গোঁয়ার একটাই জুটে এই কাজ করেছে। এখন মুখে কথা নাই। তোব
জ্ঞান সর্বনাশ হবে। পূর্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল
হয়েছিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিল! (দ্বিতীয়
মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাজিরা এখন কেউ নেই।
সর্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বিতীয়
মোসাহেবকে মৃষ্টাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কল্লি। তোদের
কুপরামর্শতেই হয়েছে।

দ্বি মো—দোহাই আল্লাহ! কোরানের কিরে! আল্লাহর গা ছুঁয়ে বলতে

পারি, আমি দফায় দফায় মান! করেছি, এমন কাজ করবেন না। তা কি উনি শুনে, উনি না একজন!

সিরা—জামাল! তোরাই সর্বনাশ কলি! তুই কি এই বদমাইশদের দলে মিশে গেছিস?

জামা—কর্তা, আমি কি আর করবো? হুকুম কলে তো আর অতুল করতে পারিনে।

সিরা—আর সকল বেটাবা কোণায়?

জামা—সকলেই পালিয়েছে।

সিরা—(উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেঁটমুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? ঝাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কৰ্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না! পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন! আর আমবাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝি না।

জামা—তা বলে আর কি হবে? এখন ঝাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা—এক কাজ কবা যাক, বাত শেষ হয়ে এলো। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ির উত্তর দিকে খেজুরবাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভাব হলো—নেও, নেও উঠ, উঠ, আব দেরি করো না।

দ্বি মো—হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফরসা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুকুটধ্বনি) ঐ হয়েছে, আবার রাত নেই, ধর ধর—।

সিরা—জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা—(কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হয়েছে! ঐ সেই প্রাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়েমানুষকে নে বেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল কামাল কর্তৃক শবদেহ-লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান)

পটাক্ষপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতাল)

চেতরে চেতবে চিত । এই তো দিন ঘনায়ে এলো
 সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ।
 মায়াবিনী এই নিশি, আসলো ঘুমপাড়ানি মাসি
 ভোগ দিয়ে সর্বনাশী, সব কথাটি ভুলিয়ে দিলো ।
 শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তাবা নিদ্রাযোগে ?
 মনে বেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল !
 ছুটলোকে বেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির ঢেলা
 কেউ চুনি কেউ কামের খেলা, খুন কবে কেউ লুকাইল ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক

আবুমোল্লাব খেজুবাগান

(কনস্টবলদ্বয় নুরুন্নাহাবেব শবের পাশ্বে দণ্ডায়মান)

প্র কন—বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না !

দ্বি কন—উঠতে পাল্লে তো আসবেন !

প্র কন—সে তো আর নতুন নয় ।

দ্বি কন—তাতে কি আর নতুন পুরান আছে ; বেশী মাত্রা হলেই দিন কাবার ।

আবার যে লক্ষ্মী কাঁধে ভর করেছেন তিনি তো—জানই আর কি !

(কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র চা—এ গাঁয়ে আর বাস্তবিক হয় না । গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা
 করেছে ।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম তো শুনেছি ।

এরা যেমন বাবা !

দ্বি চা—মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?

প্র চা—আমি কি দেখতে গেছি ?

দ্বি চা—বুঝিছি বুঝিছি, ও ব্যাটা বড় শয়তান । বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের
 বেলা আমাদের বাড়ির পাছ কানোচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায় ! পাছ-

দুয়ার দিয়ে বাড়ির মন্দির আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি,
তুমি শোননি, ঐ সেই দহিনপাড়ার জোলা বড় হাকিমত করে বলেছিলেন।
উনি তো তাব মেয়েকে দেখে বাড়ির সামনেই ঘোড়েন, সে বললো হজুর!
দিনে মুনির বলে মানবো, নাস্তিবে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে
জাত ক'রো না।

(ইনস্পেক্টরের সহিত আবুগোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি, ঐ সাহেব (পলাইতে উত্তত)

ইন—খাড়া বাও, কাঁহা যাতা হায় ?

প্র চা—(হাঁকা ফেলিয়া কবজোড়ে) কর্তা। আমবা কিছু জানিনে।

ইন—(শবেব নিকটে যাইয়া) এ মেয়েলোকটি কে ? কি হয়েছে ? এ রকম
এখানে পড়ে কেন ?

প্র চা—মবে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আব—ধর্ষাবতার! আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমাব মাথায় বাড়ি হয়েছে।
হজুর! আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায়! আমার
কি হবে ?

ইন—(কনস্টবলদেব প্রতি) তোমবা কি অবস্থায় দেখেছো।

প্র কন—এইভাবেই দেখেছি।

ইন—লাশ উন্টাও।

প্র কন—(ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইন—কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র কন—হজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ
ফুলো, আব থান থান রক্ত।

আবু—হায় হায়। আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়!
খোদায় এই করে এই দেখালে!

ইন—হুজুন কুলি বোলাও।

প্র কন—ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইন—আচ্ছা লে আও! ভাস্কর সাহেবকে লাশ পাঠাতে হবে।

প্র কন—(দুই চাষাকে ধৃত করল) তোদের লাশ নেজেলায় যেতে হবে।

প্র চা—কর্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পারবো না।

দ্বি চা—আমাদের জ্ঞাত যাবে, আমি পারবো না।

প্র কন—কি পারবিনে, পারতেই হবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবিনে, উঠাও লাশ
উঠাও।

দ্বি চা—না বাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমরা পারবো না, আমাদের
জ্ঞাত যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র কন—(মুঠোঘাত কবিয়া) নে বাঞ্চত, লাশ নে।

দ্বি চা—এই নিচ্ছি।

[চাষাঘরের লাশ লইয়া প্রস্থান]

ইন—জমিদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র কন—হজুর, তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইন—আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান]

পটাস্কপ ৭

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিনাসপুর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোলা এবং
উকীল মোস্তার দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

ম্যাজি—হামি আর সাক্ষী চাই নে।

কোর্ট ইন—(নিকটে থাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত
আছে!

ম্যাজি—নেই, সাবুদ হয় (ফরিয়াদির মোস্তারের প্রতি) টোমরা কুচ সাওয়াল
হায়?

মোস্তা—ধর্মাবতার (গাত্রোথান)

উ কি—(আসামীর পক্ষে) ধর্মাবতার—

ম্যাজি—ও হ'টে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা শেষে হটে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তার—(স্বস্তিক চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধৰ্মাবতার! এই মোকদ্দমার বাদি আবুমোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার জ্বীকে বলপূৰ্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদুহেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, সেই জমিদার আসামী আব কয়েকজন আসামীকে মৃত্যু করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধৰ্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার মপস্বলে প্রজার হর্তাকর্তা জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিষ্পত্ত্য করিয়া থাকে—প্রজার পুরস্কার বিবাদ নিষ্পত্ত্য হ'ক বা না হ'ক আপনি নজরের টাকা হলেই হল। প্রজার শাসনভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্য হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচাবের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমুদ্রি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জালিয়ে ছারখার করে দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি—চুপ, চুপ আসল কথা বল—

মোক্তার—খোদাবন্দ ধৰ্মাবতার! এই মোকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, স্মরণ প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে জজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধি কি যে মোকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শন) ইতিপূর্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু জ্বীকে জাবরাণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। ধৰ্মাবতার! ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন।)

উকীল—ধৰ্ম্মাবতার ! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ ব'কে গেলেন এ মকদ্দমা সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই । জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাখ্যা করে—জমীদার প্রজার সৰ্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই ; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধৰ্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই । তার দাবা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না । কেবল মনোবাদ সাধন জন্ত এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমাব মক্কেল নূরুল্লাহাব আওরতকে জবরণ বলাৎকাব কবেছেন. আব সেই বলাৎকাব কবেছেন, আব সেই বলাৎকারে তাহাব প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফবিয়াদী আবু মোল্লা বড ফেরেববাজ ।

আবু—(গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধৰ্ম্মাবতাব ! আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধা কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি ? হুজুব সে—

ম্যাজি—চুপ চুপ—(কোর্ট সব ইনস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড ।

কোর্ট ইন—(রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফবিয়াদীর জীৱ নূরুল্লাহাব আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজ্জদীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্ত ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী নাল বিহারী সাহার জমাজমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ থানদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে তাহাদের অহুগত ও বাধা হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নিষাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্ত আপন চাকর ও অহুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাতে ফবিয়াদীর প্রতি বাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের জী প্রস্তাব করার জন্ত, যর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপূর্বক ধৃত করিলে ঐ জী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয়

প্ৰদৰ্শন দ্বাৰা ইটাইয়া শ্ৰী মজুকুৰাব মুখাদি বন্ধ কৰিয়া হতাসাঙ্গে শূণ্যভাবে আপন বাহিৰ বাটৰ পূৰ্ণ দ্বাৰি বৈঠকখানা ঘৰেৰ মধ্য লইয়া ও মুখ বন্ধ কৰিয়া বলাংকাব কৰা ও নানা মত অত্যাচাৰ কৰিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা—কৰা স্পষ্ট প্ৰমাণ ও প্ৰকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামীগণ ভাৰতবৰ্ষেৰ দণ্ডবিধি আইনেৰ ৩৫০ । ৩৫৪ । ৩০২ । ৩৭৬ ধাৰাব অপৰাধ ক্ৰমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্ৰে ফৌজদাৰী আদালতে চালান হইয়াছে ১ নংপ্ৰধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ি ঘৰ ছাড়িয়া পলায়ন কৰায় অনেক তলাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্ৰাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্ৰেৰণ কৰত ধৃত কৰাৰ পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফাৰাম সহ আবশ্যকায় সাক্ষীগণকে হজুবে পাঠানো হইল। আব সিরাজ আলী মজুকুৰ অপৰাবী দ্বাৰায় বাদীৰ শ্ৰীৰ মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অৰ্থাৎ দণ্ডবিধি আইনেৰ ২০২ ধাৰাৰ অপৰাধে কৰা প্ৰকাশ ও যে জন্তু জামানত থাকাতে তাহাৰ গ্ৰেপ্তাৰি ওয়াৰেন্ট প্ৰচাৰ হওয়াব জন্তু কোর্ট ইনস্পেক্টৰ মহাশয় দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া বিদিতাৰ্থ নিবেদিলেক হজুব মালিক নিবেদন ইতি। সন তাৰিখ মাস।

ম্যাজি—ডাক্তাৰ সাহেবেৰ মাৰ্টিফিকেট কোথায় ?

কোর্ট ইন—নথিতেই আছে।

ম্যাজি—(নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছু কাল পবে দায় লিখিতে আৰম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টৰ দ্বাৰা পাঠ।)

কোর্ট ইন—ভকুম হইল যে গড়হাজিৰা আসামীগণেৰ নামে ওয়াৰিন কৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হয়, আৰ হাজিৰা চালানী আসামীগণকে দায়বা সোপৰ্দ্দ কৰা গেল। সন তাৰিখ মাস।

পটাক্ষপণ

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক—

ৰিলাসপুৰ জিলাৰ সেসন আদালত

[দায়বা বিচাৰ]

(জজ, উকিল, ব্যাৰিষ্টাৰ,—আসামী, সাক্ষী, পেঙ্কাব, আৱদালী, জুরীগণ ও দৰ্শকগণ)

পেস্কা—(জজের নিকট গিয়া) হজুর, জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই একজন গর-
হাজির।

জজ—ডেকে আনতে পার।

পেস্কা—(দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ—(নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা—আপনি জুরি হতে পারেন?

জজ—আপনি কে আছে?

দর্শ—খোদাবন্দ—আমি—আমি (যোড হাত) না না খোদাবন্দ, কিছু কস্তর নাই,
আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে-মুড়কী পতন)

জজ—এই, টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শ—দোহাই ধর্মান্বিতার! আমার কোন কস্তর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই;
আমি কোঠা কিস্তে যাচ্ছি। পথে শুনলেম যে আবুমোল্লার বৌয়ের খুনি
বিচার হচ্ছে। হজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্মান্বিতার! ভয়ে
আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানিনে হজুর! দোহাই ধর্ম—

জজ—নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোথান-
পূর্বক শিশ দিয়া তুডি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ—(সক্রন্দনে) হজুর! দেশের মালিক যা মনে করেন তাই করতে পারেন,
কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ—(ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমার নাম ক্যা হায়?

দর্শ—(সরোদনে করযোড়ে) আবুজান বেপারী হজুর। খোদাবন্দ—

জজ—টোম ঐ চেয়ারমে বয়ঠো।

আব—(বেগে পলায়নোত্ত)

জজ—পাকডো—পাকডো। (আবদলী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসন)

আব—(চেয়ারের একপাশে উপবেশন করিয়া) হজুর! আমি কিছুই জানি না,
সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কিছু জানি না।

জজ—চুপরাও!

আব—এইবারই গেলুম! (নিস্কণ্ণ)

(বিচার আরম্ভ)

পেশ্কার—[জজসাহেবের নিকট করযোড়ে] হজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে ।

জজ—লে আও

পেক্ষা—(আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক ।

(আদালত রীতিমত আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোকরানো)

[টিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ি, তসবি গলায়, হাতে যষ্টি,

বৃদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফপাঠ]

জিতু—আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের ফৈত মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর,
মোল্লাকি ব্যবসা ।

জজ—মোল্লাকি কি ?

জিতু—কোরান প'ড়ে আমরা মুরিদকে শোনাই, দুটো আখেরের কথা কই বাতে
দীন-দুনিয়ার ভালই হবে ! বিয়ে-সাদীর কলমা পড়াই । মানিকপীরের
সিম্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি, হজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ—(গাত্রোখান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে ?

জিতু—আমি আবুমোল্লার কুটুম । যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, আমি
সেদিন আবুমোল্লার খলিফা ঘরে বসে সারারাত্তি আল্লা আল্লা ক'রে
জেহৌর করেছি, আমি রাতে ঘুম পাড়ি না ।

জজ—টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর ?

জিতু—সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি ।

ব্যাবি—নেই, ও বাত নই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হয় ?

পেক্ষা—হাকিম জিজ্ঞেস করছেন সে বাত্রে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিল ?

জিতু—সে রাত্রে কোন গোলমাল হয় নাই, এসকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা
এদের বাদিয়েছে ।

ব্যাবি—টুমি মস্কামে গেয়া ?

জিতু—জোনাব ! গেছলাম । আমি চারবার আজ করেছি ।

ব্যাবি—মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে ?

জিতু—জানবে না ক্যা ? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে ।

ব্যাবি—আবু কেঁও মারা ?

জিতু—ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল ।

ব্যারি—হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু—(তসবিতে কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা, এমন লোক তুমিয়া
জাহানে আব নাই। বড় দিনদার, বড় দাতা, মস্কায় যাঈবার সময়
তামাবে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।

ব্যারি—হায়ওয়ান আলী নূরনেহারকে মাঝিয়াছে ?

জিতু—(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা ! সে কি এমন কাজ
করতে পারে। তা কখনো হবাব নয় !

ব্যারি—আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুঁয়া জিতুব প্রশ্নান]

[নামাবলি গায়ে, কোপিন এবং বহিবাস পরিধান, সর্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে
গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়াজালী, কক্ষে বুলি, হরিণাম জপ করিতে
কবিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হবিদাসেব প্রবেশ এবং পূর্বমত হলফ পাঠ]

হবি—আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস ; বয়স ৪০।৫০ বৎসব। আমি
বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি—আবুমোল্লাব স্ত্রীকে কে খুন ক'বেছে তুমি কিছু জানে ?

হবি—(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানি না।

ব্যারি—কিছু শুনিয়াছে ?

হবি—শুনেছি হজুর।

ব্যারি—ক্যা শুনা হয় ?

হবি—হরিবোল ! হরিবোল ! শুনেছি আবুমোল্লাই ঘেরে ফেলেছে। উঃ কি
পাপিষ্ঠ !! হবিবোল হরিবোল !

ব্যারি—আবুমোল্লা কেমন লোক ?

হবি—সে বড় ফরাবাজ, একদিন আমি—

জজ—তুমি কি ? ফেরব কবিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ববৎ তুড়ি ও শিশ দিয়া
নৃত্য এবং ইংবেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্তপূর্বক
উপবেশন)

তুমি—একদিন তুমি কি ?

হবি—হজুর ! একদিন আমি, ভিক্ষা করতে গুদের ঝাড়িতে গেছিলাম। ফাঁকি

দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে
ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড ফেরেববাজি ! ওর
জানায় গাঁয়ের লোক জলে মল। রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ।

ব্যাৰি—মোল্লার জীব চরিত্র কেমন ছিল ?

ব্যাৰি—(ছুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ। আমার মুখ দিয়া সে কথা
বেরুবে না—(দীর্ঘনিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্তু—দীনবন্ধু !

ব্যারি—এই আসামীরা কেমন লোক ?

হবি—বড ভাল মানুষ। আব সেই জমীদার বডলোক, বড ধার্মিক। গরীব
লোকদেব প্রতি তাব ভারি দয়া। আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবেব
বাড়িতে যান তিনি কাপড়, টাকা, পয়সা, চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন।

বা উ—তোমাব বৈষ্ণবী নাম কি ?

হবি—কৃষ্ণমণী।

বা উ—ছজুর সেই কৃষ্ণমণী।

জজ—হাঁ, হাঁ, আমি জানে।

(ডাক্তার ক্যানিংহাম সাহেবেবের প্রবেশ)

জজ—How are you ?

ডাক্তার—Thanks ! Quite well.

জজ—Please take your seat. How is Mrs. CUNINGHAM ?
I have not seen her for a long time. (মৃদুস্ববে) More than
six months.

ডাক্তার—Thanks ! She is in delicate state and this is the
seventh month.

জজ—Oh ; (ঈষৎ হাস্ত করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তাঘাত) Do
you like to go soon ?

ডাক্তার—Yes, she is alone.

জজ—(আসামীর ব্যারিস্টারের প্রতি) DR. CUNINGHAM is in hurry
and I think it is better to take his deposition first.

ব্যারি— Yes, I have no objection.

বা উ—(দণ্ডায়মানপূর্বক) হুজুর হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ—Wait, wait (ঐষংক্রোধে) Baboo, can't you wait (মৃদুস্বরে) natives ! Let me take DR. CUNINGHAM's deposition first.

(বাদীর উকিল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তার—(বাইবেল চুম্বনপূর্বক) My name is F.B. CUNINGHAM; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehari, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmoshala police station. No marks of external violence except on the genital profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly congested on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ব্রহ্মভাবে) In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain.

জজ—(মৃদুস্বরে) Must be brain disease. (বাদীর উকীলের প্রতি)
টোমার কুছ সওয়াল আছে ?

বা উ—ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটি অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল ঐ কারণে কি ব্রেন ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ?

জজ—হাঁ, কেন হবে না ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে, হোবে ।

বা উ—হুজুর ! ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ।

জজ—(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট ! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the Vagina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তার—(উচ্চহাস্তপূর্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of spleen then why not the soft blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ—আর কিছু সওয়াল আছে ?

বা উ—হজুর, আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। (উপবেশন)

জজ—(ব্যারিস্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. CUNNINGHAM ?

ব্যারি—(সাক্ষ্যে) To whom ? To DR. CUNNINGHAM ?

জজ—Yes.

ব্যারি—Certainly not ; he is perfectly right.

জজ—(ডাক্তারের প্রতি, Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNNINGHAM.

ডাক্তার—Thanks.

[প্রশ্নান]

ব্যারি—(হরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখছ ?

হরি—গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ—(ঈষৎ হাস্তপূর্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হরি—নাম সহ করতে পারি।

জজ—আচ্ছা, দস্তখত কর।

[নাম সহ করিয়া হরির প্রশ্নান]

জজ—(বাদীব উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিটকাল উকীলের বাজনা বক্তৃতা]

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিস্টারের ইংরেজী বক্তৃতা]

আবু—দোহাই ধর্মাবতার—আমাবু প্রতি বড় অগ্নায় হয়েছে—বড় দোবাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি—টুম চোপরাও।

আবু—আমার বাড়িঘর সব গিয়েছে, জাতও গেছে হজুর ; আমার কিছুই নাই ;
(ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ—চুপবাও ।

আবু—দোহাই ধম্মাবতাব । আমাব প্রতি বড অন্টার হয়েছে—আমি নিতান্ত
গরীব ।

জজ—চুপবাও । (কিঞ্চিং পরে জুরীগণের প্রতি) Is the case guilty or
not ?

জুরি—(যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি—(হো হো শব্দে হাস্তপূর্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তেকরণ এবং জজের
একটু খোসামোদ)

জজ—(রায় লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিসমিস্—আসামী-
গণ থালাস । (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

ব্যারি—(হাস্ত করিয়া) সেক্ষেত্রে ।

পটেক্ষপণ

(নটীর প্রবেশ)

নটি—(স্বগত) হায়, হায় এ কি হলো ? হা ভগবান তুমি কোথায় ? হায় হায়
এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল ।

হায়রে পাতকি অর্থ ! তোব লাগি ভবে—

স্বধু তোব লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !

অবলা অমূল্য বস্ত্র সতীস্ব রতন,

হরিল জুস্মতি পাপ পাষণ্ড কর্কর

জমীদার ! ধম্মাসনে হলো না বিচার !

কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই

এ বারতা ? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে—

কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?

দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—

জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব নেত্রবান্,

সর্বদশী মহেশ্বর, জগত-কারণ,

সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশাস্তা বিভু,

জৈলোক্য ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
 অল্পস্বত ধর্ম বার সदा আজ্ঞাকহ,
 তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
 এইভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
 হবে না কি দারিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
 হবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ?
 আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
 ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
 যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
 কর মা কর মা দিনে কর মা নিস্তার ।

সঙ্গীত ।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা ।
 কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী ।
 অবহিত অবিচার আব যাঁচিনে মরি মরি ॥
 থাক মা সাগর পাবে কভু না হেবি তোমারে,
 বক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি কবি ।
 অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
 সে সতীর এ দুর্গতি, উছ মরি মবি !
 সবল দুর্বল পরে, হেন অত্যাচার করে ?
 রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণ ধরি ॥
 দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
 দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
 জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিদ্ধ পাবে থাকি,
 করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী ।

(নটের প্রবেশ)

নট—প্রিয়ে ! আর দুঃখ করলে কি হবে ? আমাদের কথা কে শুনে ? আর কেইবা
 আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয় ? হায় ! চ'থের উপর এমন অগ্রাঘ হলো ?
 হায় ! হায় ! দিন-দুপুরে ডাকাতি হলো ! দীনহীন প্রজার ধন, মান,

প্রাণ পর্যাস্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক
আমাদের আর সে কথায় কাজ নাই। আমাদের কথায় কেবা কান দেয় ?

নটী—বলেন কি ? আমাদের এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি
কি কেউ নজর করবেন না ?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লাব প্রবেশ]

নট—আবার কি হয়েছে ? উঃ কি ভয়ানক।

আবু—আমার সর্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার
বাড়ি ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে ওয়ারাণ ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার
লক্ষ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়। আমার ধন মান সকলি গেলো, বিষয়
সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে
দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন)

নট—কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুর !!!

নট নটী—(উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।

উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥

কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,

নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি ?

ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,

তম কর নিবারণ নিবেদন কবি :—

তুমি দেব সর্বময়, কাতরে করুণাময়,

নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি ॥

॥ ষবনিকা পতন ॥

এর উপায় কি ?

(প্রহসন)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

(নয়নতারার ঘব, নয়নতারা আসীনা)

নয়ন—(পান সাজিতে সাজিতে) একথানা ঢাকাই শাড়ি দেখিয়ে পাঁচজন্য কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। মার বিয়ে হয়েছিল কিনা—জুনি নাই। বাবা কেমন চিনি না, কখনও দেখি নাই; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ কবেছি। সোনা-রূপার অলংকার যা আছে, সকলি আমি করেছি। এত করেও ‘হাবা’ কথাটা মায়ের মুখ থেকে সরাতে পাল্লেম না। ফাঁকি দিয়ে আজ কিছু টাকা হাত করে, মাকে দেখিয়ে বলবো যে, মা! দেখ দেখি তারা নাকি কিছু বোঝে না। এখনি এর একটা ফন্দি এঁটে বাখি। (পান সাজা বাখিয়া একটু চিন্তা) দূর কর, আর কি কবব, জামাইয়েব ঢাকাই শাড়িই আমার লক্ষ্মী, এই শাড়ি দেখিয়েই বাজি মাত করবো। খাটানও কল, খাটাতে জানলে আর পট যায় না। আজ বড়দিন, বাবু যে কম করে বড়দিন করবেন, সে তো কথাই নয়। বড়লোক বড় রকমেই বড়দিন করে থাকেন, এখনও যখন দেখছিনে, তখন বোধ হচ্ছে যে, একেবারে তয়ের হয়ে আসছেন। তা আমি আগেই একথানা মলা কাপড় পরে এখানা সামনে ফেলে রাখি। (কাপড় পরিতে গমন)

(অঙ্ক দ্বার দিয়া জগার প্রবেশ)

জগা—ও মা!—বাবু আসছে। কৈ, কোথা গেলে গা। (স্বগত) যাক মরুগগে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক, ফাঁকতালে গোটাকত পান চুরি করি (কয়েকটা পান লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) কৈ গো, ও মাঠাকরন ! বাবু এসেছেন। ওগো বাবাঠাকুর এসেছেন।

(অঙ্ক কাপড় পরিয়া ঢাকাই শাড়ি হস্তে নয়নতারার প্রবেশ ।)

নয়ন—বাবু কৈ ?

জগা—এই এলেন. বেশি দূরে নয়। আমি দেখেই খবর দিতে এসেছি।

নয়ন—(শাড়ি ভাঁজ কবিত্তে কবিত্তে) আসছে আশ্রক, তুই বিছানাটা ভাল করে ঝেড়ে তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর খবরদার ! কাল রাত্রে কথা মুখে আনিসনে. তোরা পেটে তো ছাই কিছুই হজম হয় না। তুই একপ্রকার পাগল। (কাপড় সম্মুখে বাখিয়া দুঃখিতভাবে উপবেশন) যা বেটা যা, তামাক সেজে আন, ঐ কথা শোনা যাচ্ছে।

(কিঞ্চিৎ পরে বাধাকান্ত এবং মদনবাবুর প্রবেশ)

জগা—ও বাবা—আজ যে মেজেষ্টার সাহেব সেজে এসেছে।

(হুঁকা লইয়া প্রস্থান)

রাধা—বডবৌ, প্রাতঃপ্রণাম। মুখে কথা নাই যে? মাথা ধরেছে? না পেটে ব্যথা উঠেছে? এ কি? কথাটা কি? লক্ষণ ভাল নয়, যাত্রার ফল বুঝি ফলে যায়। ও মদনবাবু! বড়দিনে, আপনাকে নিমন্ত্রণ কবেছি। বেশ বড়দিন কল্লেম। যে গোল দেখতে পাচ্ছি এত শিগগির মেটবার নয়। আমাব কপাল! আর তোমাব মাথা। দিন বুঝেই কল বিগড়েছে! দেখি! বউ, কথা কও। ও বউ, কথা কও।—

মদন—আর বউ কথা কও—মনে ব্যথা না পেলে কি শান্তুড়ী আমার বউ হয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন?

রাধা—(নিকটে যাইয়া) কিসের ব্যথা? কোথা ব্যথা? (নয়নতারার ঘোমটা টানিয়া ফেলিয়া) ও বউ! কথা কও, এক বছর যদি বাঁচি তবে তো আবার বড়দিন পাব? (নয়নতারার চক্ষু বুজিয়া অভিমান) কথা রাখ, চেয়ে দেখ, কেমন সাহেব সেজেছি। তোমার জামাই বড়দিন করে একে-বারে গলে পড়েছেন, আমি গলি নাই; কিন্তু টলেছি। মনোহন দাদা ঢলিয়েছেন, আর তোমার সন্ন্যাসী দাস পথে পড়ে ধুল খাচ্ছেন। (চিবুক ধরিয়া) তোমার এ কি ভাব?

নয়ন—(হাতে ক্যাটকা মারিয়া) গায়ে হাত দিও না। ভালয় ভালয় বলছি, আমাকে বিরক্ত করো না।

মদন—আর কেন, বোঝা গেছে।

রাধা—তুমি ছেলেরাঙ্ক, এ-সকল ভার সহজে বুঝবার সাধা নাই । আগে একটু সাধাসাধনা করে দেখি । (জাল পাতিয়া ঘোড়করে গলধস্তে যাত্রার হুরে)

মানময়ী—মানে ক্ষমা দে ।২—

আজ মান করিবার দিন নহে ॥

কৈ না, এতে যে কিছুই হলো না । থাক, নেচে গেয়ে বকশিশ নেব, আরও কথা কওয়াব, মদনদাদা আমার সঙ্গী হও তো (নৃত্য করিতে করিতে গীত ও সময় সময় সাহেবী নৃত্য)

—থেমটা ।

স্বর - কাহারোয়া জাল বিনে রে ।

বড় বাহার দিয়েছ বৌ বড়দিনে বে ।

বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে বে,

বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে রে ।

আমি তো তোমারে বৌ কিছু বলি নাই ।

মাথা তুলে কও কথা মনে বাথা পাই ॥

কিসে এত মন-দুঃখ হলো কি অসুখ ।

হাসিমুখে চেয়ে দেখ দেখি চাঁদমুখ ॥

অজানিতে যা করেছি তা গুনিব পাছে ।

আগে না হয় সাজা কর, গোলাম হাজির আছে ॥

(রুমাল গলায় জড়িয়ে ঘোড়করে দণ্ডায়মান)

(কলিকায় কুঁ দিতে দিতে জগার প্রবেশ)

নয়ন—(রোষে রাধাকান্তবাবুর দিকে হস্তস্থিত জাঁতি নিক্ষেপ) এখানে মরতে এয়েছ কেন ? (পাছ ফিরিয়া মাথায় ঘোমটা দান)

জগা—বাবা, এখনি যে গায় লাগতো ।

(ভ্রুতে প্রশ্নান)

মদন—কেমন বকশিশ !

রাধা—থেমে যাও বাবা, আর একবার, এই পাড়ি দিয়েছি । বড় চেষ্টে কাটিয়েছি ।

এখন কেবল ইশানিটুকু আছে ।

মদন—সাবাস যোগ বাবা ! এই দুনিয়ার জুড়ানে টিকে গেলে—কত কাছাকাছ-বজরা পড়ে গেছে । তাক্য আশক্তি সামনে আসছেন ।

রাধা—তাই তো বাবা, এইবার সামলাতে পারলে হয়। (নিকটে বাইয়া) বলি, ও বড়বো! এত কেন? (স্বরের সহিত) পেট যে ফেঁপে ওঠে, আর লুচি খাব না।

নয়ন—(ঈষৎ ক্রোধে) আমি আজ কথা বলব না।

রাধা—(স্বরের সহিত) এই তো বাবা—বলেছ?

নয়ন—বলেছি বলেছি, আর বলব না।

রাধা—(স্বরের সহিত) এই দুবার হল।

নয়ন—বেশ তো, দুবার কেন তিনবার হলো।

রাধা—তবে বেশ তো, চলুক—বড়দিনে আবার চলুক।

নয়ন—(দুঃখিতভাবে) তোমার বড়দিন, তোমাবই আছে, আমার কি?

রাধা—তোমার কি? (চিবুক ধরিয়া) বলি ও ক্ষেপি! তোমার কি? জগৎ তোমাব, আমি তোমাব, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কান্ত তোমার।

নয়ন—(আড়নয়নে চাহিয়া) থাক, আব বলতে হবে না। জগৎ আমার, তুমি আমাব, তোমার প্রাণ আমার, এত ছেনালি করে আর জালিও না।

রাধা—কেন? তোমাব জন্তে আমি প্রাণ তো দিয়েই রেখেছি। তার উপরেও যদি কিছু থাকত, তাও না হয় দিতাম। তুমি যা ভাব তা নয়। দেখিয়ে দেও দেই কিনা?—করি কিনা?

নয়ন—(মাথার কাপড় ফেলিয়া ঈষৎদ্বাশ্চে) আচ্ছা, এখনি পরীক্ষা হোক, স্বহু মুখে বললে চলবে না।

রাধা—আচ্ছা তুমি বল, যদি না পারি শেষে অণু কথা। না বলতেই মুখের দোষ দিলে। এ মুখ বেদ-মুখ, যা বলব সে বেদবাক্য।

নয়ন—এই কথা। তবে শোন (রাধাকান্তের কানে কানে প্রকাশ।)

রাধা—(বিকৃত মুখে) এতেই এত? ছি ছি। এত তুচ্ছ কথা!!—ছি ছি, মাটি করেছ, প্রাণ মাটি করেছ, ছি ছি!!!

নয়ন—না না সত্যে বলছি, বড় সৰু করে, এই কাপড়খানা নিয়েছি। বিশখানা কাপড় থেকে এইখানা বেছে বার করেছি। মার কাছে টাকা চাইতেই তো একেবারে খেউ খেউ করে ঝাঁটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার এসে, শেষ বারে ভারি কড়া কড়া কথা বলে গেছে। .করি কি

ভাই, কাপড়ের মায়াও ছাড়তে পারিনে, টাকাও হাতে নাই। হাতে না থাকলে কে কাকে দেয় ?

রাধা—বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম বের করো না। টাকার জন্তে তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে ? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে ?—রাধাকান্তবাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া কথা বলে গেছে ? এ দুঃখ রাখি কোথা ? দিক আমার টাকায়, দিক আমার মায়ায় !! শত দিক আমাব চৌদ্দপুরুষে ! সে বেটার বাড়ি কোথা ? কোথাকার সে বেটা ? তুমি যে তার দোকান শুদ্ধ কিনতে পার, তা বোধ হয় সে বেটা জানে না ? নান ! তোমার কমি কিসে ? কাপড়ের দাম কত ?

নয়ন—বেশি নয়, দশ টাকা।

রাধা—ছি ছি ! মরে যাই। গলায় কলসী বেধে উলুবনে ডুবে মরি। দশ টাকার কাপড়ের জন্তে মুখ ভারি ! মদন দাদা ! এ কি আর গায়ে সয় ? এত বড় তার বাপের যোগ্যতা। টাকার জন্তে কড়া কথা বলবে ? (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দশ টাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বকশিশ দিও। ক্যা বাৎ হয়। এখন বড়দিন করি। [উচ্চৈঃস্বরে] ও বেটা বাঁদরমুখো ?—বাবা জগন্নাথ !

জগা—(নেপথ্যে) আজ্ঞা !

রাধা—ব্রাণ্ডি লাও।

জগা—(নেপথ্যে) জল ?

রাধা—জল খাবে তোর বাবা। শালা ব্রাণ্ডি লাও। (ব্রাণ্ডি লইয়া জগার প্রবেশ)

মদন—আবার ব্রাণ্ডি। অণ্ড আর কিছু হোক। কেমন ঝাণ্ডি ?

নয়ন—ঝাণ্ডির ব্রাণ্ডি না হলো (মাথা নাড়িয়া) হবে না—হবে না। [টাকা উঠাইয়া] বড়দিন,—বড় রকমে হওয়া চাই।

রাধা—মদনবাবু ! আর কত বলব, সময় থাকতে শিখে নেও। যতন করে মনে রেখ। এ-সব কথা বড় কাজে লাগে। বাবা ! রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না। ওর শান্তেই আছে, রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি, এয়ারের বাড়ি বিয়ার, শালার বাড়ি শ্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোট-

পোট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। কাঁচ আর মর, মাতাল-উন্নতি
সভার সভ্য, এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবে
না।

মদন—তবে পালা আরম্ভ করি।

রাধা—ও কথা মুখে এন না, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটি নূতন নাম
বেরিয়েছে। ‘লেখাপড়া করা।’

মদন—বা-বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন ‘লেখাপড়া করি।’

রাধা—(মত্ত দান) লেখাপড়া কর—কিন্তু ধেবডো না।

মদন—তবে আগে আপনি।

রাধা—তা পারি নে।

মদন—তবে শাওড়ী?

রাধা—বৌ, নেও লেখাপড়া কর।

নয়ন—না-না আমি লেখাপড়া করতে পারব না।

রাধা—ওরে বাপরে! তা কি হয়ে থাকে, না পার, ঢেরা সহি কর।

নয়ন—(গ্লাস লইয়া এক সিপ পান এবং নয়নতারা-কর্তৃক সকলেরই মত্তপান।)

[সন্ন্যাসী দাসের প্রবেশ]

সন্ন্যাসী—[টলিতে টলিতে] এই তো এসেছি। চেনা পথে কি আর বাবা—সন্ন্যাসী
দাস?

মদন—ওকে এখানে কে আনলে। বাবু! ও বেটা বদমাইশকে কসে দুই-চার ঘা
চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিন। শালা চোর পরের খেয়ে নিজে মাতলায়
করবে, আর সকলকে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা করে চাবকে দিন।

নয়ন—না না, অমন করতে নেই, এর পরে কি আর তাড়াতে আছে, না মারতে
আছে?

রাধা—সন্ন্যাসী দাস, এ কি? খবর কি? এখানে কেন?

সন্ন্যাসী—এই তো বাবা, সীমা আর বেশি দিন নাই। উঠেছি ভবের ধূলাখেলা মিটে
গেছে।

মদন—আপনি যত শীঘ্র যান, ততই দেশের মঙ্গল। গায়ে কাঁদা লেগেছে কেন?
পিরানটা ছিড়লে কি করে? খুব মজার লোক দেখছি।

সন্ন্যাসী—ওরে ছোড়া ! মাছ ধবতে গেলেই গায়ে কাঁদা লাগে । হেস না, সীমা দেখ । [টলিয়া পড়িতে উত্তত ।] এই তো ।

মদন—দেখ, গায়ে অমনি পড় না ।

সন্ন্যাসী—আমি অমনি বন্ধ মাতাল কিনা ? আমার হাঁশ জ্ঞান নেই কিনা ? ছোড়া-দের পাকামু দেখে আর বরদাস্ত হয় না । রাস্তায় পড়ে ধুলাখেলা করেছে । এস একবার, এস বড়দিন ।—যৌত্ত্বীষ্টের জন্মদিন এস না—যৌত্ত্বীষ্ট-জন্মের কোলাকোলি করি । সকল কোলাকোলির মজা নেওয়া চাই । বিজয় দশমীর কোলাকোলি, ঈদেব নমাজের পর কোলাকোলি, আজ যৌত্ত্বীষ্ট-জন্মের কোলাকোলি । মদন ! চট না, ফেটে চোঁচির হয়ো না, এস, যৌত্ত্বীষ্টের মজাও দেখ । আজিকার কোলাকোলিতে কি স্মৃতি পাও, তাও দেখ ।

[মদনবাবুকে জড়িয়ে ধরেন]

মদন—তুই বেটা নিতাস্তই চাষা । [জোরে ছাড়াইয়া পদাঘাত]

সন্ন্যাসী—[চিত হইয়া পড়িয়া] এ বাজি ভাল নয়, ফেব বাজি [উঠিতেই মুখ ঘুঁসিয়া পতন]

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস, এ কি ? মাতলামি কববে রাস্তায় যাও ।

সন্ন্যাসী—বাস্ বাবা—

বাবা মল মদ খেয়ে খুট এল ঘরে ।

‘রোজ্জে’ নিয়ে রোজ্জ রোজ্জ কত মজা করে ॥

কত মদ খেতে পারে সন্ন্যাসী গোসাঁই ।

মাসীমার কথা শুনে লাজে মরে যাই ॥

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস ! এক গ্লাস খাবে ?

সন্ন্যাসী—দেবেই ত । মাসী এতদিন পবে কি মনে পড়েছে ?

বেটা বল কেটা তোর মাসী ।

মাসী মাসী বলে বেটা গলায় দিলি ফাঁসি ॥

[নয়নতারার হস্ত হইতে মত্ত লইয়া পান] এ কি পাকা মাল যে ?

কোথা পেলো বাবা ? মাসীমা ! কোথা পেলো ? খুব খাঁটি আসল । ভেল-

ভেজাল জলের কারকার নাই । নম্বার ‘এক্সা’ ।

মদন—আমরা কি চাকা যে কাঁচা মাল খাই ।

সন্ন্যাসী—আমিও চাষার নন্দন নয়, জানিস ? জাতি কৈবর্ত বামুনের ঝাঁক মারি।
আমি কি কম লোকের সম্ভান। আমার বাবার বাবা, যে-চাঁই মাছ ধরত,
ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা, রাজারহাট
চেন ? সেই রাজারহাটের দক্ষিণে রানীরহাট, ঠিক বিবিরহাটের পাশেই
কপীরহাট, সেই আমার পিতামহের জন্ম-মাটি, নামটাই কি যেমন তেমন
—নাম হুম্মান দাস। সন্ন্যাসী দাস আসল নাম নয়।

মদন—এতকাল শুনলেম সন্ন্যাসী দাস, বেটা আজ বলছে হুম্মান দাস।

সন্ন্যাসী—কথাই শোন, রাগ কর কেন ? যে সন্ন্যাসী সেই হুম্মান। ভিন্ন কি রে
বেটা ? শোন, আমার জন্মকাহিনী শোন। আমি সন্ন্যাসীর আশীর্বাদি
ছেলে—তারকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তা হলে মোহন্তের
আশীর্বাদেই হতেম। আমি হতেই মাব বেঁজ নাম, বাবার ঝাঁটকুড়ো নাম,
কাব' কার' আইবড নাম ঘুচে গেছে। তাইতে কেউ কেউ আহ্লাদ করে
আমায় ঝাঁটকুড়োর নন্দন বলেও ডেকে থাকে। এই ঝাঁটকুড়োর নন্দন
আগুনে পুড়বে না, জলে ডুববে না। বল, এখন ডুবে দেখাই। মা গঙ্গা।
পতিতপাবনী মা। একবার ডুব দেই। [ভূমে পতন]

রাধা—যে যা না পারে সৈতে যে না পাবে, সে তা কেন খায় ?

মদন—ও কি নিজে খেয়েছে ? আকর্ষণে টেনে নিয়েছে এই সকল তিন ঢুকে
ছটাকে মাতালেই তো মদের সর্বনাশ করে ভদ্রলোকের ঘর থেকে
তাড়ালে। এ দশা দেখলে কি আর মদের নাম শুনেই ইচ্ছা করে। ছি,
ছি !

নয়ন—যাক, তা আব তুমি কি বলবে। সকলেরই ঐ দশা। ধরে রাখবার লোক
থাকলেই ভদ্রলোক, না থাকলেই মাতাল। তা যা হক। আমি একে
রোজের বাড়িতে রেখে আসি।

রাধা—তুমি এই অন্ধকারে কোথা যাবে ? জগাকে ডেকে দিই আর না হয় আমি
যাই। তুমি বাড়িতে থাক !

নয়ন—না তা হয় না, পুরুষ মাতালকে পুরুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। তুমি
রাস্তায় গেলে একাকার হবে। আমি কি পাগল যে, সন্ন্যাসী দাসের সঙ্গে

রাত্রে তোমাকে যেতে দিই । [সন্ন্যাসী দাসকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা]
এ কি ? ও যে আর উঠে না ।

মদন—ওর কেবল চালাকি । তামাসা দেখবেন । [সন্ন্যাসীর পায়ে চাদর বাঁধিয়া]
এইভাবে টেনে নিন ।

বাধা—[টানিতে আরম্ভ]

সন্ন্যাসী—কুইক, বি কুইক, জলদি চালাও ।

[বাধাকাস্তের সন্ন্যাসী দাসকে লইয়া প্রস্থান]

মদন—মাতাল কি আব কথায় জন্ম হয় । এখন বেটা গিয়ে পথে আচ্ছা গোল
বাধাবে ।

নয়ন—আমরা তো ঘবে আছি । তাতে আর ভয় কি ? জামাই সেদিন বড়
চালাকি করে গেছে ।

মদন—তুমিই আজ কম কি কল্লে, কাপড় দিয়েছি পূজার সময় । দোকানী কড়া
কথা বলে আজ । সাজিয়ে ছিলে তো মন্দ নয় । তোমায় চেনা ভার ।

নয়ন—তুমি কি ? বাছা তুমি ত কম নও, যার খাও তারই গুণ গাও, দেখ তো
তোমাব অসাধ্য কি আছে ?

মদন—শাশুড়ি ! বাবু তো কিছু টের পান নেই ।

নয়ন—পেলেই কি ! আমি তো ঘরের মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব ।
এত কি ? আসে লক্ষ্মী, যার বানাই । আমি ওর জন্তে একেবারে পাগল
কিনা ? সরে এস । (মদনবাবুর জাহ্নতে মস্তক রাখিয়া শয়ন) জগা, ও
জগা ! ষুমিয়েছিস ?

জগা—(নেপথ্যে) না ।—

নয়ন—বাবু এলে কেসে উঠিস । (মদনের প্রতি) জামাই । অনেকদিন গান
শুনিনে ।

মদন—তা বলি কিন্তু—

নয়ন—যদি তাড়াতে পারি । নানা আজ মাপ করবে, ওর মাগকে দেখাবে বলেছে,
আজ ওদের বাড়ি যেতে হবে ।

মদন—বাবুর স্ত্রী বড় ভাল মানুষ ।

নয়ন—ভাল মন্দে কান্ন নেই, দেখতে পেলেই হল । তুমি গান কর ।

মদন—(নয়নতারার মুখের দিকে মাথা নওরাইয়া মুখের নিকটে হস্ত নাড়িয়া গান)

কাওয়ালি ।

(ঝাঙুডি গো) মন-দুঃখ মনে রহিল ।

আশা না পূরিতে বুঝি প্রেমবাসা ভাঙ্গিল ॥

পিরিতি কাননে, ভ্রমিব গোপনে ।

পাবে না সন্ধান কেউ, জানিবে না স্বপনে ।

মরি মরি এ কি দায়, মন যেন ডেকে কয়,

আর কি ভাবিছ । প্রেমে বিবহ ঘটিল ॥

নয়ন—(মদনবাবু বুকে সাহসসূচক চপেটাঘাত করিয়া) ভয় নাই । ধৈর্য ধর ।

(জগার প্রবেশ)

জগা—বাবু আসছে ।

নয়ন—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন সরে বস ।

(রাধাকান্তবাবুর প্রবেশ ও জগার প্রস্থান)

রাধা—বড় শীত (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ বড় শীত । বেটা রাস্তায় বড় জ্বালাতন করে মেয়েছে । শেষ না পেরে কাঁধে করে নিতে হয়েছিল । একা হলে পার-তুম না, হঠাৎ গাঙ্গুলী ডাক্তার সঙ্গে দেখা হল, সে আর আমি একত্রে কাঁধে করে নিয়ে একেবারে আড্ডায় ফেলে দিয়েছি, শালা কাঁধের উপরে দুবার বসি করে আমার গায়েব কোট নষ্ট করে ফেলেছে । (কোট খুলিতে খুলিতে) বো ! এক গ্রাস ঢাল ।

নয়ন—এত কাঁপনি উঠেছে কেন ? (রাধাকান্তের হস্তে মত্ত দান)

রাধা—(মস্তপান করিয়া) বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও, যেখানে কাঁক পাবে সেইখানেই শীত সৈঁদবে । আগুন জ্বলে দাও, গায়েব উপরকার চামই গরম হবে । মা স্তরেগরী পেটে পড়লে অঙ্কুরে বাহিরে, ভিতরে উপরে যেন একেবারে বেলাতী কপলে মোড়ান হয় । কোঁ ! আর এক গ্রাস ।

নয়ন—এত ভাল নয়, পায়ে দড়ি পড়বে । (মস্তপান)

রাধা—গলায় দড়ি পড়লে ছাড়ব না বাবা (মত্ত লইয়া পান) বউ ! তবে আজ রাতেই দেখাশুনা হলে যাক । কেন আর অদেখা থাকে ।

নয়ন—আমি তোমার বাড়ি গিয়ে কি ঝেঁটা খাব। তোমার গিন্নী, আমার নামে কুকুর পোষেন। দেখলে কি আব আস্ত রাখবেন। ঝেঁটার বাড়িতে তোমার, আমার হাড় চুর করে দেবেন।

রাধা—চুর করতে আর হয় না, যদি হয়, তবে চুর হবে, না বৌ। সে বড খাসা লোক, গেলেই দেখবে।

নয়ন—চল, এক যাত্রায় দুই ফল হবে। বাড়ি দেখাও হবে, ঘরেব গিন্নীও। কিন্তু ভাই-জামাইকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাধা—চল দাদা! আমার বাড়ি, তোমার বাড়ি, আমার ঘর তোমার ঘর।

নয়ন—ও কথাটা আর বাকি রাখলেন কেন? তোমার বউ, আমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা।

রাধা—বাধা হান্ কি। চল দাদা।

মদন—যে আজ্ঞা, আমি হাজির।

নয়ন—তবে যাত্রা করে নিই। [নয়নতারা-কর্তৃক সকলের মন্থপান]

রাধা—তবলাটা নিই, গিন্নিকে এয়ারকি দেখাব। বড বৌ। নাচবে তো।

নয়ন—অত বসিকতা ক'র না। মাগকে আব নাচ দেখিয়ে কাজ নেই, শেষে বেঁধে রাখা দায় হবে। আমার জালাতেই দিনরাত মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। আবাব তার চোক কান ফুটিয়ে, আব কাজ নেই। এই আছ ভাল। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাই তো টের পাও না, আমার মত হলে তোমার প্রাণ থাকত না।

রাধা—যাক, মদের বোতল আর গ্লাসটা নিতে হবে। (মদের গ্লাস লইয়া) সকলেই আবাব যাত্রা করি। (বাধাকাস্ত-কর্তৃক সকলেই মন্থপান)

(নয়নতারা-কর্তৃক গান)

স্বর—আড়খেমটা।

আজ আমি মালঞ্চেতে যাই—

[আজ] প্রেম ষাচিবারে যাই। দেখি হারি কি হারাই,

যা থাকে কপালে হবে, তাতে ক্ষতি নাই ॥

আমার নয়নতারা, আমার নয়নতারা,

বেলেছো যে এত দিন, [আমি] দেখিব তাহাই !!

ভালবাসা জানা যাবে, কপটতা না রহিবে,
প্রণয়ও পরীক্ষা হবে, (আজ) দেখিবে জামাই ॥

সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় বঙ্গভূমি ।

রাধাকান্তবাবুর বাড়ি, মুক্তকেশীর শয়নঘর ।

(মুক্তকেশী এবং রাইমনি আসীনা)

রাই—তুমি হয়ে এত সয়ে থাক । আমি হলে এত দিন যা মনে হত, তাই করতেন
কা'র মুখের দিকে চাইতেম না । কয়েদিব মত দুবেলা দুটা খাব, আব
মনের আগুনে গুমরে মরব, একটি কথাও বলতে পাবব না । বল তো এত
কার প্রাণে সয় ? আজকাল ঘবেব বৌ হলেই যে চিবকাল মনের আগুনে
জলেপুড়ে মরতে হবে, এত আব বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই ?

মুক্ত—বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি কবে বুঝতে পারি, শতকের মধ্যে
যখন একটাও খুঁজে পাইনে, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ
দেব !

রাই—শুধু অদৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমার দোষ আছে ! তুমি কি করে সয়ে
থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না । এত কি করে চোখে দেখে সওয়া
যায় ।

মুক্ত—[মলিন মুখে] সৈ ! আমার মনেব কড়া তো তোমার কাছে কিছুই চাপা
নাই । যখন যেভাবে রয়েছি তুমি সকলেই জান । আজকাল যে দুঃখে দিন-
রাত যাচ্ছে, তা না জানতে পাচ্ছ এমন নয় । এ কি হল ? এখন আর প্রাণে
সয় না । আগে মাসান্তবে দুই-একদিন দেখা পেতাম, কোন কোন দিনে
হাসি তামাসা করে দুই-একটা কথা বলতেন । আমি ভাবতেম যে আমার—
আমারই আছে, সময় সময় মুখখানা দেখলেই আমার হল, সাধও মিটলো ।
যেমন চেয়েছি, তেমনি বিধি দিয়েছেন । স্থখই কি আর দুঃখই কি ? এখন
এমন হয়েছে, দেখাশুনার নাম নেই । আমি যে একজন তাঁর বাড়িতে আছি,
আমায় যে কখনও বিয়ে করেছিলেন, (ক্রন্দন) এ তাঁর মনে আছে কিনা
সন্দেহ । চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে বই-
তেম, তাতেও দুঃখ হত না, থেকে—নেই, আমার আমার নয়, আমি যার,

সে পরের। আমি দিনরাত কাঁদি। সে মনেও করে না, এ দুঃখ আর কারে বলি।

রাই—তুমি আগে হাত খাট করে টিল দিয়ে ঠকেছ, মনে মনে জানতে আমিই সকল, আমি ভালবাসা। সময় সময় হেসে দুটো কথা বলতেন তাতেই আহ্লাদে গলে পড়তে। সৈ! পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই। এ তো কথাই আছে, “নূতনে পোড়ে বন, পুরাতনে জ্বালাতন”। এর পর তুমি যেমন হাবা, একালে আব একটি জোড়া পাওয়া ভার। এখন কলি কাল, সোজা কথায় চলে না, হাবা মেয়ে হলে ভাতার জন্ম থাকে না; নরম গরম দুই চাই। কখনও ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি তো অনেক দিন থেকেই দেখে আসছি যদি কোন দিন রাগ করে মুখখানি ভার কবে বসে থাক, বাবু এসে দুটো কথা বলতেই জ্বল হয়ে গেলে, হাসি দেখে অমনি হেসে ফেলে সকল কথাই ভুলে বসলে, এতে ছাই আর কি হবে ?

মুক্ত—সৈ, মনের কথা বলি। মনে খাঁচ কবি যে, আজ একখানা ক’বব, আবার ভাবি, যে আজ না হয় কাল করব, এষ্ট ভাবতে হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলেই ভুলে যাই। হাসিমুখে দুটো কথা শুনে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।

রাই—তা বুঝেছি। অমন করেই তো তোমার মাথা তুমি খেয়েছ। বানরকে নাই দিলে মাথায়, তা জান।

মুক্ত—ছি, সৈ। স্বামী তাকে—

রাই—তা যাই বল, মনমোহিনীর কথা শোন নাট, আজকাল স্বামী বলে পূজা কল্লে চলে না, সে কালও নাই, তেমন স্বামীও নাই। এখনকার মদখোর আর বেগাখোর স্বামী যে বানব হতেও বাড়া। তুমি যদি দুবেলা দু-ঘা কসে জুতো মারতে তাহলে ঐক করে মাথায় চড়ত না। মেয়ে বলি মনমোহিনী! যেমন বিষ তেমনি রোজা। একদিন কার বাড়িতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে বসিকবাবুকে তো আচ্ছা করে বিষঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে। চন্দ্রদাদা নেতার ঘরে বসে ইয়ার নিয়ে মজা করছিলেন, কুমুদিনী সেই রাতে বাড়ি হতে গোপনে বেরিয়ে নেতার ঘরের

কানাচি দাঁড়িয়ে বড় বড় করে বলতে লাগল ; চন্দ্রবাবু ! আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে লুকচুরি খেলছেন, আমি চলেম । চন্দ্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কতরকমে সেধে বাড়ি নিয়ে গেলেন । আর কখনো কা'র নাম করেন না ।

মুক্ত—(কাতর স্বরে) যা হবার তা হয়েছে । সৈ ! এখন এর উপায় কি ? কত লোকের কাছে কত কথা শুনি । পাড়ার ছেলে মেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে আর কত বলে । কেউ বলে দুইজন মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুবে বেড়ায় । লজ্জা তো নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই । আবার শুনি যে, একদিন দুজনে মামামারি করে যা না বলতে পারে, তাও বলাবলি কবেছে ।

রাই—কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এই তো ? ও কথা ত মাতালের আসল বোল । ও কথায় কিছুই গোল নাই । ভালবাসার ডাকই ঐ ।

মুক্ত—মিছে নয়, আবার শুনি যে কিছুই না । যেমন তেমনি রয়েছে । ছি ! ছি ! কি ঘৃণা ।

(নেপথ্যে)

জিতা রাও বাবা বৈতরণী পার হই, দেখে যেও, বাবা ! আঁধারেতে পা সাবধান, দেখে যেও । “দেখে যেও সোনার যাদু, (আমি) যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে । আঁধারেতে পা সরে না মাথার কিরে যারে ফিরে ॥” ধিরে যাও—এ ব্রজরাই ধিরে যাও ।

মুক্ত—এ যে বাবুর গলার আওয়াজ । এ কি । বাড়ির মধ্যে আসছেন তবু যে গান থামচে না ।

রাই—বুঝি বেশি করে খেয়েছেন, আজ বড়দিন, দু তিন বোতল খেয়ে ঢুলতে ঢুলতে গলাবাজি কবে আসছেন, কথায় বেঠিক হচ্ছে, যা মুখে আসছে তাই বলছেন ! এই সময় আমি একটু আড়ালে যাই । সৈ ! মাতাল হলে মন বড় সাদা হয় । এই রেতে যে গান করতে করতে তোমার কাছে আসছেন, অবিশি মনে পড়েছে, অবিশি কিছু মনে হয়েছে । আমার মাথা খাও, আজ ছেড না, একটু ধল্লিই মনের কথা শুনতে পাবে । ঐ আসছেন, আড়ালে গিয়ে বসি ।

(প্রস্থান)

[বোতল বগলে, গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদনবাবুৰ
সহিত বাধাকান্তেৰ প্ৰবেশ]

বাধা—[নয়নতারাৰ প্ৰতি] প্ৰিয়ে ! এই বিবিসাহেবেৰ ঘৰ, ঐ আমাৰ ঘৰেৰ
লক্ষ্মী । মদনদাদা । ঐ আমাৰ অঙ্কলক্ষ্মী, ঐ আমাৰ মাথায় মণি, ঐ আমাৰ
জাত-কুলমানৱক্ষাকাৰিণী, ঐ আমাৰ মুখপানে চাহিনী, (যাত্ৰাৰ স্বৰে) ঐ
বসে আছেন ! তোৱা দেখ দেখ, দেখ একবাৰ, চেয়ে দেখ । (হস্ত দ্বাৰা
দৰ্শন) ঐ গগনেৰ চাঁদ আমাৰ ঘৰে, একবাৰ চেয়ে দেখ ।

মুক্ত—পোড়া অদৃষ্টে আৰ কি আছে ? পৰমেশ্বৰ ' এই দেখালে ? (পলাইতে
উদ্যত)

বাধা—[বোতল গ্লাস বাথিয়া মুক্তকেশীকে ধাবণ] ভয় পেয়েছ ? গাঁ কাঁপছে
যে ? ভয় নাই, ভয় নাই । চক্ষে জল পড়েছে ? ছি ছি ! আমায়
লজ্জা দিলে ? ছি লক্ষ্মী ! আগাব এয়াবে মজলিসে মাটি কল্লে । আমি
এমন বসিক, এমন চতুৰ বাবা, আমাৰ ঘৰেৰ গিন্নী ভয়থেক ? মাহুৰ
দেখে, কেঁপে কেঁদে ফেললে ? ছি ছি । চেয়ে দেখ, দেখ তোমাৰ জোড়া
মিলিয়ে এনেছি । কেঠঠাকুৰ মেয়েমানুষেৰে হাতী সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে,
মজা কৰে চড়ে বেডাভেন, আমি হাতী ঘোড়া কৰব না, তোমাদেৰ যুড়ি
হেঁকে বেলাতী চক্ৰে ঘূৰব, এইটি বড় সাধ আছে । (মুক্তকেশীৰ হস্ত
ধৰিয়া উভয়ে উপবেশন) আমাব কোলে বস, না না আমাৰ মাথায় বস,
মান কৰেছ ? সাজা কৰ, যা ইচ্ছে সাজা কৰ, মান ভাঙ্গুক । একটু মদ
খাও দেখি, [গ্লাস লইয়া মুখেৰ নিকট ধাবণ] সব বাগ মাটি হবে । তুমি
জান না ? এতে বাগ মাটি হয় । দ্বেষ, হিংসা মন থেকে দু'শ হাত সবে
যায়, একবাব খাও দেখি ?

নয়ন—কিবে ডেকবা পোড়াৰমুখ ! এই দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিস ?
আমি যাই, জামাই চল, আমাৰ মাথা খাও, চল, [মদনবাবুৰ গায়ে ধাক্কা
দিয়ে] চল, এখানে আৰ থাকব না ।

বাধা—তুই বাবা ঘৰে যা । আমি এই ঘৰে থাকি ।

নয়ন—(ক্ৰন্দন কৰিতে কৰিতে) তোৰ মনে এই ছিল, আমায় বাড়িতে এনে
এত অপমান কৰিলি, আমি এ প্ৰাণ ৰাখব না, আমি যাই, (যাইতে উদ্যত

এবং মদনবাবু কর্তৃক ধারণ) জামাই, আমায় ধ'র না। আমি আজ গলায় দড়ি দেব। ও বেহায়া পাঞ্জি মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড়, গলায় দড়ি দেব।

রাধা—(ত্রস্তে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া নয়নতারাকে ধারণ) তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

নয়ন—(রাধাকান্তকে পদাঘাত কবিয়া) তুই তোর মাগকে নিয়ে থাক। আমি তোব মুখ দেখবো না—আমি কখনও তোর মুখ দেখবো না।

রাধা—(ষোড়করে) মাপ কর, আমি আব কখনও এ ঘরে আসব না, মুক্তকেশী'ব মুখ আব দেখব না। আমায় মাপ কব।

মুক্ত—জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুনকালি দেবে। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে থাকাই ভাল ছিল। এভাবে কেন আমার বাড়িতে সর্বনাশ করতে এয়েছ? আর ঐ ভদ্রসন্তানকে সঞ্চে করে নিয়ে এসে কি এই দেখালে! আব গোল ক'ব না, যেখান হতে এয়েছ, সেইখানে চলে যাও।

নয়ন—দেখ পাঞ্জি! কোন মুখে এখানে রয়েছিস। দূর দূর করে শেয়াল-কুকুরেব মতো তোকে তাড়াচ্ছে, তবু তোব লজ্জা হচ্ছে না?

রাধা—কার সাধ্য আমাকে তাড়াতে পাবে। যে বলবে আমি তার মাথা ভাঙব। (তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া) এই বোতলেব বাড়িতে মাথা ভাঙব। [সজোরে মুক্তকেশীর দিকে গ্লাস নিক্ষেপ, গ্লাস মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি মদ খাব কিমে? আমার গ্লাস ভেঙে গেল, অ্যা আমাব গ্লাস দে। দে—দে—

নয়ন—ভাল চাও, তবে বাড়ি চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাঙব।

মদন—(নয়নতারাব প্রতি) তুই বেটি ভারী পাঞ্জি। ভদ্রলোকের বাড়ি এসে—এ কি? যা, তোব বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ি যাই।

নয়ন—ও দিকে যোগাড় হ'ল নাকি? আমিই পাঞ্জি! বেশ বললে।

রাধা—মদনবাবু! একটু দাঁড়াও, তোমায় মারে কে? আমি আজ ঘর থেকে যাব না। মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে—তুমি আমি খাড়া পাহারা দেব।

নয়ন—তোৰ আৰ ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই চল ।

ৰাধা—আচ্ছা, আমায় একটু ছেড়ে দেও, আমি এ ঘৰ থেকে মুক্তকেশী হারাম-জাদিকে তাড়িয়ে দিই ।

নয়ন—যা বলতে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না । মারতে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেও আমার গা জ্বালা করে ।

ৰাধা—তা আমি বেশ বুঝি, আমায় ছেড়ে দাও, দেখ তোমার মনের দুঃখ এমনি মেটাচ্ছি । ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও । (জোৰে ঘাইতে উত্তত ও নয়নতারা পশ্চাৎ হইতে পিরান এবং পিবান ছিড়িলে পরিধেয় ধারণ)

নয়ন—আবাব যেতে চাও ? চল আব থাকতে পারব না । (গমনোত্তত)

মুক্ত—(নিকটে যাইয়া) দেখ, তোমাব দুখানি পায় ধরি, একটু দাঁড়িয়ে হত-ভাগিনীৰ দুটি কথা শুনে যাও ।

ৰাধা—তোব কি কথা শুনবো বে প্ৰাণ ! তুই গাইতে জানিস নে, নাচতে জানিস নে, এমন বদবসিক্বেব কথা বাধাকান্ত শুনতে পাবে না ।

মুক্ত—তা হক, আমি শ্রী, আমাব একটি কথা শুনে যাও (চৰণ ধৰিতে উত্তত) অভাগিনীৰ দুঃখের কথা শুনে যাও ।

ৰাধা—(সজোবে পদাঘাত কৰিয়া) এই শুনি ।

[মদনবাবুৰ প্ৰস্থান]

নয়ন—জামাই ! দাঁড়াও, আমরাও আসছি, আব তুই-এক ঘা দেখে গেলে না ?

মুক্ত—এমন কবে এদেব সামনে অপমান করলে ?

ৰাধা—আমায় আৰ শেখাতে হবে না । নয়নতারা ছেড়ে দেয় না বলে বেঁচে গেলি । যদি বাঁচি তবে কাল এসে—

[উভয়ের প্ৰস্থান]

মুক্ত—বে কপাল ! (ক্ৰন্দন)

(বাইমণিৰ প্ৰবেশ)

বাই—[বজ্জাঞ্চল দ্বাবা মুক্তকেশীৰ মুখ মুছাইয়া] তোমাব দোষে তুমি কাঁদবে, এৰ উপায় কি ? সে পোড়াকপালি দু'শভাতারী এত কথা বলে গেল, তুমি তো একটি কথাও বললে না ।

মুক্ত—আমাব কি বলবার সাধ্য আছে ? ভাবলেম কি হল কি, হল কি ? ও সাত-

জনের মন যোগায়, কতরকমের কথা ওর পেটে আছে, নিত্য নূতন কথা ওর মুখে, এক কথা কয়ে কি দু'শ কথা শুনবো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সই! এক ঘরের মেয়ে বলে, মা-বাপের কাছে বড় আদবে ছিলাম। ছোটবেলায় কত আবদার করেছি, কত জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে ছাই কবেছি, কেউ আমায় দূর কথাটি বলে নাই। বলতে পারে নাই। স্তখে থাকব আশাতেই বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, অদেষ্টেব গুণে তার ফল তো চক্ষেই দেখলে? বিধাতা যার বিমুখ তার হাতে সোনার টাকা তুলে দিলেও অদেষ্টগুণে তামা হয়, ভাল কথা বললেও মন্দ হয়ে পড়ে। যা কপালে ছিল হয়ে গেল, এখন যাতে ভাল হয়, যাতে পোড়ারমুখোর মুখ আর না দেখতে হয়, তারই সোজা পথ দেখিয়ে দাও। আজ বেতে এই হল, আবাব কাল তাকে এই মুখ দেখাব? আর কি আশায় থাকব? দোবে দোরে যদি ভিক্ষে কবে খাই, সেও আমার ভাল, এখন এর উপায় কি? যদি না পার, যদি উপায় না বলতে পার, তবে যাতে লোকালয়ে আব মুখ দেখাতে না হয়, তারই উপায় করে দাও। আব যদি মুখ দেখাতেই হয়, তবে যাতে ওর মুখে চুনকালি পড়ে, দশজনে দেখে হাসে, না হয় তারই উপায় কবে দাও। স্বামী বলে যে তাব মুখপানে চেয়ে থাকবো, তাব কুলে খোঁটা হবে বলে যে কুল মজাতে পিছে হাটবো, তা মনেও কর না। জাত, কুল, মান, বর্মের দিকে আর তাকাব না। কাব জন্তে? যে আমার হল না, আমি তাব হব কেন?

রাই—এখন পথে এস, যদি মন বেঁধে সাহসে ভর কবে দাঁড়াতে পার, তবে আর ভাবনা কি?

মুক্ত—কেন দাঁড়াব না? এতদিন তো দেখলেম, মেয়ে-পবানে যা সয় না, তা সয়েও মন যুগিয়ে চলেম, দেখি কি হয়? আমার দায়, তার গায়েই বাধল না। তবে আর কেন? পেটের সন্তানসন্ততি নাই যে, তারা লজ্জা পাবে। তবে মা-বাপেব যেমন কাজ তেমনি ফলভোগ করবেন, আমার কি?.

রাই—এত উতালনা হচ্ছে কেন? মন যখন ভেঙ্গে গেছে, তখন এর উপায় করে দিচ্ছি। আজ রাত্রে আর কি হবে? আজ আমি বাড়ি যাই, কাল সকালে এসে যা হয় বলে দেব। আজকাল রাতটে কোন গতিকে সয়ে থাকতে হচ্ছে।

মুক্ত—সই ! তুমিও আজ ফেলে যাবে ? আমার মাথা খাও, আজ এইখানে থাক । দুই সযে একত্র শুয়ে ‘এর উপায় কি ?’ আজই শুনব । কাল আসবে বলে গেছে, আজই স্থির করা চাই ।

রাই—আচ্ছা, তবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাস্কপ

তৃতীয় বঙ্গভূমি

নয়নতাবাব শয়নঘর

(বাধাকান্ত এবং মদনবাবু আসীন)

মদন—ও কথা আব শুনি না । একেবারে অধঃপাতে গেছেন । কাল রাত্রি যা করেছেন, তা বোধহয় কেউ কবতে পারে না ।

রাধা—(বায়ঁয় টোকা দিতে দিতে ঈষৎকাস্তে) মুক্তকেশী কিছু ঘুঘঘাস দিয়েছে ? না গোপনে যেতে বলেছে ? বাবা ! শান্তুড়ীর কথা যে একেবারে ভুলে গেলে ?

মদন—আপনি যদি এভাবে কথার উত্তর করেন, তবে চুপ কল্লেম ।

রাধা—তোমার মতো নিমকহাবাম তো দুটি দেখা যায় না । যার খাও, যার নামে তরে খাও, যার ঘরে বসে দু’দণ্ড আমোদ কর, যে তোমায় এত ভালবাসে, এখনও যার ঘরে বসে বসেছ, তারই নিন্দা তোমার মুখে ! তোমার চক্ষে মুক্তকেশীকে ভাল লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে এসো । না হয় ঘরে খাও । কেউ রোখবাব নাই, খোলা মহল দেদার লোট !

মদন—আর কি বলবেন ? সকল দিকেই দেখতে হয় । চিরকালটা মদ খেয়ে রাঁড়ের বাড়ি পড়ে থাকবেন, ঘরের কথা মুখে আনবেন না । ছি ছি ! কেউ কি মদ খায় না, না বেশা রাখে না ?

রাধা—রাখে বই কি, বল ?

মদন—আমরা আর কি বলতে পারি । সাদরী সতী স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেন, নয়নতারা বারোজনের মন যোগায়, তার মাথাটা ছাড়তে পাল্লেন না ?

রাধা—আমি তো আর হাবা ছেলে নই যে ঐ কথায় পড়ে যাব । আমি ছেড়ে দেই আর তুমি গিয়ে দখল কর ।

মদন—আপনি বলতে পারেন। বলুন তো, বেস্টা কার বাবা-কেলৈ বিশ্বাসের ধন।

হাজার ভালবাসেন, দিনবাত পায়ের ধূলা মাখায় করে ঝাডেন, সোনার টাকা দিয়ে প্রতিদিন পূজা করেন, তবু ফাঁক পেলে উপরিলাভ হাত করবেই করবে।

রাধা—সকলে নয়।

মদন—খুঁজলে পাওয়া ভার। আপনি জানেন আপনার নয়নতারা আপনাকেই জানে?

রাধা—[কিঞ্চিৎ রাগতভাবে বায়ঁ রাখিয়া] জানি বই কি? আমি দিখি করে বলতে পারি কারও ঘরের মাগ ও নয়নতারার মত সতী নয়। আগে যাই করুক, এখন সে বেস্টা নাই।

মদন—যাক, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসি নাই। যা ইচ্ছা করুন, দয়া করে দুই গ্লাস খেতে দিবেন বস্।

রাধা—এখন সোজা পথে এসো, বাজে কথার দরকার কি? [সম্মুখস্থ বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিতে উত্তত] না এতে কিছুই নাই, ভগবান ভাব, দেখ বড়বউ কি করে আসেন।

মদন—শান্তুড়ী যে নিজেই।—

রাধা—দশটা বাজলে দোকানী বোটারা কি আর পুরুষের হাতে মদ দেয়? জগা ছবার ফিরে এসেছে বলে তিনি নিজেই রেগে গেছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, তা বললে যে আর তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মদন—এই তো ঠাকুর চাতুরী বুদ্ধিতে পার নাই।

শতজন মন তারা কথায় যোগায়।

একমন পরিতোষ করিছ কোথায়?

একজন আলে তারা কখনই থাকে না।

একের অভাব হলে কিছুই ভাবে না।

এ-কেবল তোমার নয় ও নয়নতারা।

কতজনে বলে মোর নয়নের তারা ॥

কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয়।

কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয় ॥

নেপথ্যে—[মলের শব্দ করিয়া] এমন লোকের হাতেও পড়েছি, এত করে মন যোগাই তবু মন পাইনে ।

রাধা—[মদনবাবুর প্রতি] এখন তো আর সম্মুখে নাই—শোন, অগোচরে কি বলে । মন থেকে খাঁটি করে না বেলোলে কি আর অসাক্ষাতে বলছে ?

(বোতল হস্তে নয়নতারার প্রবেশ)

নয়ন—এই নেও (বোতল রাখিয়া) পথে আসতে বড় ভয় পেয়েছি । মেঘে এমন অন্ধকার হয়েছে যে কোলেব মানুষ চক্ষে দেখা যায় না । দুই-এক ফোঁটা জল পড়ে আবও জ্বালাতন কবেছে । সে জগা সঙ্গে গিয়েছিল সে বেটা আমা হতে ভয়খেক । মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চকমকি দেখে জড়িয়ে ধরে ।

রাধা—বড়বউ, আমাব জ্ঞান বড়ই কষ্ট পেয়েছ । আমি এ কথা আজীবন ভুলব না, বস, তোমার মাথার জল মুছিয়ে দি ।

নয়ন—(মুখ বাঁকা করিয়া) থাক, আপনার আর আদর করে কাজ নেই । আমিই মুছি । (অঞ্চল দিয়া মাথা মোছন)

রাধা—[নয়নতারার প্রতি] দেখ, তোমার জামাই আজ তোমার যে নিন্দে কবেছে, তা শুনে মরা মানুষেরও রাগ হয় ! মুক্তকেশীকে কাল তোমাব কথায় মেরেছি, তাইতে আমি তো আর মানুষের মধ্যেই নেই । আর তোমার নামে একেবারে দুশ ঝোঁটা ।

নয়ন—ওদের কথা মুখে আনতে নেই, এমন নিমকহারামদের কথা শুনেতে আছে ? ওরা যে পাতে খায় সেই পাতই ফুটো করে । বাবা ! ওদের খুরে নমস্কার (ঘোড়করে নমস্কার)

মদন—শান্তুড়ী ! তুমিও যে পাগল হলে । আমি নিন্দে করব ? আমি বার-বিনাসিনীদের দুই-একটি কথা বলেছি । তুমি তো আর তা নও ? শান্তুড়ী, আমার মাথা খাও, বাবু কথায় কান দিও না । (আপন হাতে ঢেলে) এঁটো করে একটু দেও, খেয়ে বাড়ি যাই ।

রাধা—যাবে কোথায় ? ভয় পেয়েছ ? বড়বউর এককথাতেই দশ হাত সরে গেলে ? [মদ ঢালিয়া] খাও—লক্ষ্মী আমার । ঢোকে ঢোকে গেলো ।

নয়ন—আপনি কেন দিচ্ছেন ! আমি এঁটো করে হাতে দিচ্ছি । ও যা বলেছে তাই করি, জামাই আমার মানিক-অঙ্গুরী । যখন যার তখনই তার । মন

হ'ল স্বর্গেই তুললেন আবার মন হ'ল দশ হাত মাটিতেই রসিয়ে দিলেন ।
পাগল মন । [মদ এঁটো করিয়া মদনবাবুর হস্তে দান] বিস্তি কাবার করো
তো জামাই । আমাব এঁটো যে থাকে, তার জন্তে স্বর্গের সিঁড়ি দিনরাত
খোলা থাকবে । (বেহালার এক দুই তিন সুরেব সহিত, জামাই আমার
মাথা খাও, খাও মাথা খাও, খাও, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্যসম্বন্ধে
ভঙ্গি সহিত)

মদন—এক অঙ্গ বাকি থাকলো তাতেই যা হোক । শান্তুডী, আমাব হাতে ঢালো,
নেই ।

নয়ন—ছুঁয়ে দিয়েছি ।

মদন—ছুঁলে কি হয় ? যাক, আবও দিন আছে, [মত্তপান] একটা গান মনে
হয়েছে, বলবো ?

নয়ন—নিয়ম ভাঙ্গ কেন ? জ্ঞান তিনেতেই সব । তিন বার হোক ।

রাধা—তবে চালানি—(মদ ঢালিয়া পান)

নয়ন—আপন হাত জগন্নাথ : আমি শালা কি চোব ? (মদ ঢালিয়া পান)

মদন—[ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] এবারে আমি [মদ ঢালিয়া পান]

রাধা—[ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] নিয়মরক্ষা তো হয়েছে । ফের বড়বউ
[মদ ঢালিয়া নয়নতারার হস্তে দান]

নয়ন—বন্দিগী ! [মুসলমানি ধবনে মাথা নওয়াইয়া সেলাম করিয়া মত্তপান]

মদন—[ত্রস্তে গ্রাস লইয়া] ফের বাজি বড়বাবু ! [মত্ত ঢালিয়া রাধাকান্তবাবুর
হস্তে দান]

রাধা—জিতা বাও বাবা ! গুড হেল্থ বড়বউ । [মত্তপান]

নয়ন—আমি বৃষ্টি ফাঁক যাব ? [ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] ফের লাগ জামাই
(মদ ঢালিয়া মদনবাবুর হস্তে দান)

মদন—অল রাইট, ঘণ্টা মাব (মত্তপান) গাড়ি উড়েছে ।

নয়ন—মদও উড়েছে [বোতলে ফুঁ দিয়ে দূরে নিক্ষেপ]

রাধা—এখন আব কি ?

নয়ন—যা ইচ্ছে ।

মদন—আপনাদেবই হোক ।

নয়ন—তাতে কম পাবে না, জামাই, বাজাও তো (গানারম্ভ)

পিলু-জং

নয়নেরই অন্ধরোধে যারে প্রাণ শুপিলাম (আমি)
সে আমার হলো না কেন ? ঐ খেদে মরিলাম
অন্ত আশা ছেড়ে দিয়ে তারি প্রেমে মজিলাম ।
তবু সে চাহে না আমায় একি দায়ে ঠেকিলাম ।
প্রেমজ্বরা লোকেরই মুখে এতদিন যা শুনিলাম ।
সাধেরই পিবিতে মজে স্বচক্ষে তা দেখিলাম ॥

মদন—(তানের সহিত) বাবা বেশ । বেশ ভালকি । বাঃ শান্তুডী ! মনের কথাই
থুলে বলেছ ।

বাধা—[গুন গুন করিয়া গান কবিতা চেষ্টা]

মদন—হুঁ হুঁ করলে চলে না । তানা নানা কব, যা কব আর হবে না । এব উদ্ভব
নাই বাবা ।

বাধা—মনে হয়, আবাব হয় না ।

মদন—তা বোঝা গেছে । বলুন আমি উত্তর কবি ।

নয়ন—আজ উত্তবে কাজ নেই । একটা কথা শোন (কানে কানে প্রকাশ)

মদন—হাজিবি আছি ।

নয়ন—ভুলো না । আমার মাথা খাও, এসো ।

বাধা—বড়বউ, আমার কানে একটা কথা বল । (নিকটে যাইয়া) আমার কানে
একটা মন্ত্র দেও ।

নয়ন—যে মন্ত্র দিবেছি তাই তো আগে সেধে ওঠ । যত কথা আজই জানা যাবে ।

মদন—(গাত্রোত্থান করিয়া) গুডনাইট টু অল্ । আর থাকতে পারি না । এত
রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই । গিন্নি কাঁটা হাতে কবেই আছেন ।
ক ঘা যে খেতে হবে তা গিন্নীর হাত, আর আমার কপাল । (নৃত্য
করিতে কবিতা গান)

খেমটা

কি বলে দাঁড়াব তাহারই কাছে (ওলো সহ)

ঘড়িতে ঢং ঢং বাজিয়া গেছে

দশে দশ কাঁটার বাড়ি

বাইরে যাই গডাগড়ি,
না জানি ভাগ্যে
আজি কি যেন আছে (ওলো মই) ।

[প্রশ্নান

নয়ন—(ক্ষণকাল পর) আর কথা কি ? রাত তো আর কম হয় নাই ?

রাধা—কথা আব কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া) যাই ।

নয়ন—না পার খুলে বল । তুমি যে তার মায়া ছাড়তে পারবে না, তা আমার বেশ জানা আছে ।

রাধা—একেবারে প্রাণে মারতে ।—

নয়ন—(ক্রোধে) তবে আমি মরি । তোমাব মুক্তকেশী বেঁচে থাক । তোমার ভালবাসা বেঁচে থাক । আমি তার পরানের কাল হয়েছি, তাইতে তোমারও চক্ষের শূল হয়েছি । আর কাজ নেই, আমি গলায় ছুরি দিয়ে মরব । (ত্রস্তে হাতবাক্স হইতে ছুরি লইয়া গলাস্পর্শ) এই ছুরি । তুমি—

রাধা—(ব্যস্তে নয়নতাবার হাত ধকিয়া) ছি ছি, এ কি ? তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে ?

নয়ন—হাত ছাড়, আমি যা বলেছি তাই করবো ।

রাধা—ছুরি ছাড় ।

নয়ন—আবার তোর কথায় ভুলবো ? কাল এককথা আজ এক কথা ? পাঞ্জি ! আমি তোর মুখ আর দেখবো না । [দুই পা সজোরে আছড়াইয়া ঈষৎ ক্রন্দন-স্বরে] আমি এ প্রাণ আব বাখবো না [ছুরির উলটা পিঠে গলা কাটিতে উত্তত] এখন মবি, সব মিটে যাক ।

রাধা—তুমি কি পাগল হয়েছ ? (কাঁপিতে কাঁপিতে) ছুরি ছাড় । আমি সত্যি সত্যি বলছি এই ছুরি দিয়ে মুক্তকেশীর গলা কাটব (ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তোমাব অসাধ্য তো কিছুই নাই । সর্বনাশ ! কি সর্বনেশে বাগ !

নয়ন—[কান্দিতে কান্দিতে] ছুরি নিলে কি হবে ? আমি আজই গলায় দড়ি দিয়ে মরব । এখন বুঝি অন্তরে যা লেগেছে ? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাও, তোমার মুক্তকেশীকেও মেরে কাজ নেই, আমার বাড়িতে এসেও আর দরকার নেই । আমি—

রাধা—আমি ধর্মতঃ বলছি, এই তোমার, গা ছুয়ে বলছি, মুক্তকেশীকে আজ খুন করব । নিশ্চয়ই খুন করব । যদি তুমি দেখতে চাও রক্তস্রব ছুরি এনে তোমায় দেখাব । তোমার পায়ে ধরি, কেন্দো না । (পদধারণ)

নয়ন—(পদাঘাত করিয়া কিঞ্চিং জোরে কান্দিতে কান্দিতে) তোর কথা আবার শুনব ? আমি এ প্রাণ রাখব না ।

রাধা—আমি চললেম, মুক্তকেশীকে খুন করতে এখনই চললেম । যা বলেছি তাই করবো । মুক্তকেশীকে খুন করব (গাত্রোত্থান) মারব, খুন করবো । মুক্তকেশীকে খুন করবো তাতে আমার কি ?—(পদচারণ করিতে করিতে) সে বেঁচে থাকলে আমার প্রাণকে হারাবো, নয়নতারাকে হারাবো । কপালে যাই থাক চললেম । (ছুরি লইয়া বেগে প্রস্থান)

নয়ন—[শয্যা হইতে উঠিয়া দুই-তিন পদ অগ্রসর, একটু উচ্চৈঃস্বরে] দেখ ! মিছে-মিছি ঘরে ফিরে এলে, আর আমায় জীবন্ত পাবে না । (ঘরের জিনিসপত্র শৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে রাখিতে স্বগত) মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ খুলাশা হয় । আর যাবে কোথা ? নয়নতারা ঝাঁটা মারবে আর দুহাতে লুটবে । ওর যা যা আছে সকলই হাত কবব । মুক্তকেশীর ভাল ভাল অলঙ্কার আছে শুনেছি, সেগুলো তো কালকেই হাত করব । এখন একটু আড কবে বসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারব । এখনও কি আমি হাবা আছি ? মা'র চেয়ে কি যে দু'হাত বেড়ে গেল, তবু মার কান্দনি গেল না । যারে পান তারেই বলেন, আমার নয়নতারা বড় হাবা (উচ্চৈঃস্বরে) মা ! ও মা ! যুমেয়েছির্স্ নাকি ? আমি একা একা বসে থাকতে পারিনে, আমার ভয় করে ।

নেপথ্যে—এদিকে আয় না ? দেখ না কে যেন ডাকছে !

নয়ন—আমি যেতে পারিনে । যে ডাকে সে কি পথ চেনে না ?

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—তোর আর নবাবি দেখে বাঁচিনে । সে পথ চিহ্নক আর না চিহ্নক, আমি ডাকছি তুই উঠতে পাললিনে ?

নয়ন —কোন বেটা নবাবপুত্র এসেছে যে এগিয়ে না আনলে আর আসতে পারেন না । আমি যেন ঘরের মাগ হয়ে পড়েছি । [জোরে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে গমন] নেপথ্যে—পথ ভুলেছেন নাকি ? মাপ করবেন । [নগেজ-বাবুর পরিধেয় ধরিয়া নয়নতারার পুনঃপ্রবেশ]

নয়ন —রঙ্গরসভরা এই তারারঙ্গভূমি ।

মন খুলে বোসে দুশ মজা কর তুমি ॥

(নগেন্দ্রবাবুকে সাদরে বসাইয়া উপবেশন)

নগে—বলিহাবি যাই, কবিতা বলতেও শিখেছ ?

নয়ন—চিরকালই কি সমান থাকে ?

নগে—ভাল আছ তো তুমি ?

নয়ন—এতদিন পরে ‘তুমি’ ডাক শুনলেম সেও ভাল । সেই, বন্ধু, ভালবাসা, বসকে, জননী, দিদি, শাশুভী, বড়বউ, আবাব কেউ আদর করে নূতন যৌবন দেখেও বুড়ি বলে ভালবাসার ডাক ডাকে, তুমি সেই নূতন ডাক ‘তুমি’ কথা বেব করে যে কত মজা কবেছ তা আর বলতে পারি না । যে শুনে সেই বলে লোকটা তো ভাবি রসিক । কতজনে দেখতে চায় ।

নগে—দেখালেই পার ।

নয়ন—পাই কোথা । যখন মন চায় তখন পাই কোথা ? আপনি হলেন বিচারকর্তা হাকিম, আপনাব বার পাওয়াও সোজা কথা নয় । এতদিন পবে যে মনে পড়েছে, সেও ভাল ।

নগে—এতদিন পবে কি ? গেছে নিবাবেও তো এসেছি, ‘তুমি’ যে বাধাকান্ট-বাবু পেয়েছ, তাতে কি আব কা’ব দখল পাবাব কথা আছে ?

নয়ন—ও পোড়ামুখোর কথা বলবেন না, মুখে আনবেন না । ওব নাম শুনলে আমার গায়ে আগুন জ্বলে । দিন দুই এসেছিল, তাতেই কি একেবারে তাব বাঁধা হয়ে পড়েছি, না তাব পিরীতে মজেছি ! ঝাঁটাথেক, না নথিখোর আমার বাড়ি বই আব চক্ষে দেখে না । ‘তুমি’ কি বলব, আজ ক’দিন হ’ল খডমপেটা করে একেবারে দূব কবে তাড়িয়ে দিয়েছি, আব আসবে না । আমিও বাড়ি ঢুকতে দেব না ।

নগে—দেখা যাবে, ক’দিন ?—

নয়ন—আব নয় । যাক, ও কথায় আর কাজ নেই । আজকাল দেখতে পাইনে কেন ? আমরা নাচতে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাই বলে কি আর দেখা দিতে নেই । কালো বলে ঝগা করে কি আর হু’দও কাছে বসতে নাই ?

নগে—দেখ ভাই, পরের চাকুরি কবি, চারদিক নজর রেখে চলতে হয় । তোমার বাড়িতে আসতে কি আমার ওজর আছে ? এত কাজ ! দিনরাত খাটি তবু অবসর পাইনে ।

নয়ন—কবে বা ভেকেই পাঠালেন ? তোমরা হুগলি কলেজের পড়ো, তোমাদের চালাকি আর বদমাইশিব কি অন্ত আছে ?

নগে—হুগলি কলেজের দোষ দিও না। বড় কষ্টেব চাকুরি ! ঘোড়ায় চড়তে জানি না তিন ক্রোশ পথ এক দোমে হেঁটেছি। সাঁতারিয়ে গঙ্গা পার হয়েছি, উন্টে উন্টে বাজি করেছি, দশ-বাব হাত উপরে বাতুরঝোলা ঝুলেছি। চাপদেড়ে খোয়েটেব কত বকুনি খেয়েছি। ওব দাড়িনাড়া দেখলেই আমার গা কাঁপত। এখন বলতে হাসি পায়, দুঃখ ও হয়। টামসন ডাক্তারে কত কি ধরে, পরীক্ষা কবে ভাল শরীর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এত কাণ্ডকারখানাব পর হুজুব ক্যাম্বেল বাহাদুরব দগা কবে সব-ডিপুটি খেতাব দিয়ে চাকুরি দিয়েচেন।

নয়ন—বেশ হয়েছে। 'তুমি' যে এখন খেতে পায় না তার উপায় কি ? চেলের দব বেড়েছে, এতে আর বাচবার ভরসা নাই। এক পেট হলে ভিক্ষা করেই চালাতে পারতেম।

নগে—ভয় কি ? রাধাকান্তবাবুব এত টাকা খাবে কে ?

নয়ন—আপনি বললে নাচার। যাকে দেখতে পারবিনে, যাকে ভালবাসিনে, যার নামে দু'শ খেঙ্গরা, তারই কথা !

নগে—না, আর বলব না—আজ আমার বাসায় চল।

নয়ন—এত ভাগগাঁ হবে !

নেপথ্যে—শান্তুড়ী ! ও শান্তুড়ী ! ধুমিয়েছ ?

নগে—কে ডাকে ?

নয়ন—কি জানি।

নগে—বেশ, শান্তুড়ী বলে ডাকছে, চেন না ?

নয়ন—আসলেই নেই, তার আবার শান্তুড়ী।

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—শান্তুড়ী ! জেগে আছ কি ?

নয়ন—শুধু শান্তুড়ী বললে চলবে না, নাম বল।

তৃতীয়বার নেপথ্যে—নাম বলতে লজ্জা করে।

নয়ন—তবে জামাই ! সোজা পথ দেখ। শশুরঘরে।

নগে—তোমার জানা লোক হয়, আর আমাকেও যদি না চেনে, তবে ভেকে আন।

নয়ন—দুই গুণ একত্রে পাওয়া বড় দায়। দেখি—(দোরের নিকট যাইয়া হাত)

করিতে করিতে) বেশ ! বেশ ! জামাই যে ! আরে কবে এলে ? এস এস,
বাবা এস । মেয়ে ভাল আছে তো ?

(মদমবাবুর সহিত নয়নতারার প্রবেশ এবং নগেন্দ্রবাবুর কাপড় দিয়া

নিজ মুখ আবরণ)

মদন—(নয়নতারার প্রতি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা)

নয়ন—(কানে কানে প্রকাশ)

মদন—আর ঢাকবেন না, চিনেচি । তাঁদের আলো কি কাপড়ে ঢাকা পড়ে ? আজ
ধরা পড়েছেন । এ তো সিভিল সার্ভিস ক্লাস নয় যে নোবলিটির সার্টি-
ফিকট না দিলে ঢোকবার জো নাই । এ কলিকাতার জাতঘর । তাতেও
রবিবার আর সকাল-বিকাল আছে । হুজুর, এ হাৰ্ডার স্টেশন বললেও
হয়, ময়ূপস্বী বললেও হয় । পয়সা দিলে আব কথা নেই ।

নগে—(কাপড় ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি আজ আপনাকেই দেখতে
এসেছি । আপনার ধন্যজ্ঞান, জিতেন্দ্রিয় মরকারার ধ্যান, তারই পবীক্ষা
করতে এসেছি ।

মদন—হুজুর ! তবে ঠকেছি ।

নয়ন—জগা—ও জগা ! তামাক সেজে আন । আর সেখানে গিয়েছিলে ?

নেপথ্যে—না—

মদন—শান্তুডী ! আজ যে ভারি আংবামুখো দেখতে পাচ্ছি—মার ধর হেন ত্যান
সাত সতেব, এ আবাব কি ?

নয়ন—চূপ কর, ব'ক না ।

(তামাক লইয়া জগার প্রবেশ)

জগা—এদেব চক্ষে তো আজ ঘুম নেই । রাত ফরসা হয়ে এল, তবু ঘুমায় না ।
খাটতে খাটতে প্রাণটা গেল ! [কলিকায় ফুঁ দিয়ে নয়নতারার হস্তে
ইঁকা দান]

মদন—কি জগন্নাথ ! মুখে যে থৈ ফুটচে । পেটে ভাত গিয়েছে তো ?

জগা—নেও, তোমার আর সে কথা শুধিয়ে কাজ নেই । (নগেন্দ্রবাবুর প্রতি)
বাবুমশাই, একথানা কাপড় দিতে হবে । শীতে আর বাঁচিনে । কাঁপিতে
কাঁপিতে মরে গেলুম বাবুমশাই ।

মদন—তোর বড়বাবু দেবে ?

জগা—আর দিয়ে কাজ নেই। আপনারা দিলে দশ জায়গায় দেখাব।

নগে—দশ জায়গায় দেখিয়ে আর কাজ নাই। আচ্ছা, পাবে।

জগা—(গড হট্টয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

নগে—(নয়নতারার প্রতি) এখন আর কি—যাই।

নয়ন—যে আজ্ঞা—

নগে—(গাত্রোত্থান করিয়া মদনবাবুর প্রতি) মহাশয়, কিছু মনে কববেন না,
চললেম।

মদন—আপনি মহৎ ব্যক্তি। আমাদের হাকিম,—নমস্কাব।

নগে—[যাইতে যাইতে] নমস্কার নমস্কাব।

[প্রস্থান]

নয়ন—জামাই ব'সো, আমি আসচি।

মদন—কোথায় ?

নয়ন—এই আসছি, তুমি একটু ব'সো, আমি আসচি—মাথা খাও, যেও না।

[প্রস্থান]

মদন—একবার ঝ্যাটা খেয়ে এসেছি, আবাব কোথা যাব ? (স্বগত) বাবু লোভে
পড়ে এত টাকা দিয়েও নয়নতারাব মন পান নেই। শক্তের কাছে কিছুই
নয়। জগা, ও জগা ! তামাক আন।

নেপথ্যে—যাও মশাই। জগাকে আর ভুগিও না।

মদন—শুনে যা না। কথা না শুনিস তোর মায়েব কাছে বলে দেব।

(জগার প্রবেশ)

জগা—মা কি আর আজ আসবে যে ব'লে দেবে ?

মদন—সে যে এখনি আসবে ব'লে গেল ?

জগা—তুমিও যেমন পাগল। আসবে বলে গেছে সেই কথায় ভুলে রয়েছ। আমাকে
বলে গেছে, বড়বাবু এলে বালিস যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছে।

মদন—ডিপুটিবাবুর বাসায় গেছে ?

জগা—আমি ডিপুটিবাবু চিনিনে ; ঐ যে দাড়িমুখ হাকিম—তারই হাত ধরে
বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—তার সঙ্গে গেছে কিনা জানি না।

মদন—(গালে হাত দিয়া নিস্কর)

জগা—ভাব কি ? সে আজ আর আসবে না ।

মদন—কি পাঞ্জি । এদের একটি কথায় বিশ্বাস নাই । আমি কত দেশ পুড়িয়ে
এলেম । আমাকেও দেখি জ্বল কললে, আর কখনও না, এই নাকে কানে
—আব কখন না—আর না— (রাগ-ভাবে প্রস্থান)

জগা—বয়ে গেলো, নয়নতারা তো আব বাঁচবে না ? তাব—(প্রদীপ নির্বাণ
কবিষা প্রস্থান)

চতুর্থ রঙ্গভূমি

বাধাকাস্তবাবু বাডি, মুক্তকেশীর শয়নঘর ।

(মুক্তকেশী ও অপবিচিত একজন পুরুষ আসীন)

পুরু—তাতে আব কি হবে ?

মুক্ত—আর কি হবে ? যা কপালে ছিল তাই হলো । এব বাডা আর কি হবে ?

পুরু—বাবু এই পালঙ্কে শুতেন ?

মুক্ত—মনে হয় না ?

পুরু—(হাসিতে হাসিতে শয়নের চেষ্টা) তবে সকলই নূতন । হলো ভাল । এস,

তুমিও শোও । (শয়ন)

মুক্ত—(পালঙ্কের পাশে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা)

পুরু—যা কবতে হবে তাতে আবার ভাবনা কি ? দেখছ না, রাত অনেক হয়েছে ।
শোও ।

মুক্ত—(শয়ন করিতে করিতে) কপালে যা ছিল তাতো হলো দেখি ! (পুরুষের
বাম-পার্শ্বে শয়ন এবং কিছুকাল পবে ছুরি-হস্তে বাধাকাস্তের প্রবেশ)

বাধা—(দোরে দাঁড়াইয়া চুপে চুপে স্বগত) ঘুমিয়েছে, না জেগে আছে ? [মস্তক
উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি] কে কোন মাড়া-শব্দ তো পাই না । জাগাব ? নয়ন-
তারার মন যোগাতে ঘরের স্ত্রীকে—না—পারব না । (একটু অগ্রসর)
নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এখন এমন হলো কেন ? কি করি
[চিন্তা] দূর দূর, ফিরে যাই ! [প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পবে পুনঃপ্রবেশ]
নয়নতারাকে তো আর পাব না । কিছু না করে শুধু শুধু ফিরে গেলে প্রাণের
তারাকে তো আর পাব না ? কে জানবে ? কেই বা বিশ্বাস কববে ?

মারবো—একেবাবেই কাজ নিকেশ করবো। মারবই—এক দিক তো ফবসা করে দেই। একবার মুখখানা দেখে নেই। জন্মেব মতো মুখখানা দেখে নেই। চিবড়ুখিনীর মুখখানা দেখে নেই। দেখব ? মুখ দেখে যদি মায়া হয় ? না, তা হবে না, মন বেঁধে একবার বই—ভুবাব তাকাব না। [নিঃশব্দে অগ্রসর] এ কি ? পুরুষ ! মুক্তকেশীর বিছানায় পুরুষ। এ কি উপপত্তি ! মুক্তকেশীর উপপত্তি ! আর ত সহ্য হয় না। আমার জ্যী ভ্রষ্টা—আমার জ্যী উপপত্তি নিয়ে শুনে, আমার বিছানায় শুয়ে ! কি কবি। এ জালা, এ আগুন কিসে নিবারণ কবি। যা অদৃষ্টে থাকে, ছোটোকেই কাটবে। এ প্রাণ থাকে আর যান, দুজনকেই মাববে। [বোধভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি] কি আমি—এ কি আর চক্ষে দেখা যায়। [হস্তস্থিত ছুরিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া] এ ছুরিতে হবে না। ছোটো মাথা একেবারে কাটবে না। পাঁঠাকাটা দাখানা নিয়ে আসি। (ছবি ফেলিয়া প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে দুই হাতে দা উত্তোলন করিয়া ক্রোধান্ধে প্রবেশ এবং উচ্চস্ববে) মুক্তকেশী ! এই বুঝি তোব সতীপনা ? ও বে ! (দাব আঘাত করিতে উদ্যত এবং মুক্তকেশী ও পুরুষ ত্রেস্তে শয্যা হইতে দুই পার্শ্বে দুইজন দণ্ডায়মান)

উভয়ে—কব কি ? (বাধাকান্ধেব হস্তধারণ)

পুরু—(বাধাকান্ধেব হস্ত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া বোম্বে) কি, এত কেন ? ভাল চাও সরে যাও, প্রাণ বাঁচাতে চাও—দুদিন কাল যদি নয়নতাবাব মন যোগাতে চাও তবে সরে যাও—

বাধা—তুই কে বে বেটা ! জানিসনে এ কার ঘব ? তোব এত বড় মাথা ! আমার ঘবে—

মুক্ত—কেন ? তোমাব কি ?

বাধা—(কাঁপিতে কাঁপিতে) হারামজাদি ! আবার মুখ বাড়িয়ে কথা বলছিস। লোকের কাছে, আমার কাছে মিছেমিছি সতীপনা দেখিয়ে গোপনে গোপনে এই কাজ ? ও বে হারামজাদি ! তোব এই কাজ ?

মুক্ত—তাতে তোমার কি ?

বাধা—আবার কথা ? কি বলব চাঁচিয়ে ঠেকেছি, বাগে পাগল হয়ে সব নষ্ট কবেছি, তা নইলে এতক্ষণ দুজনেই ঘরের বাড়ি দেখতে পেতি। তোব অসাধ্য কি আছে বল তো ? এই তো খালি ঘর পেয়ে উপপত্তি নিয়ে মজা করিস। আর দেশসুদ্ধ লোকের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াস। আজ কি হয় ? ক'দিন

লুকাবি। আমি তোকে খুন করবো। তোর ভালবাসার বাবাকেও খুন করবো। যাবি কোথা? (পুরুষ-প্রতি আক্রোশে) শালা! তুমি খালি ঘব পেয়ে আমার সর্কনাশ করেছ। তোর মাথা কাটব। বাঞ্চং গরুথেক নেড়ে! আমার সর্কনাশ কললি। (ক্রোধে দাঁড়ি ধরিতে অগ্রসর)

পুরু—সাবধান! দা দেখেছ? তোমার মাথা কাটবো। বেহায়া! বের। আমার ঘব থেকে শীঘ্র বের। আব জায়গা পাও নাই, এখানে মাতলামি করতে এসেছ? বের বেটা—‘খালি ঘব, খালি ঘব’ কবে বেটা তোলপাড় লাগিয়েছে। খালি ঘব কব কেন? একা ফেলে যাও কেন? বেটা নচ্ছার বের। যা, তোব নয়নতাবাব ঘবে যা। এ ঘবে কেন? আমি ইচ্ছে ক’বে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এয়েছে। টাকা পেয়ে পবেব ঘবে আসতে দোষ কি?

রাধা—(মুক্তকেশীকে মাঝিতে উত্তত; পুরুষকর্তৃক বাধা) টাকা দিয়ে উপপত্তি এনে আমার ঘবে—

মুক্ত—কেন? এত কেন? তুমি টাকা দিয়ে বেগা এনে আমার ঘবে—আমি পাবিনে? একবারে দেখেই সচ্ছে না। খুন করতে চাচ্ছ। ভুজনের মাথাই কাটতে চাচ্ছ। আমি যে চিবকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না? কিছুই বেদনা লাগে না? বেশ কবেছি, এতে তোমার কি? বাগই বা কেন? কাটাকাটি মাঝামাঝিই বা কেন?

রাধা—তোব যে ভারি সাহস! ধরা পবলি, তবু তোব কথাব বাধুনি গেল না। তবু তোব জোরের কথা গেল না। বল তো, তোকে এত সাহস কে দিয়েছে?

মুক্ত—কাকেও দিতে হয় নাই। কেউ শেখায় নাই। ভুগে ভুগে আপনিই শিখেছি। তুমিই তো এর গোড়া। তবে আবাব এত কেন? যেমন দেখিয়েছ তেমনই দেখ। দেখলে কি গা-জালা কবে?

রাধা—তুই কি একেবাবে লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচিস, এতদিন তো তোর মুখে একটি কথাও শুনেতে পাই নাই। হাতে হাতে ধরা পবলি, তবু তোর লজ্জা হয় না। তোব কি মবণ নাই?

মুক্ত—তোমার মরণ নেই? কথা বাড়ালেই বাড়ে। শুনালেই শুনেতে হয়, দেখালেই দেখতে হয়। আর গোল কর না, সোজা পথ আছে, চলে যাও। বেগার জন্তে সব মজালে। আবাব কাল রাত্রে যা করেছো, তার উপরে কথা?

ধিক তোমাব জীবনে ! ধিক তোমার মুখে ! তুমি আগে করেছ, আমি না হয় পাছে কবেছি, আর পাছেই বা কি ? সইতে না পেরে তোমাব জালা—তোমাব দৌবাগ্নি সইতে না পেরে মুখ ফুটে কান্দলেম, হাত-পা-বললেম, কিছুই হলো না, কি কবি ! শেষে আব কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় কবেছি । এখন তুমি তোমাব মতো থাক, আমি আমার মতো থাকি ।

[পুরুষের গায়ে ধাক্কা দিয়া] চল ।

বাধা—তুই কি হাতে হাতে প্রতিশোধ নিবি ? আমি যা কবেছি তুইও তাই কবি ?

মুক্ত—কেন কবব না ? তুমি আমি ভিন্ন কি ? আমার শরীব বুদ্ধি বক্তমাংসেব নয় ?

বাধা—এই কি তাব প্রতিশোধ ?

মুক্ত—এক বকম অনেক দিন সয়ে, অন্তবে যা খেয়ে এই কবেছি । প্রতিশোধ নেই নাই । প্রতিফলও দেখাই নাই, এখনও অনেক বাকি ।

বাধা—এব উপবে কি আবও আছে ?

মুক্ত—আছে বৈ কি ? হগেছে কি ? একদিনেই এত ! অনেক আছে, ক্রমে দেখ—

বাধা—আরও দেখাবি ?

মুক্ত—দেখাবো ।

বাধা—আমি আজ বেত যদি কিছু না পাবি, কাল তোকে দেখবো ।

মুক্ত—তুমিও দেখবে । আবও কতজনে দেখবে, কত কানেও শুনবে । ভালই তো !

বাধা—(মাটিতে বসিয়া অধোবদনে মাথায় হাত দিয়া চিন্তা)

মুক্ত—(পুরুষের কানে কানে প্রকাশ)

পুরু—ব্যস্ত কেন ? দেখ না । কেবল ঔষধ ধবেছে—

বাধা—(মাথা হেঁট করিয়া কাতরস্ববে) হা ! আমি কি কবতে এসে, কি দেখলেম । যা কখনও ভাবি নাই তাই হলো । যা কখনও মনে কবি নাই, তাই দেখতে হলো ! নয়নতারা গোপনে জানতে পেরে কি কৌশলে আমায় দেখতে পাঠিয়েছিল ? আমি কবেছি তাইতে করেছে । মন্দ কথা নয় । পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে । স্বেচ্ছাশ্রমে দুঃখ আছে । তবে আব কেন ? বুঝেছি । (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আমার দোষ ? যথার্থ আমারই দোষ ।

আমার দোষে এই হলো ? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী করব, সে পথে তো আমিই কাঁটা দিয়েছি । আমি নখনতাবার প্রণয়-কাঁদে পড়ে সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছি । হাঃ হাঃ ! আমার সর্বনাশ আমিই কবেছি, আপন পায়ে আপনি কুড়ল মেবেছি । (মুক্তকেশীর পুরুষের সহিত ইঙ্গিতে কথা-বার্তা) কাকে কি বলবো—আপন মাথা আপনিই খেয়েছি ; আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না । এত তাচ্ছল্য, এত অগ্নায়, এত ঘৃণা না করলে কখনই এত হতো না । বাধাকান্তের চক্ষু এতো দেখতো না । আমাবই দোষ, আমাবি—আমিই মূল । আব দুঃখ কি ? বেশ হয়েছে । মুক্তকেশী বেশ কবেছে । (কান্দিতে কান্দিতে) আমি বেশাব মায়ায় না ভুললে মুক্তকেশী কখনই আমাব ভুলতো না । আমি একদিন ভুলেও যদি তাব স্ত্রের পথে দাঁড়াতেম, তবে কি আব সে এ-পথে দাঁড়ায় ? আমি যদি তাব মনেব দুঃখ বুঝতে পেতেম তবে কি সে এ-পথে দাঁড়ায় ? আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, হাঃ ! ভাল মুখে যদি দুটো কথাও বলতেম, তবে কি—[ক্রন্দন]

মুক্ত—(পুরুষের প্রতি) আব কেন ?

পুরু—একটু বাকি আছে ।

রাধা—[কান্দিতে কান্দিতে] আর সহ হয় না । ভগবান ! এই দেখালে ?

মুক্ত—কেমন ? লেগেছে ?

রাধা—(কান্দিতে কান্দিতে) আব বলো না, তোমার পায় ধবি আর আমায় কিছু বলো না । আমি বেশ বুঝেছি, বক্তমাংসের শরীব, সকলের পক্ষেই সমান । আর ঘা দিতে হবে না ।

মুক্ত—চিরকাল কেঁদেছি । এখন তোমার পাল ।

রাধা—[ক্রন্দন করিতে করিতে] আমি মিনতি করে বলছি আব ঘা দিও না, আর দণ্ডে মের না । আব বলো না । আমাব এখন যেমন হয়েছে, তোমারও তেমনি হয়েছিল । তা আমি বেশ বুঝেছি । তাইতে কি এমন করে জাত-কুল মজাতে হয় ? বল তো কি কবে মানুষের মধ্যে মুখ দেখাব । এ কথা কি আর ছাপা থাকবে ? শুনতে কি আর বাকী থাকবে ? হয় কাল, নয় দু-দিন পরে একেবারে ঢাকে-ঢোলে কাঠি বেজে উঠবে । কতজনে মুখের

উপরে কত প্রকারে বাড়িয়ে বলবে, তা তো এ প্রাণে সহ্য হবে না। পরের মুখে এ কথা শুনে আমার মুখখানা কেমন হবে বল তো? মেয়ে-প্রাণে সকলি সয়। হাজার হলে কেহ কিছু বলে না। তোর সকলি বিপরীত।

মুক্ত—না হবে কেন? আমি চিরকালটা তোমার পায়ে ধরে কত মিনতি করে বলেছি। এত কব না। বেশাব কথায় ঘবের স্ত্রীকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলো না। দেখ, অনেকেই কবে, অনেকেই সযে থাকে, এমনতর কেউ নয়, এত কেউ নয়, স্বামী বই স্ত্রীর আব কে আছে? স্বখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে আব কে আছে? এত কব না, পায়ে ধবে বলছি। এখনও সাবধান হও, তোমাবই মন্দ হবে। অন্তরে যা লাগে?

রাধা—বেশ লাগে। আমি কেন, অনেকেরই লাগে। আগে ভুগিয়েছি, এখন ভুগছি। আমার আব কোন কথা নাই। তোমাব যা ইচ্ছা তাই কর। দা-খানা আমার হাতে দেও, আমি এ প্রাণ আর বাখব না। এ মুখ আব মানুষকে দেখাব না। কোন মুখে আব কোন কথাও আব শুনে হবে না। মুক্তকেশী, তোমার পায ধরি, দা-খানা আমায় দেও, [কান্দিতে কান্দিতে] আমি যা বলি তাই কব। আমার অন্তরের জ্বালা মিটিয়ে দেও। আব আমার সহ্য হয় না। আমি নয়নতাবাব কথায় তোমায় কাটতে এসেছিলাম। তোমার মুখখানি দেখব বলে এগিয়ে দেখেই আমার দিকবিদিক কিছুই জ্ঞান থাকল না, আমি কোথায় গিয়েছি, কি করেছি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম। আমার এ কি হলো? তুমি দা-খানা দেও, দেখ, তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করছি। তোমাব প্রত্যয় না হয় তোমার উপপত্যিকে বলে একচোটে আমার মাথা ছুইখণ্ড কবে সকল জ্বালা মিটিয়ে দেও। প্রতিশোধ হোক। আজই প্রতিশোধ হোক। -দেখ, আমার মরণেই তোমাদের মঙ্গল ও স্বথের কারণ।

মুক্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) আব সহ্য হয় না, আর থাকতে পারিনে। আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ কর, মেয়েমানুষ মেয়েবুদ্ধি বলে মাপ কর। আজ তোমার মনে যে ভাব হয়েছে, আমি চিরকাল এইভাবে দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে থাক হয়েছি। সময়ে কত কথা মনে হয়েছে, কত কাজে মন গিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরবো—তাও কতদিন মনে করেছি। বিষ খেয়ে মরবো, তারও যোগাড় করেছি। সময় সময় তোমার মুখখানি দেখব সেই

আশাতে আবার সকলই ভুলে গেছি। কপালগুণে এই পোড়াকপালের গুণে কখনও ফিবেও চাইলে না। কি কবি, ভেবে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় কবেছি। [ক্রন্দন কবিতা কবিতা চরণধাবণ] অপবোধ হয়েছে, আমি তোমার দাসী, আমায় ক্ষমা কর।

রাধা—[দুঃখিতস্ববে] তোমার অপবোধ কি? যা কববার তা তো করেই বসেছো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পুরুষের প্রাণে এ কখনই সহ্য হয় না, রক্তমাংসের শরীর, আর স্বামীর চক্ষু এ দেখে কখনই স্থির থাকতে পাবে না। আমায় মেবে ফেলো। আমার মুখ তোমরা দেখ না। আমিও অব দেখতে চাইনে।

মুক্ত—আমি উপপতি কবেছি, তা বলে তুমি আমাকে অসত্য মনে কর না। আমি এমন কুকাঁজ কবে যে তোমার সর্বনাশ করেছি তা তুমি মনেব এক কোণেও ঠাই দিও না। আমার মনের ভার তোমার মন দিয়ে জানাতেই আমি এই করেছি।

রাধা—পা ছাড়। আমি বিনয় কবে বলছি, পা ছাড়। আমি আজ বাত্রেই যা হয় একখানা কবব। এ কি সামান্য কথা। [ক্রন্দন] আমি বাধাকান্ত, আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—

পুরু—এখন বুঝেছেন। হাতে-পাতে ধবেছেন, স্থির কবেছেন মুক্তকেশী ভ্রষ্টা।— স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়েছে, অন্তবে যা লেগেছে, জীবনে ঘৃণা ধবেছে। তাইতে প্রাণ-ত্যাগ কবতেও প্রস্তুত হয়েছেন। এতদিনে এ বুদ্ধি—এ ঘৃণা কোথা ছিল? যা হউক, আপনি আপনার স্ত্রীর সত্যিকার বিষয়ে প্রমাণ পেলে বোধহয় প্রাণ ধড়েই বাখবেন? আমি উপপতি নই, মুক্তকেশী আমার ভগ্নী; আপনি সাম্বী-সত্যী প্রতি কোনরূপ দোষাবোপ কববেন না।

রাধা—এর আবার প্রমাণ? যাক আমার স্ত্রীতেও কাজ নাই, এ বাড়ি ঘরদোরেও কাজ নাই, আমার যা মনে—(মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া বেগে যাঠিতে উদ্ভূত)

মুক্ত—ও সহ—

পুরু—তাই তো, এখন যে আর কিছুতেই হয় না। এত বললেম যে মুক্তকেশী আমার ভগ্নী, আমার যা—তবু তাঁর প্রত্যয় হলো না। ভাল কথা। দেখ, মুক্তকেশী সত্যী কি অসত্যী।—হজুর, আর ভাববেন না—আমি

পুরুষ নই, আপনারই চির-ভালবাসার রাইমণি (কৃত্রিম পরিধান পরিত্যাগ
ইত্যাদি) । সইয়ের দুঃখ সইতে না পেরেই এই উপায় কবেছি ।

রাধা—(সচকিতে) সই—সই—এ কি ! মুক্তকেশী, এ কি ?

মুক্ত—(নিস্তব্ধ)

রাই—(ঈষৎ ঘোমটা দিয়া) আর কি ? মনে মনে যে সইয়ের মনের ভাব বুঝেছেন
সেই ভাল !

রাধা—না জেনেই এতদূর হয়েছে । আব নয়, সই, আর নয় । আমার ঘাড়ের ভূত
আজ নেমে গেছে ।

রাই—ও সই । এখন আর কথা কি ? ওভাবে বসে বইলে কেন ? শিখেছো
তো, ও সই ! শিখেছ তো, ‘এর উপায় কি ?’ আজকার মতো পাল্লা শেষ
করে চল ঘুমই গে ।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন

উদাসীন পথিকের মনের কথা

প্রথম স্তব

প্রথম তরঙ্গ

নীলকুঠি

কুষ্টিয়ার বর্তমান রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরসীমা গোবীনদী, পূর্বসীমা কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গা গৌরীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া ক্রমে দক্ষিণদিক বহিয়া কুমারনদে মিশিয়াছে। কালীগঙ্গার বাম তীরে শালঘর মধ্যায় নীলকুঠি। বেলওয়ে স্টেশন হইতে সাত মাইল ব্যবধান। বর্ষাকাল—নীল কাজ আবশ্য, দিবাভাত্র লোকজনের কোলাহল।

বেলা প্রায় চটা। কুলিবা বোঝা বোঝা ‘নীল শিটি’ মাথায় কবিয়া হুজের বাহিবে ফেলিতেছে, নীলপচা দুর্গন্ধময় জল, নাক-মুখ বহিয়া বুক-পিঠে পড়িতেছে। অল্প পরিসর পৰিধেয়খানি ভিজিয়া পায়ের পধ্যন্ত নীলরঙে বাঙিন। যাইতেছে। ছোট হুজের কুলীরা ব’ঠে হস্তে চক্রাকায়ে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীলপচা জল মাই (মস্থন) কবিত্তেছে। জাঁতঘবে জালানি মাল জাঁত হইতেছে। আপিস দালানে আমলাগণ আপন আপন কার্যে বসিয়া কাগজ কলমে মনের সহিত কথা-বার্তা কহিতেছে। মেঃ টি. আই. কেনী শয়নক্ষেত্রে আছেন। দ্বিতল হইতে নামেন নাই। প্রতিদিন ৭টার সময় নিচে নামিয়া ডিহি দেখিতে গমন করেন, আজ চটা বাজিয়া যায়, নিচে আসিতেছেন না। কেফাতুল্যা দরওয়ান সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারি করিয়া খাড়া পাহাৰা দিতেছে। রাম ইয়াদ পাঁড়ে জমাদার ঢাল-তব-বার বাঁধা, দাঁড়ি দুই ফাঁক করা—কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আমীন, তাগাদগীব, কোড়াবরদারসহ বারান্দার সম্মুখে মনিবেব আগমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণি মাতত লালবনাতেব বৃত্তি পরিয়া, মাথায় লালপাগড়ি বান্ধিয়া অঙ্কুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া কর্ণ নাড়িয়া পুচ্ছ হেলাইয়া বিরক্তিকর কীট-পতঙ্গসকল শরীর হইতে তাড়াইতেছে। জয়চাঁদ সহিস শ্বেতবর্ণ অয়লাবের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে। সময় সময় চামরদ্বারা ঘোটকবরের গাত্র

হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। তত্রাচ খবগতি ‘অয়লার’ পুচ্ছগুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বেহাৰাগণ পালকি মাটিতে রাখিয়া ‘বেলা হইল’, ‘আজ রোদ্রে মারা পড়িল’, ‘সাহেবের বুদ্ধি নাই’ বলে কার যেন পিতৃমাতৃশ্রদ্ধ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সময় যাইতেছে। সকলেই দোঁখল কেফাতুল্যা পায়চাৰি রাখিয়া সেলাম বাজাইবাব জন্ত নম্রভাবে দাঁড়াইল। দব-ওয়ানজীব ভাবে সকলেই বুঝিল যে সাহেব নিচে নামিতেছে, সকলেরই পূৰ্ব্ণভাব পৰিবর্তন। নূতন ভাব নম্র ও মতক। বেহাৰাগণেব মুখ বন্ধ, বেশীব ভাগ পালকি ঘাড়ে, কাম বাজাইতে খাড়া—প্রস্তুত। টি. আই. কেনী পাটপ টানিতে টানিতে বেতহস্তে নীচে নামিলেন। শশবাস্তে সকলেই ঘাড় নোয়াইয়া দণ্ডবমত সেলাম বাজাইল। সামান্য চাকবেব সেলামেব প্রত্যুত্তর, প্রায়ই নাই, ইংরেজ আবও কড়া মেজাজ, সেদিক লক্ষ্য না থাকিবাবই কথা। জয়চাঁদ সহিসেব দিকে বেত উঠাইয়া বলিলেন, গোবা লাও। জয়চাঁদ ঘোড়া লইয়া নিকটে আসিল। কেনী অশ্বে আবোহণ করিলেন। আবাব ‘বন্দুক’ শব্দ উচ্চারণ করিতেই পৌববকস নিকাবী তাড়াতাড়ি বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমীন, তাগাদগীব, কোড়াববদাব চাকবি বাচাইতে উদ্দগ্নাসে দৌড়িতে লাগিল।

নীলমণি মাল্লত চাই ধাং করিয়া পাবীজানকে পিলখানায় লইয়া গেল। বেহাৰাগণ আজিকাব মত রক্ষা পাইল। কিন্তু মর্দাব বেহাবা মধু বলিতে লাগিল, “দেখ তো ভাই, বেটাব বুদ্ধি! কথাটা আগে বললেই হইত। আজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডিহি দেখিতে যাইব, হাতী-পালকিব দবকাব নাই।” মনিবেব বুদ্ধি-বিবেচনায় সাতপ্রকাব ক্রটি দেখাইয়া আপিস ঘরের বারান্দায় পালকি রাখিয়া মধু সদলে বাসায় চলিয়া গেল।

টি. আই. কেনীব মনেব কথা আগে কেহ জানিতে পাবিত না। কোনদিকে নীল দেখিতে যাইবেন, সে কথা কাহাবও জানিবাব সাধ্য ছিল না। কুঠির চতুর্দিকেই নীলজমি। যে দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই তিনি যাইতেন। আমীন, খালাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। একদিন যেদিকে যাইতেন, পরদিন আর সেদিকে যাইতেন না—একথা সকলেই জানিত। আজ তিনদিন ক্রমাগত উত্তরদিকেই যাইতেছেন। কুঠির উত্তরদিকেই দমদমা গ্রাম। টি. আই. কেনী দমদমা গ্রামের মধ্যে যাইয়া পথ ভুলিয়া অন্ধ পথে যান। তাঁহার বহুকালের

চেনা পথ কেন যে ভুল হয়, তিনিই জানেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি গৃহস্থেব কুঁড়ে-ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন। গ্রামাপথ। গ্রাম্যালোক সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। সাহেব বাহিব হইয়াছে শুনিলে যে যেখানে থাকে সে সেখানেই। গাছের আড়ালে কি পথের ধারে লুকায়—ঝাড়-জঙ্গলে মাথা দেয়, একেবারে সবিয়া যাঠিতে না পাবিলে কঁাপিতে কঁাপিতে সেলাম বাজাইয়া জোবপায়ে সবিয়া পড়ে। গ্রামা স্ত্রীলোকেবা সাহেবেব নাম শুনিলেই ঘবেব দোব ঝাঁটিয়া কেহ মাচাব নীচে, কেহ ঘবেব আড়ালে থাকিয়া বিলানী রূপ দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। কেনী একদিনে এক পথে কখনই যাওয়া-আসা করিতেন না। আজ তিনদিন হতে তাঁহার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। প্রতি-দিনই দমদমা গ্রামেব মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করেন। একজন দুঃখী প্রজাব বাড়ির নিকট বিনাপবাধে ঘোড়াব উপব চাবুক সৈ করেন।—কিন্তু অশ্বের বাগডোরে গতিবোধ সংকেত। অশ্বলবেব মহা বিপদ। পিছাড়া, সিকপা যতবকমেব বজ্জাতি সে জানিত তাহা বাধ্য হইয়া করিতে বাধ্য হইত। খবেব খট খট, চাবুকের পটাপট বিলাতী কণ্ঠেব ছটপাট শব্দ শুনিয়া অনেকেই সাহেবেব ঘোড়াব কাণ্ডকারখানা ছুপনি পাতিয়া দেখিত। কেনীব সাদা চক্ষুও চাবিদিকে অনববত ঘুরিয়া কি যেন দেখিত।—চক্ষু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রথমদিন যেখানে ঘোড়া দাঁড়াইয়াছিল, আজও সেইস্থানে দাঁড়াইল। সিকপা, পিছাড়া ঝাড়া, কিছুই বাকী বহিল না। পীরবকস প্রভৃতি যাহাবা কিছু পিছনে পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া জুটিল। ঘোড়া আব সোজাভাবে চলে না। অনেক গৃহস্থেব পরিবাব ঘবেব বেড়া ছিদ্র কবিয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। কেনী বাহাদুরও আড়নয়নে চক্ষের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুখ দেখিবার জন্ত নিরপরাধ দেউহাজাব টাকা দামেব ঘোড়াটা নষ্ট করিতে উত্তত, আজ সে মুখ তাঁহার পাপচক্ষে পড়িল না। সাহেব অশ্ব হইতে নামিয়া স্নেহবশে অশ্বগাত্রে হাত বুলাইয়া অনেক দেলাসা দিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষুর কার্য্য ভুলে নাই। সেই চক্ষু, সেই দর্শন, সেই আশা। ঘোড়া সহিসেব হস্তে অর্পিত হইল। পীর-বকসের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্দুক ভবা আছে?”

পীরবকস যোডহাতে বলিল, “হুজুব! আমি ভরিয়া আনিয়াছি।”

কেনী বন্দুক লইয়া একটি গ্রাম্য ময়নাপাখির প্রতি লক্ষ্য করিলেন। সকলেই বলিল, “হুজুর! ও পোষাপাখি। হুজুরের চাকব জিকি গাড়াওয়ানেব ময়নাপাখি, পোষ মানিয়াছে, বুলিও ধরিয়াছে।”

কেনী বলিলেন, “জকি গাড়োয়ান কে?”

একে বলিতে দশজনে বলিয়া উঠিল, “হুজুরেরই চাকব—গরুর গাড়ীর কাজ করে। হুজুরের বহুদিনেব চাকব, এ বাড়ি-ঘরদোর সকলি হুজুরের, হুজুরই সকলেব মালিক।”

সাহেব অত্ৰদিকে ফিরিয়া একটি ফাঁকা আওয়াজ কবিলেন। ময়না জকির ঘরেব মধ্যে পলাইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাউ মাউ কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেনী পৌববকসের হস্তে বন্দুক দিয়া অশ্রু আবোহণ কবিলেন। অশ্রু শান্তভাবে চলিতে লাগিল। নীলজমি দেখা আজিকার মত এই পর্যাস্ত শেষ হইল। কিন্তু অকারণে দুই-তিনজন কলৌকে চাবুক সহ কবিয়া কুঠির দিকে ফিবিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখে আসিয়া হরনাথ শ্রী মিশ্রী (নায়েব), শঙ্কুচরণ সাত্তাল (দেওয়ান) প্রভৃতিকে কটু কথায় কয়েকটি কথা কহিয়া গরমভাবে বলিলেন, “যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাব কি করিয়াছ? সাঁওতাব মৌবসাহেবেব নিকট পত্র লিখা হইয়াছে?”

হবনাথ বলিলেন—

“ধৰ্ম্মাবতাব। কোন বিষয়ে ক্রটি নাই। পত্র লিখা হইয়াছে, কেবল হুজুরেব সহি বাকি।”

কেনী অশ্রু হইতে না নামিতেই তিন-চাবিজন আমলা ব্যস্তসহকারে ঘোড়া ধবিলেন। “কৈ। সে পত্র কৈ?”

সাত্তাল মহাশয় পত্র হাতে কবিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখেই পত্র সহি হইল, তখনি সাঁওতায় লোক বওনা হইল।

কেনী বলিলেন—

“জকি গাড়োয়ানেব বাড়িতে একটি পোষাপাখি আছে, আমি সেই পাখিটা চাই।”

এইকথা বলিয়াই বাসঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, “জকি যে দাম চাহে, সেই দামই দিব। সকের জিনিস জবরাণে লইব না। তোমরাও জবরদস্তি করিয়া আনিও না।”

এই কয়েকটি কথা যেন হৃদয় হইতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

মীরসাহেব কে ?

শালঘব মদুয়াব কুঠির উত্তরে সাঁওতা গ্রাম। স্রোতস্বতী গোবীনদীব পশ্চিমকূলে।—কুঠি হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। সাঁওতার বিখ্যাত জমিদার মীবসাহেব। টি. আই. কেনী চিন্তা উচ্চ, আশাও উচ্চ। তাঁহার পূর্ববর্তী কুঠিখালগণ সাঁওতার জমিদারের সহিত ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ কবিয়া চিবকাল পবাস্ত হইয়াছেন। কেনী সেইসকল ইতিবৃত্ত শুনিয়া পূর্ব হইতেই মীবসাহেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কবিয়াছিলেন। পবস্পৰ বিসম্বাদ কবিবেন না—কোন প্রকারে কেহ কাহাবও মন্দ চেষ্টায় যাতিবেন না—আপদ-বিপদে সকলেই সকলের সাহায্য কবিবেন, যোগ দিবেন। কোনদিন কোন কার্যে কেহ কাহাকে শত্রুভাবে দেখিবেন না। সর্বদা পিরিত, প্রণয়ে, আপন বিষয়-বিভবের কার্য চালাইবেন—উভয়েই এই স্থিতিপ্রতিজ্ঞা।

এই কেনী সহিত বন্ধুতা স্থায়ী হওয়ায় ও অঞ্চলের সমুদায় নীলকবেব সহিত মীবসাহেবের বনিবনাও হইয়াছিল। টি. আই. কেনী আজ যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মীবসাহেবের সহিত পবামর্শ জ্ঞাতিয়া অগ্রসব হইবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাহাতেই পত্রলেখা।

মীবসাহেব কে ? এখানেই পরিচয় দিয়া রাখি। কাবণ অনেক সময় ইহার সহিত পাঠকগণের দেখা হইবে।

মীবসাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জল রত্ন। তাঁহার বংশমর্যাদা ভাবত-বিখ্যাত। যদিও তিনি ভাবত রাজ্যের প্রান্তসীমা বঙ্গে বাস কবিতেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ, পবিত্রধাম বোংগদাদ শব্বিফেব মহা মাননীয় এবং গনণীয়, সৈয়দ-বংশসম্ভূত, প্রভু সৈয়দ সাদুল্যাব বংশধর। সেই তাপসশ্রেষ্ঠ প্রভু সৈয়দ সাদুল্যাব বোংগদাদ শব্বিফ হইতে ভাবতে ক্রমে বঙ্গরাজ্যে, পরিশেষে ফবিদপুৰ জেলার অন্তর্গত স্রোতস্বতী চন্দনানদীব তীরে সেকাড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন। সহচর, অহুচর, পরিষদ, মধ্যশ্রেণীর নানা শ্রেণীব ব্যবসায়ী, এমন কি রাজক, নবস্তন্দর পর্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে বোংগদাদ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমনের কাবণ ও অবস্থিতি বিষয়ে পর পর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্তসহ মীর-সাহেবের সাঁওতা-বাস পর্যন্ত বিবরণ 'আমার জীবনী' নামক গ্রন্থে লিখিত হইবে।

এক্ষণে মীবসাহেবেব উপস্থিতি কার্যবিবরণই লেখকের লেখনীর আবশ্যকীয় উপকরণ।

মীবসাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিক্ষাণিত, ললাট বিশাল, মষ্টভাষী, সরলপ্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী। পবিবাব-মধ্যে মাতৃহীন এক পুত্র, পিতৃহীনা এক ভ্রাতৃপুত্রী, দুই ভগ্নী এবং দাসদাসী ইত্যাদি। পুত্রের নাম আসগর আলী, বয়স আট বৎসর। মীবসাহেবেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা (শুকবননেনসাব পিতা) জীবিতকালে তিনিই সংসাবেব কর্তা ছিলেন, এক্ষণে মীবসাহেবকে সেই সংসারেব ভালমন্দ যাবতীয় ভাষ বহন কবিত্তে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর শুকবননেনসাব বিবাহ দেওয়া ই মীবসাহেবেব কতব্য কার্য মধ্যে অগ্রে প্রধান কার্য বলিয়া পবিগণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিবাহ সারাস্ত কবিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহাব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই নাবাজ। বিবাহের পূর্বে মীবসাহেবেব অতি-নিকট সম্বন্ধীয় ভ্রাতা মীর আলী আসগর খান বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, ভাই, গট্টীব হজবত (প্রভু)-দিগেব সহিত কোন নূতন সম্বন্ধ করিও না। তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজেব ভয় নাই, লোকনিন্দাব দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহাপাপকেও অতি তুচ্ছ মনে কবে। আমি বাব বার নিষেধ কবিত্তেছি, সা গোলামেব সহিত শুকবনেব বিবাহ দিও না—কখনই দিও না—পবিণামে মনস্তাপ পাইবে, সর্বস্ব হাবাইবে—পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে। সাবধান! কখনই তাহাদের কথায় ভুলিও না। তুমি জান না যে, তাহারা আপন সহোদবে সহোদবে কিনা করিতেছে! সমাজ হাসাইতেছে। করিদপুব অঞ্চল ডুবাইতেছে। এ সকল কথা স্মরণ রাখিও। কখনই সেই মূর্খ, নিরক্ষর সা গোলামেব সহিত পিতৃহীনা কন্যাব বিবাহ দিও না।

বিধির নির্বন্ধ থগাইতে কাহাব সাধ্য! শতসহস্র প্রতিবন্ধক সম্বন্ধেও শুকবননেনসাব বিবাহ সা গোলামেব সহিত হইয়াছিল। বিবাহেব পর জামায়েব হস্তে জমিদারি কার্যভার দিয়া মীবসাহেব আমাদের সঙ্গ কিছু বেশী করিয়াছিলেন। সময় সময় জামাতাকে বলিতেন, দেখ বাপু! আমার কেহই নাই, কেবলমাত্র একটি পুত্র, তাহারও জীবনে সংশয়, সর্বদাই পীড়িত। তোমবাই আমার বল, তোমবাই আমার সকল। আপন কার্য-কর্ম দেখিয়া গুনিয়া কবিবে। সংসারেব ঝগ্গাট আর আমার ভাল বোধ হয় না, স্ত্রীপুত্র-বিয়োগে আমার মন সর্বদাই

অস্থির থাকে। অনেক কার্যো ও ভ্রম জন্মে। এক্ষণ বিষয়াদি রক্ষা করা না করা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দু সন্ধ্যা দুমুট খেতে পেনেই আমি স্থখী হইব।

সাঁ গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কৌকড়া চুল, চক্ষু দুটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, ক্র কুণ্ঠিত। শীঘ্র শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না শুনিলে সে কথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টাচার কবিতা বিশেষ ঐক্যেব সহিত সংসাবেব কাজকর্ম চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন জমিদারি উন্নতি, সংসাবেব উন্নতি, অবস্থার উন্নতি, বাড়িঘরের উন্নতি, চারিদিকে উন্নতি। উন্নতিব স্রোতলহরী, প্রবাহতবঙ্গ ক্রমে ক্রমে বহিতে লাগিল—ক্রমে ছুটিতে লাগিল।

মীরসাহেব অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া এসিয়া আছেন, শালঘর মধুয়ার কুঠিৰ রামদয়াল সিং সেলাম বাজাইয়া একখানি পত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মীরসাহেব বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না। মনে মনে পত্র পড়িয়া রামদয়ালকে বলিলেন, সাহেবকে আমাব সেলাম বল। সন্ধ্যাব পূর্বেই পত্রের উত্তর যাইবে। রামদয়াল পুনৰায় সেলাম বাজাইয়া নাগবা জুতাজোড়া যাহা দালানের সিঁড়িৰ নীচে রাখিয়া আসিয়াছিল, পায দিয়া লাঠি ঘাড়ে কবিতা চলিয়া গেল।

মীরসাহেব বলিতে লাগিলেন, স্তন্দরপুৰেব সহিত কাজিয়া কবা বড সহজ কথা নহে। সাহেব আজ পর্য্যন্ত প্যাবীস্তন্দবীকে চিনিতে পাবেন নাই। তা—যা হ'ক, দেবীপ্রসাদ কাছারিতে আসিয়াছেন কিনা? মাংগন খানসামা দৌড়িয়া কাছাবিঘর হইতে প্রধান কার্য্যকাবক দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিল। কেনীব পত্র চোবে ঠাকুরের হস্তে দিয়া মীরসাহেব বলিলেন, ইহার যাহা বিহিত হয় কব। আর সেইসঙ্গে ইহার উত্তর লিখিয়া দেও।

দেবীপ্রসাদ পত্র পাঠ কবিতা একটু চিন্তার পর বলিলেন, সাহেব যখন চাহিয়াছেন, দেওয়াই উচিত, কিন্তু এত লাঠিয়াল একদিনে তো জুটিবে না। মীরসাহেব বলিলেন, না জুটিলে উপায় কি! যত পাব। যখন সাহায্য চাহিয়াছেন, তখন দিতেই হইবে। দেবীপ্রসাদ বলিলেন, নিজের হাত-পা যাহারা, তাহাদের এ কাজে দিতে পারি না, স্তন্দরপুৰের ঘর কম নহে। পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সাহেব এত দিন দুর্বলকেই নির্যাতন করিয়াছেন, সবলের গায়

তো হাত দেন নাই—এই প্রথম। যাক সে কথায় আমাদের কাজ নাই। এতদিন পরে মহিষ আব বাঘিনীতে বাবিল। ভালই হইল। হয় কেনীব সৰ্বস্বান্ত, নয় প্যারীসুন্দরীব সৰ্বনাশ। এই বলিয়া মীরসাহেব উঠিয়া গেলেন। দেবীপ্রসাদও পত্রহস্তে পূৰ্ব্বনির্দিষ্ট কাছাবিষয়ে আসিয়া বাব দিলেন। চিঠিপত্র, লোক যেখানে যেখানে পাঠান আবশ্যক, পাঠাইয়া স্নান আহাব কবিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় তবঙ্গ

প্যারীসুন্দরী

সুন্দরপুরেব জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্য্যকাবক বামলোচন। সে সময়েব চলতি বাঙ্গলা ভাষায় বামলোচন খুব পাকা। জমিদারি ফন্দি-ফেবেবেও দেশবিখ্যাত। সকলেই জানে যে বামলোচন একজন বিখ্যাত মামলাবাজ।

কেনীর অত্যাচাবে ছোট ছোট তালুকদার, জোতদার, নানাশ্রেণীর ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈতৃক গ্রাম, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া নানা স্থানে নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে—জাতি, ধন, মান, প্রাণ কৌশলে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্য্যন্ত সুন্দরপুবেব কোন প্রজাব গায়ে হাত দেন নাই, কোনরূপ অত্যাচার কবেন নাই, ইহাতেই বামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারি চালাইতেছেন। প্যারী-সুন্দরীও ঈশ্ববে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাদিতে কাদিতে সুন্দরপুৰ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল-ভবসা, আশ্রয়দাত্রী ও বক্ষাকত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল, “মা! রক্ষা কব। এতদিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। ছুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামীকলা আমাদের বুনারী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীলবুনানী কবিবে—বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদের রক্ষা কর। ছুরন্ত জালেমেব হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সংবৎসর আশা কবিয়া চাষ করিয়াছি, পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনাব বাজস্ব আদায় করিব আশাতেই সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধানখেতের দিকে চাইয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই বোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল-

বুনানী করে, তবে আমবা একেবাবে মাবা পডিব—ছেলেমেয়েসমেত মাবা পডিব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে আমাদের মুখেব প্রতি একেবাব নজর করে এমন লোক জগতে আব কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। মা! তোমাব এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে বক্ষা কব। ছুবন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।”

প্যাবীস্তন্দবী প্রজাদিগেব কাতব উক্তি শ্রবণ কবিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি বামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমাব প্রজাব প্রতি অত্যাচার যাহা শুনিতে বাকি ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল। আমি থাকিতে আমাব প্রজাব প্রতি নীলকব ইংরেজ দৌবাত্মা কবিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাব প্রজাব বুনানী বান ভাঙ্গিয়া কেনী নীল বুনিবে, ইহা আমাব প্রাণে কখনই সস্ত হইবে না। প্রজাদিগেব ছুবন্তা আমি এই নাবী-চক্ষে কখনই দেখিতে পাবিব না। যে উপায়ে হটক, প্রজা বক্ষা কবিতাই হইবে। লোক-জন, টাকা, মন্দাব, লাঙ্গিমালা যাহাতে হয়, তাহাব দ্বাবা প্রজাব ধন, মান, প্রাণ জালেমেব হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। ধান ভাঙ্গিয়া যাহাতে নীলবুনানী কবিতৈ না পাবে তাহাব বিশেষ উপায় কবিতৈ হইবে। আপন প্রজাকেই যদি ছুবন্ত নব-বাস্ত্র হইতে বক্ষা কবিতৈ না পাবিলাম—শ্লেচ্ছ পাপাত্মাব কঠিন হস্ত হইতে বক্ষা কবিতৈ না পাবিলাম—তবে এ দিনম-বিভব, টাকা এবং জমিদারিতে প্রয়োজন কি? এখনি এ-সকল প্রজাব সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবেব পক্ষীয় লোকেবা এইসকল প্রজাব ধান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী কবিতৈ আইসে, দ্বিতীয় আদেশেব অপেক্ষা নাই—যেপ্রকাবে হয় তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া প্রজা বক্ষা কবিবে। ধান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী করিলে কি আব প্রজা বাঁচিলে? কি লজ্জাব কথা! কি ঘৃণাব কথা! কোথায় বেলাত, আব কোথায় এদেশ। একটিমাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল। একেবাবে ছাবথার করিয়া ফেলিল! কৃষি-প্রজাব জমিজমা কাড়িয়া লইয়া নীলবুনানী কবিল। কত তালুকদাবেব তালুক, কত জোতদাবেব জোত জবরাণে লিখিয়া লইল। কাহাবও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইয়া একেবাবে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। হায় হায়! কি দুঃখ! যাহারা চিরকাল দুধে-ভাতে, স্নাত-স্বচ্ছন্দে, আপন আপন পবিবার লইয়া সংসার-ধর্ম নির্বাহ করিয়াছে, কত অতিথি-সেবায়, দেবতা-পূজায়, দীনদুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকেব উপকার

করিয়াছে, কত অনাহারীর আহাৰ দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই একটি পয়সার জন্তে লালায়িত ! তাহাদের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই। হায় ! হায় ! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী, পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে ডুবিয়া যায় ? সে জীর্ণশীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যথা লাগে ? সে দুঃখ কি আর মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে ? ঐ কেনীর দৌরাগ্ন্য সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্রসন্তান, কত নিরীহ লোক পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় কোন দেশে চলিয়া গিয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে। যাহারা পৈতৃক ভিটার মায়া-মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথাসর্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই। নীল কাটা, হউজ মাই, নৌকাব গুণ টানান এইসকল কাণ্ডে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর আবার সময় সময় হাত-পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পিঠের ছাল তুলিতেছে ! উহ ! কি ভয়ানক নরব্যাস্ত্র ! কি করিব, আমি দেশের রাজা নহি, সকলে আমার অধীন প্রজা নহে, এদেশের সকল জমিদারি প্যারীসুন্দরীর নহে। কি করিব, এদেশের আর কাহারও কিছু রাখিবে না। ও বেনাতী কুকুর এদেশের সকলকেই দংশন করিবে ! সে বিধে সকলেই জর্জরীভূত হইবে। প্রথমেই ঐ শ্লেচ্ছের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে শেষে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে। আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। শেষে কি সুন্দরপুরের ঘরের মান ডুবিবে ! হায় ! হায় ! শেষে কি কেনীর হস্তে সুন্দরপুরের ঘর মাটি হইবে ?

রামলোচন বলিলেন—“কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে। যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দুরন্ত করিব। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয়-সম্পত্তি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে। আপনার আশীর্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয় তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে আর কখনও সুন্দরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনেন—মনে না করেন। আর বাঙ্গালী হইলেই যে শেয়াল-কুকুর হয় তাহাও না ভাবেন।” এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্তব্য কার্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া প্রজাগণের

সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই স্বন্দরপুর হইতে ঘটনাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভারলেব (গ্রাম) কাছারি পহুঁছবে এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানের জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না। যেখানে যাহাকে পাও মারিবে। ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই।

একে একে সকলেই বামলোচনেব আশীর্বাদ লইয়া স্বন্দরপুর হইতে বিদায় হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ

বান্ধালী যুদ্ধ

বান্ধালী যুদ্ধে ডাক ভাঙ্গা একপ্রকার উৎসাহযুচক বাজনা এবং দূতের কার্য্য করে। ডাকের উত্তর-প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটনা থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তর-প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয় না। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই প্যারীসুন্দরী বর্দার গণ নির্দিষ্ট স্থানে 'মার মা' শব্দে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে ভগ্নহৃদয়ে হতাশ হইয়া—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালগণ বিরোধীয় ভূমিতে পূর্বেই আসিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরেই বুঝ-সমুজ হইয়া গেল। উভয় পক্ষ জানিল যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যারীসুন্দরী লাঠিয়ালেরা স্থির করিল যে, রাত্রে লাঠালাঠি, মারামারি করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে, কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে কবসা করিয়া দিব।

মাঃাময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ-বাধাইয়া দিবার জগুই বোধহয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখাশুনা হইল। ছেড়ছাড় মিষ্টি গালি-গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেবা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল-

বুনানি করিবেন, সে জমি পিছে ফেলিয়া নির্দিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানি ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠিয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালেরা পূর্বেই ধানখেত পাছে করিয়া আপন আপন আয়ত্ব ও স্তবিধা মত আনি (বুহ) বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ু বহিয়া পূর্বদিক পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইয়া মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলেব কথা চলিল। ক্রমে গালাগালি, শেষে লাঠালাঠির উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল-গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। প্যারীসুন্দরীর কার্যকারক, যিনি হুকুম দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সর্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “তাইসকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর ওদিকে দফাবফা। ঐ দেখ, ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিতেছে। আমবা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। সর্বনাশ হইল! সুন্দরপুর গিয়া কি জবাব দিব?”

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিকট চীৎকাব করিয়া কেনীর লাঠিয়ালের প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষদলও বিশেষ শিক্ষিত—কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না—একপাও নড়িল না। লাঠি-উডসড়কি অবিরত চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠিয়ালেবা কেবল আত্মরক্ষা করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি) আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না, ইহাই তাহাদের স্থির-সংকল্প।

এদিকে সূর্য্যদেবের আগমন সহিত টি. আই. কেনী বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিতবেগে আপন লাঠিয়ালদিগের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গভীরস্বরে বলিলেন, “আর দেখ কি, লাগাও!”

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচশত লাঠিয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারে, মাঝে মাঝে ঝ-ঝ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহবাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী লাঠিয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ,

সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে আরো উচ্চ টুপি। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল-গণমধ্যে সড়কিওয়ালার সর্দার অনেক ছিল। একজন সড়কিওয়ালার সর্দার টি. আই. কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপি সড়কির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-তিনজন প্রধান প্রধান লাঠিয়ালের পৃষ্ঠে চাবুক সহ করিয়া কারয়া বলিতে লাগিলেন, “ড্যাম শুয়াব, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান, পায়তারা করিতে জান, লাঠি ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও, তাড়াও, মার শুয়ার লোককে—”

লাঠিয়ালেরা হুকুমের জোরে চাবুকের জালায় বিপক্ষ দল প্রতি সজোরে লাঠি-সড়কি মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশই অগ্রসব—প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা আঘাতিত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলাইতেছে না। ক্রমে পিছে হঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে কবিত্তে যাইতেছে। দুই-তিনটি লোক পিছে হঠিয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচ্চনিচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠিয়াল সড়কিদ্বারা আঘাত করিয়া বিক্ষিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মানুষের রক্তের ধারা ছুটিল। কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। বক্তমাথা সড়কির দিকে দৃষ্টি কবিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ চাল, সড়কি, লাঠি ফেলিয়া উর্দ্ধস্থানে পলাইতে আবস্ত করিল। যে যেদিক স্থবিধা বুঝিল, সে সেইদিকেই যথাসাধ্য দৌড়িল। হুকুম দেহেন্দা মহাশয় কোন সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

টি. আই. কেনীর উৎসাহে তাহার লাঠিয়ালগণ অর্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষ-গণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া ঝাড়ে-জঙ্গলে এবং সম্মুখে গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি. আই. কেনী সদর্পে বলিতে লাগিলেন—“আর আগে বাড়িও না। এক্ষণে প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ি-ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিসপত্র লুটিয়া লও।”

আদেশমাত্র লুঠ আরম্ভ হইল। থালা, ঘটি, বাটি এবং রুখক-স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দারগণ টানিয়া ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষাণেরা স্ত্রীলোকদিগের পরনের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ মাজায়, কেহ মাথায়

বান্ধিয়া বাহাজুরি দেখাইতে লাগিল। গরুসকল তাড়াইয়া কুঠির দিকে লইয়া চলিল। ঘরের অগ্ন্যাগ্নি জিনিসপত্র যাহাই সুবিধা পাইল লইল, অবশিষ্ট ভান্ধিয়া চুরমার করিয়া শেষে ভান্ধাঘরে, ভালঘরে আগুন লাগাইয়া টি.আই. কেনী লাঠিয়ালগণসহ কুঠির দিকে ফিরিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্বপ্রকারে সর্বনাশ!—বিনাশ—একেবারে রসাতল। মাথা ভান্ধিয়া কান্না।—স্ট্রীলোকেরা ঝাড়ে-জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে, জাতের ভয়ে লুকাইয়া বাড়িপোড়া আগুন—জলপোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যুযাতনা ভোগ কবিত্তে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠিতে আসিয়াই লাঠিয়ালগণকে বকশিশ দিয়া খুশি কবিলেন। লুটেব মাল কাঁসা, পিতল, বস্তাদি লাঠিয়ালগণের বাড়িতে গেল। সোনাক্রপা সাহেবেব আলমারিতে উঠিল। গরুসকলের গায়ে তখনি T. I. K. মার্ক বসাইয়া কুঠিব গরুর সামিল হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিলেন। হায়! হায়! ভিন্ন আব উপায় কি!

টি. আই. কেনী পত্রদ্বারা মীবসাহেবকে এ শুভ সংবাদ জানাইলেন। মীর-সাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুর্বস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি কবিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজেব সম্পত্তি, মান, সম্মান রক্ষা কবাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। জানিত পক্ষে কেনীর অপকাব করিবেন না, এইটিই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। বোধহয় কেনীব পত্রেব উত্তর, সন্তোষ এবং হরিষের কথা পুরিয়া দিয়াছিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুর্বস্থাব কথা শুনিতে কাহারও বাকি থাকিল না। অগ্ন্যাগ্নি জমিদার, তালুকদার, মধ্যশ্রেণীব জোতদার, প্রজা. সকলেই ভয়ে ভীত, ব্যস্ত—অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী জোতদার, তালুকদারদিগকে পত্রদ্বারা, কাহাকে লাঠিয়ালদ্বারা আনিয়া তাহাদের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি আপন সুবিধা মত কবালা, পণ্ডনী এবং মিরাস স্বত্ত্ব দলিল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। চির-দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু ওজর-আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদৌলার অঙ্কুপসম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের একশেষ। বাধ্য হইয়া

সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেনীর মনোমত দলিল লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অমানুষিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্তাকর্তার মালিক। যা করে—কেনী। শালঘর মধুয়ার কুঠির দিন দিন উন্নতি। নীলের উন্নতি, রেশমের উন্নতি, চতুর্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়! ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দোরাওয়া আগুনে দেশের লোক জলিয়া পুড়িয়া থাক হইতে লাগিল। কুঠির নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠির সীমা-মধ্যে পা ধরিতে অনেকেরই প্রাণ কাঁপিয়া—অঙ্গ শিহবিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়। কুঠির সম্মুখে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার পশ্চিমপার দিয়া লোকজনের গতিবিধি ভিন্ন, কুঠির পাব—পূর্ব পার দিয়া কেহই যাইতে সাহসী হয় না। নিকটবর্তী জমিদার, তালুকদার, সকলেই কুঠির চটকা (বৃক্ষ বিশেষ) তলায় পড়িয়া আপন আপন পীব-পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন। কার ভালে কি হয় কে জানে! বিনা তলবে আপিস ঘবে কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। কার সাধ্য সে আজ্ঞা লঙ্ঘন কবে? বা বিপর্যয় ঘটায়? ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারামারি, স্বাস্থ্যের বিচার, খত পত্র তমঃস্কক ইত্যাদি যাবতীয় নালিশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।—পরে শুনিয়াছি যে, কেনীব অনারারি মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।

কুষ্টিয়ায় মহকুমা হয় নাই। জেলাও পদ্মার পার। জমিদার কেনী—বিচারকর্তা কেনী—মহারাজও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি। যারা আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু আছেন ভাল। বিশ্বাস ছিল যে, বিচার না করিয়া আব গুদামে পুরিবে না।

এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দিখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা নয়, এ বন্দিখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব—অন্ত কারবার—বড় ভয়ানক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিশ-কাঁথা-কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান।—ধান বাছ, চাল বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।

পঞ্চম তরঙ্গ

আবার

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া বলিলেন, পত্র পড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নীববে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, এবারেও যদি গতবারের মত হয়, তবে আর—কাজ নাই,—অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।—

রামলোচন বলিলেন, “চেষ্টাশ ক্রটি নাই। জয়পবাজয় ভগবানের হাত—দেখি। এবারেও দেখি !”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “দেখিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু খুব সাবধান—খুব সতর্ক, এবারে খুব সতর্কভাবে কার্য্য করিব। ঐ ম্লেচ্ছ ইংবেজ বেটা (কেনী) কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদেরকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজাব দুর্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটনা যাইতেছে। হায়। হায়।’ একটি শ্বেতবাস্কসে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।—ম্লেচ্ছ বেটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, প্যারীসুন্দরীকে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে হাজার টাকা পুস্কার পাইবে। আমি ভাল কবিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়েব মলা দ্ব করিয়া যাতে বাঙ্গালীর গন্ধ শরীর হইতে একেবারে সরে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিব্বি মেম সাজাইয়া কুঠিতে বাখিব। কি ঘৃণা ! কর্ণ ! তুমি বধিব হও, বধিব হও।”

রামলোচন বলিলেন, “হুজুর ! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পব মুখে পরের কথা কিছু বেশি পরিমাণেই কানে আসে। ও সকল কথায় কান দিবেন না। শত্রুর মুখ—আব পাগলেব জিহ্বা, এ দুই-ই সমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—বাজে কথা বলাব জন্ত বাজে মুখ আছে। শুনিবার জন্তও বিস্তর কান রহিয়াছে। আমবা কাজের কথা শুনিব। এবং যাহা মনে আছে করিব। ও সকল হাওয়াই কথায় কখনই কান দিব না।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “বাজে কথায় কান না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজাব টাকার তোড়া তাহাঁব জগ্গে ধরা রহিল,—ইহাব পব—মনেব মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব। আজীবন তাহার চাকুরি বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পবেও তাব বংশাবলী সুন্দবপুবের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।”

রামলোচন বলিলেন, “এ উতনার কার্য্য নহে। সকল দিক বক্ষা কবিয়া, মান, সম্মান, এবং প্রাণ বাঁচাইয়া এইসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবশে সাংঘাতিক কোন কার্য্য কবিত্তে অগ্রসর হওয়া মাছুষেব কার্য্য নহে। আগে আত্মরক্ষা, শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অত্থায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটিবাবই বেশী সম্ভাবনা। এই তো সেদিন তাড়াতাড়ি করিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। পূর্ব্ব হইতে আয়োজন কবিয়া আগাগোড়া আঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবেব লোকেবা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ক্রটিতেই সরকারী চাকব ১০।১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু আশঙ্কা অনেক।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজার প্রতি দৌবাত্ম্য ইহা আমাব প্রাণে কখনই সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর কল কি? এবারে কত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছ? এবাব তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠি পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারি বাড়িতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই তোমরা যে কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মাছুষ, তোমরাও মাছুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাই। কোন হাড় কি শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা তাহাদের বেশি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর কুঠিয়ালদের ঞায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধি-মানও নও। কেনীর ঞায় মিথ্যাবাদীও নও, নির্দয়, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও। আমি শুনিয়াছিলাম যে টি. আই. কেনী বিলাতের ভদ্র-বংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেসকল কথারই কথা। এখন দেখিতেছি

কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ। ঐ কুঠিই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীরসাহেব কি কবিতাছিলেন মনে আছে? আজ যে মীরসাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে কীৰ্ত্তি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে-কথা ঝাঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে দেখিলে তোমরা দশহাত সরিয়া পড়, দুইহাত সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতাব ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর। সত্য কথা বলিব তাহাতে আব দোষ কি? নিন্দাবই-বা কথা কি? সাহেব দেখিলে সকলেরই যেন গা কাঁপিয়া ওঠে। সে গিড়িমিড়ি কথা কানে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও প্রাণ উড়িয়া যায়। সেই নীলকরকে ধবিয়া তিনি যেক্রপ শাস্তি কবিতাছিলেন, তাহা এদেশেব সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘর মধ্যায় কুঠিব একজন কুঠিমালা সাহেবকে ধবিয়া, দিনে দুপুবে তাহার একটি কান কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজাব প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহাব বাগ—সাহেবেরও শাস্তি। আমি কি বলিব। আর কি কবিব। সমুদায় কার্য্য পরেব হুস্তে। শুধু মুখেব কথায় কি হয়? যা হউক, আমি আবাব বলিতেছি কেনীব মেমকে তোমাব নিকট চাই।”

রামলোচন বলিলেন. “ভজুব। আমাব নিজেব কার্য্য নহে। যাহা করিব সকলই পরেব হুস্তে, আমি যোগাড়ের ক্রটি করি নাই. কখনও কবিব না। টাকা খবচ করিতেও আপনাব লুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না—দেখি, এবাবে ঈশ্বব কি করেন।” এঠি বলিয়া রামলোচন প্যাবীন্দ্রবীব নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

মিসেস কেনী

যে সময়ের কথা, সে সময় কুঠিয়ার মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারির কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রে সংবাদ রাত্রেই যাওয়া—অনেকেই তাঁহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীৰ গুপ্তচর সন্ধান করিয়া সুন্দরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠির লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। •অনেকেই জানে, সাহেব কুঠিতেই আছেন। কেনী কুঠি হইতে বাহির হইলেন, মেমসাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক বাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর স্ববে স্বর মিলাইয়া গান করিলেন। ক্লাস্তবোধেই হউক, কি নিশির স্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহিস্বর বন্ধ হইল। পিয়ানোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তাব লহরীই খেলিতে থাকুক, তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল যেন তিনি কি ভাবিতেন। তাঁহার পূর্ব অবস্থাব কথা—ইংলণ্ডেব কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা? ভাবিতেছিলেন কেনীকে বিবাহ করিয়া ভালই কবিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহাব, বিহাব, আমোদ, বাজ-প্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার স্তন্য ললাটে জুটিত না। হয় জুতা সেলায়ের সুতাব যোগাড়, না-হয় কাপড় ইস্ত্রিবিব সবজ্যাম দুবস্ত, নয় দোকান ঘবে বিকিকিনি, কি অন্য কোনকপ ব্যবসা অবলম্বন কবিয়া শবীব খাটাইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা পর্য্যন্ত (বোধহয় তাহার মতে) উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়নকুঠরিতে গিয়া বাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড় পবিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধহয় ভাগ্যফল আলোচনা কবিতে করিতে ঘুমে মাতিয়া পড়িলেন।

পাখিদের প্রভাতী গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। নিশি-শেষে আজ নূতন প্রকাবের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ কবিল। হো! হো! মার! মার! লাঠির ঠাকঠক, লোকেব গররা—এই নূতন প্রকাব শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতবায়ু জানালার খডখড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেশমী বসন-সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখাব ঝালব মুহু মুহু নড়িতেছে। মিসেস কেনী এইসকল ভাব, আধ-নিম্নলিত আঁখিতে, আধ আধ ভাবে দেখিয়া প্রাভাতিক সমীরের স্বাভাবিক মোহমস্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশিষ্কণ রহিল না। ভীষণ রবে, লাঠিয়ালগণের হুঙ্কার এবং মার মার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ দূর দূর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একি কাণ্ড? কি

ব্যাপার? মহা গোলযোগ। পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাডাতাড়ি গবাক্ষ-
দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাব শয়নঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং কুঠির চারি-
দিকে বহুতর লাঠিয়াল। কুঠির হাতায়, এবং প্রবেশদ্বাবে, ঢাল-সডকি-
বল্লমধারী সাবি সাবি লাঠিয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপবিচিত।
কুঠির কাঠাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন প্রবেশদ্বার
হইতে কুঠির লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহাবা আঙ্গিনায় আসিতে
যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই লাঠি আঘাতে আঘাতিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও
আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পাবিতেছে না। মহা বিপদ! একি! এবা কারা? কি
জন্ত আসিয়াছে—কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। তাডাতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া
সিঁড়ির দ্বাৰ বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, “সাহেব
কুঠিতে নাই।”

লাঠিয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, “আমরা সাহেবকে চাই না।
তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর ইকুম, তোমাকে সুন্দরপুর যাইতে হইবে। কথায়
না যাও—লইয়া যাইব।”

মিসেস কেনী বলিলেন, “বাপুসকল! তোমরা আমাকে লইয়া কি
করিবে? আমি তোমাদের কিছুই কবি নাই, আমাকে বাঁচাও!”

সাদামুখের কথা শুনিতে কাহাব ভাগ্য! আজ মিসেস কেনী বিপদে
পড়িয়া লাঠিয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা
শুনিতে পায়? যাহাউক, মিসেস কেনী তিন-চারটি কথা কহিয়াই কার্য-
উদ্ধাব করিলেন। জ্বীলোকের জয় না আছে কোথায়? তাহাতে আবার বিলাতী
মুখ! যার তুলনা ভারতে নাই। লাঠিয়ালগণের এত উৎসাহ এত জোরের কথা
—মিসেস কেনীর ঐ একটি কথায় কোথায় যে সরিয়া গেল তাহার সম্মান হইল না।
—যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল। যে কানে শুনিল সে কান
পাতিয়াই রহিল। মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া একতোড়া টাকা উপর
হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্ণের কান্দাল বাঙ্গালী। টাকার মুখ
দেখিয়াই গলিয়া পড়িল। যে কার্য্যে আসিয়াছিল, তাহা মন হইতে একেবারে
সরিয়া গেল। সডকি, ঢাল, লাঠি, তরবার মাটিতে ফেলিয়া তাডাতাড়ি টাকা

কুড়াইতে লাগিল। যে যত পাবিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল। টাকার লোভে শেষে আপসে আপসে সংগ্রাম বাধিল। মিসেস কেনীর নিষ্কিন্তু টাকা সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা দুর্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য কবিল, কেহ-বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস কেনী এই স্ত্রযোগ দেখিয়া আব একতোড়া ঐ কুকুরকাণ্ড-মধ্যে ছুড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপসে আপসে প্রকাণ্ডভাবে মারামারি বাধিয়া গেল। কোথায় সড়কি, কোথায় লাঠি, কোথায় কি পড়িয়া রহিল সে-দিকে কাহাবও লক্ষ্য থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়াকাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপসে আপসে মারামারি, টানাটানি, হেঁচড়াহেঁচড়ি আবস্ত করিয়া কেনীর লাঠি-য়ালগণের অনেক স্ত্রবিধা কবিয়া দিল। বিপক্ষ দলেব লাঠি-সড়কি হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমকহাবামদিগকে ধবিবাব আশয়ে কুঠির লাঠিয়ালেবা 'মার মান' শব্দে আসিয়া পড়িল। টাকার এমনি লোভ—টাকা এমনি জিনিস যে তখনও সেদিকে কাহাবও দৃষ্টি নাই। রূপার চাকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। আত্মহারা, জ্ঞান-হারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহাভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠির লাঠিয়ালগণেব লাঠি পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়িয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট। দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহাবা প্যারীসুন্দরীবা নির্দিষ্ট বেতনভোগী তাহাবাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারলেব কাছাবিতে ফিবিয়া গেল। বিদেশী সর্দাবেবা আপন আপন স্ত্রবিধামত আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইল। ভকম দেহেন্দা দলপতি মহোদয়েব সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না।

মিসেস কেনী নীচে নামিয়া বাক্স, আলমারি যাহা পূর্বে হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজেব চাকবদাবা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পাপোস, চেয়াব ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন কবিয়া কতক ঘরের বাহিবে, কতক সিঁড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থানভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটেব নিকট পত্র লিখিয়া রামরূপ সিংহকে আশ্বারোহণে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। শত্ৰু সাত্তালকে ডাকিয়া কুঠিতে চড়াও, মালামাল লুট, বাক্স, আলমারি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরণ—দিনে ডাকাইতি, এইসকল বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মীরসাহেবেব নিকটেও পত্র পাঠাইলেন।

হরনাথ মিশ্র প্রধান কার্যকাবক বাসাবাড়িতে থাকিয়াই কুঠির সমুদয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আর গোলযোগ নাই দেখিয়া মেমসাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “হুজুর! আর একটি কার্য্য করিতে হইবে, গোপনে বলিব।”

মিসেস কেনী বলিলেন, “তুমি যাহা ভাল জ্ঞান কর, আমার নিকট আর জিজ্ঞাসা করিও না।”

হরনাথ তখনি আপিস ঘরে যাইয়া কি মন্ত্রণা করিলেন তিনিই জানেন। এক ঘণ্টার পব একপ্রকার হৃদয়বিদারক শব্দ শুনা গেল। বাবা গো—মলেম গো—আমি কিছুই জানি না—হা খোদা—

সপ্তম তরঙ্গ

ঘরজামাই

এক গাছের বাকল অণু গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাটি উতরে না। আর একটি কথা, শত বৎসরও যদি কোন গাছের উপর ভিন্ন গাছ জীবিত থাকিয়া ভালপালা ছাড়ে, তত্রাচ তাহার নাম পরগাছা। জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা এবং ব্যবহারে বাকল। হাজার ঘস মাজ, মিশিবার নহে। মিশিবে না। স্থূল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি-জামাই। খুড়-ভাইপোয়ে প্রায়ই কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি। পরিশেষে—শ্রদ্ধা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। পবিণামে উভয়ে প্রায় এক ক্ষুরে মাথা মূড়িয়া পরের অগ্নে উদরপূরণ, কেহ অণু কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা ভিন্ন আর কোনই ভাল ফল দেখা যায় না। এক রক্ত, এক গোত্র, এক বংশ, তাতেই এই দশা—পরগোত্র, পরপুত্র জামাই, তাহার সঙ্গে এক কায়া, এক প্রাণ, দুইয়ে এক হওয়া বড়ই কঠিন কথা। যাহাদের শরীর এক রক্তে গঠিত, তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থাকা স্বত্বেও রক্তের গুণ না থাকিয়া যায় না। পাষণ হইলেও সময়ে নরম হয়, কালে স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় এবং প্রেমভাব—সে কলুষিত পাপময় অন্তরেও দেখা যায়, জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সূতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বসে থাকিবার নয়। থাকিবে কেন, সে শব্দরকে পিতৃতুল্য মানিবে কেন? সে খুড়-শব্দরকে শব্দরের স্থানে বরণ করিবে কেন? তার কার্য্য-উদ্ধারই ভক্তি, তার স্বার্থসাধনই শ্রদ্ধা,

অভিষ্টসাধন করাই প্রেম। তার সকলই কৃত্রিম। মীরসাহেব আপন বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপন মন্দ আপনি ঘটাইয়াছেন। আপন পায় আপনই কুঠারাত করিয়াছেন। রে সংসার! রে লোভ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। রে অর্থ! বে জমিদারি! তোবা না ঘটাতে পাবিস এ জগতে এমন কোন কু-কার্য্যই নাই। মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ধর্ম, সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি। মীরসাহেবের দেবীপ্রসাদ প্রধান কার্য্যকারক। সা গোলামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কালের ধর্ম! সময় সময় তাঁহাদের উভয়ে অনেক কথা, অনেক আলাপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন আবশ্যক মতে নিকটস্থ আমবাগানে, কি বকুলতলায় বসিয়া গোপনে কথাবার্তা হয়। প্রথম সূত্রপাত, পবে অনেক কথা, দিন দিন বহু কথা, বহু যোগাড়, গোপনে গোপনে বহু মজ্জনা, বহু কার্য্য সাধন হইতেছে ও হইয়াছে। এখনও অনেক বাকি, সীমা পর্য্যন্ত যাইতে বহু বিলম্ব। তাই কথা ফোটে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। মীরসাহেবেরও কানে ওঠে নাই।

রাত্র দুই প্রহর। দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানাতেই আজ বৈঠক। দেবীপ্রসাদ ছোট একখানি জলচৌকির উপর। সা গোলাম বড়গোছের একটি মোড়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন। ঘরের এক কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। সে সময় কেবোসিন তেলের চলতি হয় নাই। দিশি তৈল, দিশি প্রদীপ, দীপগাছাও মাটির।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এব্রাহিম হোসেনের ‘অছিয়তনামায়’ যাহা যাহা লিখা আছে তাহা তো অগ্ৰথা কবিতে পারিবেন না। আমার বেশ মনে আছে, দুই ভ্রাতারই জমিদারিতে সমান অংশ। সাঁওতাল বসতবাটিতেও তুল্যাংশ। কনিষ্ঠপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কারণ অতিশৈশবকালেই মীরসাহেব মাতৃহারা হন বলিয়া পদমদীর বাড়ি তাঁহাকে বেশির ভাগ দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ি এ বাড়ির ছায় পাকা নহে। সামান্য একখানি ঘর, আর চতুর্দিকে প্রাচীর। বেশীভাগ পুষ্করিণী ও একটি আমবাগান মাত্র। মীর এব্রাহিম হোসেন আপনার শ্রুতবকে রাজী করিয়া, কল্যাণকে বলিয়া পদমদীর বাড়ি-বিষয় মীর সাহেবকে অতিরিক্তরূপে দিয়া গিয়াছেন। একথা সকলেই জানে, অছিয়তনামাতেও স্পষ্টভাবে লিখা রহিয়াছে।

সা গোলাম বলিলেন : একথা অসম্ভব—অসম্ভব ! বাড়ি যেমনই হউক পৃথক হওয়ার কারণ কি ? নির্দিষ্ট করিয়া যখন লিখা, তখন কি আর কথা আছে ! না, উহাতে কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে ? ঘব থাক, পুষ্করিণী থাক, প্রাচীর থাক, বাগান থাক, হাজাব থাক সে বাড়িব সকলি তাঁহাব । আর এই সাঁওতার বাড়িতে যাই থাক, সকলি আমাব ঋণ্ডবেব । দালানকোঠা আছে বলিয়াই কি ভাগ দিতে হইবে ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : দেওয়াই তো কথা—বিষয়সম্পত্তি-জমিদারি সকলি এখানে, পদমন্ত্রী পৈতৃক স্থান বটে, কিন্তু ধরিতে গেলে সকলই এখানে । সে কেবল নামমাত্র বাড়ি । আমি বেশ জানি, যাহার ভাগে যে গ্রাম পড়িয়াছে, বৃদ্ধ মীবসাহেব যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি অছিয়তনামায় নির্দিষ্টরূপে লিখিয়া দিয়াছেন । কেবল এই বাড়ি, আর এ বাড়ির মোতালকের অস্থাবর সম্পত্তি এজমালিতে বাখিয়া গিয়াছেন । অছিয়তনামা এবং অত্মাত্ম দলিল মীর-সাহেবের নিকট আছে, তাহা দেখিলেই আপনাব মনের ধান্দা ছুটিয়া যাইবে ।

সা গোলাম বলিলেন : অত্মাত্ম দলিল-দস্তাবেজ যে বাস্তবে আছে সে বাস্তবে অছিয়তনামা নাই । আমি তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিয়াছি । আপনি যে স্থানে থাকার কথা বলিয়াছিলেন, সেখানেও নাই—আমি সন্ধান করিয়াছি । যেখানে আছে, তাহা জানিতেও পারিয়াছি । আমাদের সংসারে তাঁহার পক্ষে এখন একটি প্রাণিও নাই । মনে মনে সকলেই ফাঁক । দু-হাত ফাঁক । ফাঁক পেলে কেহই ছাড়িবে না । দু-একটি দাসী মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে আছে । কিন্তু তাহাদেব কোন ক্ষমতানাই । আমাদেরই সকল, আমরাই কর্তা, আমরাই মালিক । আমি ইচ্ছা করিলে এই রাত্রেই একেবারে নিষ্কণ্টক হইতে পারি । নির্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি লইয়া সুখে থাকিতে পারি, কিন্তু—

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : সে কি কথা ! ওসকল কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না । মুখেও আনিবেন না । লোকের কুপরামর্শে কখনই ভুলিবেন না । কোনরূপ অমানুষিক কার্যো অগ্রসর হইবেন না । যাহা সহজে হইবে তাহার জন্ত এত ব্যস্ত কি ? নথের আঁচড়ে ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার জন্ত কামান পাতিবার দরকার কি ?

সা গোলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন : ও কিছু নয়, ও কথাটা আমি তামাশা করে বলছি । বিবেচনা করুন, অছিয়তনামা যদি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারি—তাহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার কি আর অন্তথা হইতে পারে না ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : তাই বা কি করিয়া হইবে ? এখন অতুখা করিতে পারে এমন সাধ্য কাব ?

সা গোলাম বলিলেন : কেন সে তো কোম্পানীর ঘরে জানিতে হয় নাই, কোন হাকিমের নিকটও আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া কোনরূপ সহি করান হয় নাই। ঘরাও দলিল, ঘরাও লিখাপড়া। তাতে আছে কি ? আপনারই তো পিতার হাতের লেখা। আপনার হাতের লেখা হইলে ক্ষতি কি ? যেসকল সাক্ষী আছে, তাহাদের দ্বারা সাক্ষী-শ্রেণীতে নাম লেখাইতে কতক্ষণের কাজ ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এত্ৰাহিম হোসেনের দস্তখতের কি হইবে ?

সা গোলাম বলিলেন : সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সে তার আমার প্রতি।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : তার আপনার প্রতিই থাক, গড়িয়া উঠিতে পারিলে হয়। ইহাব জ্ঞাত সময় চাই—গোপন চাই, ছদ্মবেশী হওয়া চাই কপটতা শিক্ষা করা চাই—বিশেষ পরিশ্রম এবং উদ্যোগী হওয়া চাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে আপনাকে বলিতে হইবে না, বহুকাল হইতে শিক্ষা আছে। আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্ম্মভয় আমার অতি কম।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : ভালই তো, ভয় যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ধর্ম্মভয় একটু থাকিলে যেন ভাল হয়। যাহাই বলুন আর যাহাই করুন, কিন্তু অছিয়তনামা আগে হস্তগত করিতে না পারিলে আর কোন আশা নাই। আপনি বলেন সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অছিয়তনামার বিষয় মীরসাহেব ভিন্ন অনেকেই জানে না। জানিবার সম্ভাবনাও নাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ধান করিতে আমি কম করি নাই। শীঘ্রই সফল হইব—কোন চিন্তা করিবেন না।

দেবীপ্রসাদের বাটির পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তা। গ্রামের, ভিন্ন গ্রামের ও অল্প স্থানের লোকজন ঐ পথে চলাচল করে “চৌকিদার চৌকিদার” বলিয়া একটি লোক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

সে সময় চৌকিদারের চাকুরি বড়ই মজবুত ছিল। নামমাত্র চৌকিদার। চৌকিদারকে পেটের অন্ন জোটাইতে সারাদিন পরের দ্বারে মজুরী করিতে হইত। নিতান্ত হীনাবস্থার লোক না হইলে চৌকিদারি কার্য কেহ স্বীকার করিত না। বৎসরান্তে কেহ এককাঠা ধান, কেহ একজোড়া নারিকেল, দুই-একমুঠো পাট, দু-একসের কলাই চৌকিদারের বেতনস্বরূপ দিত। বড় বড় ঘরে বার্ষিক বরাদ্দ চারি আনা, বড় বেশি হইলেও আট আনার উর্দ্ধ ছিল না। ছেলেমেয়ের বিবাহে লোকে কিছু পয়সা, দু-একখানা কাপড় চৌকিদারকে দিত মাত্র। মাসিক বরাদ্দে প্রায় কেহই বেতন দিত না। চৌকিদারও বেতন বলিয়া কোন দাবি করিত না। চৌকি পাহারাও সেইপ্রকার—যেমন দান তেমন দক্ষিণা—যেমন বেতন তেমন কাজ। কিন্তু খানার দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজের হাত হইতে বাঁচাও ছিল না। প্রতিকথায় মার, প্রতিকথায় গালাগালি, এইসকল ব্যবহারে নীচশ্রেণীর লোক ভিন্ন ভাল লোকে এখনও চৌকিদারি করে না। সারাদিন হাডভাক্স খাটুনি খাটিয়া চৌকিদার বিতোরে ঘুমাইয়াছে। “চৌকিদার, চৌকিদার।” অনেকক্ষণ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও চৌকিদার হাজির হইল না।

এত রাত্রে চৌকিদারের ডাক কেন? কে ডাকে? দেবীপ্রসাদ দুই-একপায়ে দেউড়ি পর্যন্ত আসিলেন। রাস্তার নিকট আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক পাবনাব বরকন্দাজ। মাজিষ্ট্রেটসাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে বাইবেন। পথে পথে মশাল, মশালটির ঘোগাড করিয়া, শালঘর মধুয়া বাগুয়াই বরকন্দাজের এখন কর্তব্য কার্য।

দেবীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নাম শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আসিলেন। না গোলামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বরকন্দাজ ও তাহার সঙ্গী, লোকজনসহ স্বনিব্বাডিতে আসিলেন। সঙ্গর দেউড়িতে তাহাদিগকে বলিবার স্থান দিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনসংবাদ মীরসাহেবের নিকট বলিতে অগ্রসর হইলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কারণ সেসময় মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীরসাহেব অল্প ক্ষেতর বাজাইতেছেন, গোশাল গোলক বাজাইতেছে। দেবীর নরকীষর মৃত্যু করিতেছে। মহকমের প্রাণ নকলিই মনের আনন্দে আনন্দসাগরে হারিয়েছে, খাইয়া ভাগিয়া বেড়াইতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেবীপ্রসাদের পা উঠিল না। ডাকিলেই না শুনে কে।

বাজেলোক পাঠাইয়া খবর দিতেও সাহস হইল না। আমোদে বাধা দেয় কার সাধ্য ?

দেবীপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সা গোলাম দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটিতে আসিয়া, বৈঠকখানাঘরের দিকে যাইলেন না। মীরসাহেবের বিশ্বাসী খানসামা বিনোদের সহিত গোপনে গোপনে কি কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে আমোদের ঢেউ খেলিতেছে। হাসির গরবা, গানের তান, বাজনার বোলে ছলুখুল ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নর্তকীর পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল। লয় বিহনে, বে-লয়ে, তাল কাটিয়া বাজনা বন্ধ হইল। বসীরুদ্দিন মোসাহেবও গায়ক—তিনিও বাঁচিলেন। অজ্ঞেয়কক্ষণ পর্য্যন্ত গলাবাজি করিয়াছেন, বাহিবে আসিবার নিতান্তই দবকার হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আবশ্যকীয় কাণ্ডা সমাধা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ দেবীপ্রসাদকে দেখিয়া খতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। দেবীপ্রসাদ বসীরুদ্দিনের হস্ত পরিয়া একটু দূবে লইয়া গিয়া চুপি চুপি মাজিষ্ট্রেটসাহেবেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনবিষয় বলিয়া দিলেন। বসীরুদ্দিন উঠিতে পড়িতে মীরসাহেবের নিকট যাইয়া চুপি চুপি সকল কথা শুনাইলেন। মীরসাহেব আমোদে ভঙ্গ দিয়া তখনি বাহিবে আসিলেন। মশাল, তৈল, মশালটি সংগ্রহ করিয়া দিতে দেবীপ্রসাদকে আদেশ করিলেন। এবং তখনি জানমামুদ, কদম, ফটিক, চাকরান, জমিভোগী বেহালাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল। কারণ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কুঠিতে পঁহুঁছিবাব পূর্বেই মীরসাহেব কুঠিতে যাইয়া মিসেস কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করিলেন।

বসীরুদ্দিন দেবীপ্রসাদকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ আমোদে-আহ্লাদে, মনোমত কার্যো বাধা দিতে দেবীপ্রসাদের হস্তই অগ্রে প্রসারিত হইত। বসীরুদ্দিন মীরসাহেবের প্রধান মোসাহেব। নাচিতেন, গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং সাজিয়া রঙ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জা বোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্তকীদের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি যে একজন মহারসিক একথা তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আর ছিল যে, কমলপদের কোমল আঘাতে শরীর পবিত্র না করিলে রসিকের পরীক্ষা হয় না, রসিকনামও জঁকিয়া উঠে না। যেমন আগুনে নু পুড়িলে সোনার

আদর বাড়ে না, তেমনি কামিনী-কোমলপদের আঘাত সহ না করিলেও রসিক-নামের সার্থকতা হয় না।—বোধহয় এই অপকথাটা বসীরুদ্দিনের হৃদয়ে সর্বদা জাগিত। তাই তিনি ঐ সকল কোমল পদেব আঘাত সহ করিতেন—শরীর পবিত্র করিতেন। পূর্বপুরুষের নামেও কিছু ভুণিতেন।

আরও একটি আশা ছিল। মীরসাহেবের অল্পগ্রহ আর স্মৃষ্টি—বিষয়াদির কার্যোণ্ড মীরসাহেব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাও তাঁহার অন্তরে অগ্নি একটি আশা। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষ আশাটি কখনও পূর্ণ হয় নাই। বিষয়াদি কার্যে দেবীপ্রসাদের কথাই বলবৎ থাকিত। এই দুঃখে বসীরুদ্দিন সর্বদাই চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন। সময় সময় সে দুঃখের কাহিনী মীরসাহেবের নিকট স্পষ্টভাবে বলিতেও ক্রটি করিতেন না। মীরসাহেব কিন্তু সে কথায় কান দিতেন না। যাক সে কথা। এখনকার কথা এই যে, এত আমোদ মুহূর্তমধ্যেই বন্ধ হইল। এক দেবীপ্রসাদ আসিয়া নাচ, গান, বাজনা মাটি করিয়া দিল। এই কথাটা বসীরুদ্দিনের শিরায় শিবায় বসিয়া গেল।

মীরসাহেবের গমনের আয়োজন, পালকি-বেহারা সমুদায় প্রস্তুত—হাসি, তামাশা, রসিকতা, রগড়ের কথা আব কাহারও মুখে নাই। সেতারের তার ছিঁড়িয়াই রহিল। নর্তকীর পায়েব নূপুৰ ফরাসের উপরে যেস্থানে খসিয়া পড়িয়াছিল, সেইস্থানেই পড়িয়া রহিল। বসীরুদ্দিন বারান্দায় আসিয়া মুহ-মুহ স্বরে বলিতে লাগিল, “এখন না যাইয়া প্রাতে গেলেও হইতে পারিত।” মীরসাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি প্রস্তুত হইয়া পালকিতে উঠিলেন। বৈঠকখানাস্বরের দ্বার বন্ধ হইল।

সাঁ গোলাম বিনোদ খানসামার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার বসিবার কুঠরিতে বসিয়া আছেন। চঞ্চল ভাব। রাত্রি প্রায় একটা—কি চিন্তা করিতে করিতে একবার বাটির মধ্যে তাঁহার শয়নকুঠরিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবার বাটির মধ্যে গিয়া সমুদয় স্থান অতিসাবধানে বেড়াইয়া দেখিয়া আসিলেন। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া-শব্দ পাইলেন না। আজিই সময়, আজিই অবসর, এই উপযুক্ত সময়। মনে মনে স্থির করিয়া এক-পায়ে দু-পায়ে মীরসাহেবের তোলাখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার একপ চলাফেরা নূতন নহে। আরও কয়েকদিন নিশীথ সময়ে মীরসাহেবের তোলাখানার দিকে পা ধরিয়াজেন। চুপে চুপে বাড়ির অনেক ঘর খুঁজিয়াছেন।

মাক্জন ও বিনোদ দুজনেই তোশাখানার জমাদার। মাক্জন মীরসাহেবের বিশ্বাসী এক প্রধান চাকর। বিনোদ মাক্জনের সাহায্যকারী। ঢুলা মিয়া (জামাই-বাবু) অর্থাৎ সা গোলাম পূর্ব হইতেই ঐ তোশাখানার কোথায় কি আছে বিনোদের সাহায্যে সকলি জানিয়াছিলেন। কোন দ্বার খোলা থাকে, কোন জানালা বন্ধ, কোন দিকে বাতাস, কোন পাশে আলমারি-সিন্ধুক সকলি তাঁহার জানা ছিল। জামাইবাবু সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মীরসাহেবের আদেশ ও অমুগ্রহেই তাঁহার ঐ অধিকার।

মাক্জন মীরসাহেবের বিশ্বাসী তাহা জামাইবাবু বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মাক্জনও বিশ্বাসের গৌরব দেখাইতে অনেক গুপ্তকথা, যাহা কেহ জানিত না, তাহার কিছু কিছু জামাইবাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশ্বাসী হইয়াছে। সা গোলামের বিশ্বাস, মাক্জন যাহা বলে সে-সমুদয়ই সত্য। মাক্জন গাঁজাগোর—কিন্তু সরল।

সা গোলাম বিনোদের সাহায্যে তোশাখানার দরজা খোলা পাইলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চোরের প্রপিতামহের ত্রায় অতিসাবধানে পা ফেলিয়া তোশাখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনোদের অমুগ্রহে তোশাখানা অন্ধকার। বাতিটি ইচ্ছা করিয়াই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই! কেবল অলুমান আর হাতের আন্দাজ এই দুইটির উপর নির্ভর করিয়াই জামাইবাবু অন্ধকার ঘর-মধ্যে আপন অভিষ্ট সাধনের জন্ত হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিলেন। মাক্জন কিছুই জানে না। বিনোদকেও আসল কথা বলেন নাই। কেবলমাত্র এই বলিয়াছিলেন যে, নিশীথ-সময়ে কোন গুপ্ত-স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিতে যাইব, তুমি তোশাখানার দ্বার খুলিয়া রাখিও। আমি তোমাকে খুব গোপনে জাগাইয়া লইয়া যাইব।

বিনোদ জানিলেও মা'র নাই—পূর্ব মন্ত্রণাই তখন আশ্রয়। মাক্জন জাগিলেও শীঘ্র উঠিবে না। কারণ সে নেশায় ভোর। সা গোলাম গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে জিনিসের জন্ত তাঁহার এত পরিশ্রম, এত চেট্টা—মহাপাপকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছেন, সে জিনিসটি হস্তগত হইল। অছিয়তনাক্সা যে বাক্সে আছে সম্বন্ধে জানিয়াছিলেন সে বাক্সটি হস্তগত হইল। বিশেষ সাবধানে হাতবাক্সটি বগলে চাপিলেন। মাক্জন টের পাইল যে, কে যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া কি লইয়া গেল। নেশার ঘোরে উঠিতে ইচ্ছা হইল

না। চক্ষু বুজিয়াই 'দূর দূর' কবিতা আবার নীরব হইল। পূর্ববৎ নিবাস চক্ষিতে লাগিল।

জামাইবাবু হাতবাক্সটি লইয়া তখনই নিজের বড় বাগ্জে বস্ক করিলেন। পাখিরা প্রভাতী গাইয়া উঠিল। শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্যপথে মিটিমিটি চাহিয়া বাইতে লাগিল, জামাইবাবু শয্যায় শুইয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

তদারক

পাবনা রাজশাহী জেলাব অন্তর্গত। সময়ে সময়ে রাজশাহীর জজ দাওয়ার মোকদ্দমাব বিচার কবিতো পাবনায় আসিয়া থাকেন। কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে, সুতরাং জেলা বলিয়াই অভিহিত। পাবনা হইতে শালঘর মধুয়ার আসিতে হইলে পদ্মা পার হইয়া আসিতে হয়।

পদ্মা পাড়ি দিয়া দক্ষিণপারে আসিলেই কুষ্টিয়ার থানা। পাঠক! বর্তমান কুষ্টিয়া বে-স্থানে স্থাপিত সে স্থানের যথার্থ নাম কুষ্টিয়া নহে। পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেশনের উক্তবদিকে কুষ্টিয়া গ্রাম আজি পর্যন্ত বর্তমান আছে। এইক্ষণ তাহার নাম পুরাতন কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার থানা—পুরাতন কুষ্টিয়া হইতে উঠিয়া গৌরীন্দীর দক্ষিণপার আসিলে, সে থানার নামও কুষ্টিয়া এবং সেই নামেই মহকুমা ইত্যাদি ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম হইয়াছে। এইক্ষণে যে-স্থানে কুষ্টিয়ার থানা বর্তমান, সে-স্থানের নাম 'মজুমপুর'। এইপ্রকারে বাহাদুরখালী, একপাড়া গ্রাম নইয়া কুষ্টিয়া। যে সময়ের ঘটনা, সে-সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেশন হয় নাই। বর্তমান থানারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন কুষ্টিয়াতেই থানা—সে থানাতেও শালঘর মধুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে। অন্য লোকে এজাহার দিলে দারোগা-সাহেব সে লোকটিকে বাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন। কুষ্টির এজাহার না লইয়া উপায় নাই। মেমসাহেবের প্রেরিত লোকের এজাহার। বিশেষ দুর্দান্ত প্রতাপাশ্বিত টি. আই. কেনীর কুঠিলুট। এ এজাহার না লইলে কি রক্ষা আছে? লাভের প্রত্যাশা না থাকিলেও বাধা হইয়া এজাহার লইতে হইয়াছে।

থানাদার কেবল নিজ নাম লিখি করিতে জানেন। তাই দনবীশবাবুকে লিখি লইয়া—পাঁচজন স্বরকলাজমহ মাঝেরারহলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যেরূ-

সাহেবের আদেশ হয় নাই বলিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হন নাই। রীতিমত খোরাকি পাইতেছেন। থাকিবার স্থানও ভালই জুটিয়াছে। আহাৰাদি করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। অল্পসম্মানে জানিয়াছেন মাজিষ্ট্রেটসাহেব স্বয়ং তদন্তে আসিবেন।

স্বর্ঘ্যোদয়ের সহিত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাহাদুর সদর দারোগা (পাবনাব) ও সদরের বরকন্দাজগণকে সঙ্গে করিয়া শালঘর মধুয়ায় দেখা দিলেন। প্রথমে মিসেস কেনীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আবও একবার কুঠিতে আসিয়া মিসেস কেনীর নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। সময় সময় চিঠিপত্র পাইতেন এবং লিখিতেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা কুঠি আক্রমণ করিয়াছে, অনেক সাক্ষী জবানবন্দি দিলেন। সাহেবপক্ষের দুইজন লোককে যে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। জখমদ্বয়কে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সম্মুখে বাঁশের চাকিতে শোয়াইয়া আনা হইল। সড়কির আঘাতে একজনের বক্ষভেদ, লাঠির আঘাতে অপরের মাথাফাটা, তখনও নাক ও মুখ ভাসিয়া রক্ত পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই।—বোধ হয় বাঁচিবে না। বাঁচিবার ভরসা একেবারে নাই বলিলেও হয়।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব বলিলেন, কুঠির লোক হইতে অধিক বিশ্বাস্ত প্রমাণ এই দুইজন লোক। কুঠির সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। সাঁওতার জমিদারের লোক। আপন জমিদারের পত্র লইয়া সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। সাহেব কুঠিতে না থাকায় পত্রের উত্তর পায় নাই। বাধ্য হইয়া ইহারা আপিস ঘরের বারান্দায় রাত্রে শুইয়াছিল। প্রাতের ঘটনাসমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। প্যারীসুন্দরীর লোক যে যে প্রকার এই দুই ব্যক্তিকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়াছে, তাহাও ইহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, ইহারাই মূল সাক্ষী।

উভয় জখমীকে পাবনার ডাক্তারখানায় ডাক্তারসাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ করিয়া সাহেব খানার কামরায় চলিয়া গেলেন। মোকদ্দমা তদন্ত শেষ হইল। আপিস ঘরে কুঠির প্রধান নায়েব হরনাথ শ্রী মিশ্রী এবং অন্যান্য আমলাগণ বসিয়া মোকদ্দমার প্রমাণ, সাক্ষীর জবানবন্দি বিষয় আলোচনা করিতেছেন। পাবনার মোক্তার চাঁদ অধিকারীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সাহেব কুঠিতে নাই, আপিস ঘরেই তামাক চলিতেছে। কত ভক্তলোক নায়েবমহাশয়ের ঘরের একট

কথার জঁত লালায়িত হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাগজে মোড়ক করিয়া কিছু কিছু প্রণামী বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে—নায়েবমহাশয় বেরেঁয়া। কথায়, কার্যে, হাসি-তামাশায় সকল দিকেই আছেন। প্যাবৌস্‌ন্দরীর প্রসঙ্গেও হাসি-তামাশা চলিতেছে। মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আরদালী সঙ্গীয় বেহারা এবং লোকজনের আহ্বারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি দ্বীলোক ‘আমার বাবা কোথায়, ওরে আমার বাবা কই?’ বলিয়া উচ্চস্বরে কাদিতে কাদিতে কাহারও বাধা না মানিয়া আপিস ঘরের নায়েবমহাশয়ের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া কাদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, “আমার বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ি হইতে আহাব করিয়া আসিয়াছে। নায়েবমহাশয়! আমার বাবা কই? এই একমাস হয় নাই, তিনকুড়ি টাকা খরচ করিয়া বাবার বিবাহ দিয়াছি। (উচ্চস্বরে) ওরে আল্লা! ও খোদা’ একি করিলে। ওরে এমন ডাকাতি কখনই দেখি নাই। দিনে-দুপুরে ডাকাতি। সাহেবের চাকর হইয়া স্থখে থাকিবে, গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগিবে না, তাহার ফল বুঝি এই হইল? আপনারা আমার ছেলেকে কি করিলেন? আমার ছেলে কই নায়েব মহাশয়? আপনার ছুখানি পায় ধরিয়া বলিতেছি, আমার কালু কোথায়? দোহাই তোমাদের পিতামাতার, আমার কালুকে একবার দেখাও।”

হরনাথ শ্রী মিশ্রী মানুষ কিন্তু গঠিত পাষণে। কুঠিয়াল নরব্যাক্র, তার চাকরের মনে মায়া-মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব। কিন্তু সে সময় সে কঠিন প্রাণও গলিয়া গেল। কালুর মাতার ক্রন্দনে সে নীরস, নির্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। মায়া-বশে সে বিকট চক্ষেও জল ঝরিল। জিহ্বায় জড়তা আসিল। মুখে কথাটি নাই। যার মুখে সর্বদা কথা, মেজাজ গরম, নজর গরম—কালুর মাতার কথা কয়েকটিতে একেবারে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কি বলিবেন, কি করিবেন, কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে বহু কষ্টে বলিলেন, “চুপ কর, চুপ কর, কুঠিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব আছেন। গোল কর না। তোমার কালু ভালই আছে। কোন চিন্তা নাই। তার কিছু হয় নাই। কে বলেছে? মিছে কথা—ও সকলি মিছে কথা।”

কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাদিয়া কাদিয়া বলিতে লাগিল, “ওরে বাবা! আমার ঐ একটি ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। জিজ্ঞাসা করে

—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মাতুষ কবিছি। ওর বয়স যখন সাত-চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কলজে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত-পা টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা! যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলো না। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাসখানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুটো মুখের কথা করে দেলস। দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। এখনও নাই। খেয়ে না খেয়ে কালুকে মাতুষ করেছিলাম। বাবা আমার! কাল রেতে ভাত খেয়ে সাহেবের কামরায় পাখা টানতে এসেছিল, বোজ বোজ বেলা উঠলে বাড়ি যায়, আজ দুদিনের মধ্যে তার খোঁজ-খবর নাই। লোকে যা বলেছে তা মুখে আনতে পারি না। তোমরা আমাকে খুন কর।”

হরনাথের তখন মেজাজ একটু গরম হইল। বলিলেন, “চুপ কব, চুপ কব! প্যারীশুদ্ধরীব লাঠিয়ালের! যে কালুকে জখমী করেছে তাকি তুই শুনিস নাই? মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাকে পাবনার ডাক্তারখানায় আবাম হবার জন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরাম হলেই ফিবে আসবে।” যে কদিন কালু বাটিতে না আসতে পারে, সে কদিন তোমার খাবার কোন কষ্ট হবে না। এই চারিটি টাকা দিচ্ছি, পেট চালাওগে। ফুঝাইলে আবার আসিও।”

কালুর মাতা কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল, “নায়েবমহাশয়! আমি তোমার টাকা চাহি না। আমি আমার বাবাকে পাবনায় দেখিতে চললেম।” এই বলিয়া কালুর মাতা টাকা ফেলিয়া উচ্চস্বরে কঁাদিতে কঁাদিতে আপিস ঘর হইতে বাহির হইল।

নায়েবমহাশয় চৈত সিং আর দুই-তিনজন লোককে তখনি আদেশ করিলেন হারামজাদিকে ধরিয়া উহাব বাটিতে লইয়া যাও। কিছুতেই বাটি ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে বাইতে না পারবে। খুব সাবধানে রাখবে। খুব সাবধান! শীঘ্র যাও।”

জুম পাওয়ামাত্র বমদুতেরা পুত্রহারা 'মায়ের প্রাণে নূতন বকমের বজ্রপা দিতে লাগি ঘাড়ে করিয়া অমনি ছুটিল।

বাসীর কঁাদিবার কেহ ছিল না। বোড়শী মাজ। সেখানেই কুড়িয়ে

একা বসে কি ভাবিতেছে, ঈশ্বর জানেন। ভিন্ন গ্রামের মেয়ে স্বর হইতে বাহির হওয়া তাহার সাজে না। সে আর কুঠিতে গেল না। বাঁসী সাহেবের শয়নঘরের পাহারাদার ছিল। কালু ও বাঁসীব ভাগো বাহা ঘটয়াছে তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিয়াছেন। হায় বে সংসার! হায় বে শক্রতা! শত্রুতাসাধনে লোকে না পাবে এমন কোন কার্যাই নাই। ধন্য সংসার!

নবম তরঙ্গ

কালু ও বাঁসী

মোকদ্দমা সাজাইবার জন্ত একজন পাহারাওয়াল। এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে। কালু সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়াছিল, কুড়ন সর্দার হরনাথের হুকুমে কালুর পিছন হইতে বিনা অপরাধে দুঃখিনীর সন্তানকে সড়কি মারিয়া বুক পার করিয়া দিয়াছে। বাঁসী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুদামঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছিল। শয়ন অবস্থাতেই ঐ পাখও কুড়ন হরনাথের আক্রমণ বাঁসীর মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। গুদামঘরের মধ্যে হঠাৎ আর্তনাদ এবং চীৎকারের কারণও তাহাই।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব আসামীদিগের নামে গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা বাহির করিয়া দুই থানার দারোগা মোতায়েন করিলেন। কোনসময় কুঠি ছাড়িয়া পাবনাভিমুখী হইলেন, তাহা কথকের মনে নাই। তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাবনায় চলিয়া গেলে মীরসাহেব মেমসাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন, ইহা বেশ মনে আছে।

এদিকে টি. আই. কেনী যশোহর হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে কুঠিতে আসিয়া সমুদয় বিবরণ শুনিলেন। তাহারও ইচ্ছা যে, প্যারীসুন্দরীর বাটি লুট করেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত দিলেন। সাহসও হইল না। কারণ বেপাল্লা। সুন্দরপুয়ের নিকটে সাহেবের জমিদারি নাই। লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাখারও কোন সুযোগ স্থান নাই। সাতপাঁচ ভাবিয়া মোকদ্দমার যোগাড়ই ভালরূপ করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রমাণ ইত্যাদি ও আর তথ্য বাহা বাকি ছিল, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও আদেশ করিলেন, “প্যারীসুন্দরীর চাকর কি প্রজা বাহাকে কে যে স্থানে পাও, ধকিয়! আমার মিকট হাজির করিলেই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।”

দেশময় লুটের কথা—খুনের কথা—সত্য কথা—নানা কথা—নানা লোক
নানা প্রকার, প্রকাশে গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল। চারিদিকে হুলস্থূল
ব্যাপাব—তুমুল কাণ্ড!

দশম তরঙ্গ

আরুপ

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও আর স্থান নাই। নিজে
দলপতি হইয়া অপ্রস্তুত—শুধু অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ—
অবস্থা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শতমুখে নিন্দা। পার্বীসুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল
কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্যমিথ্যা একত্রে, ভেলআসলে ‘আমেজ’ করিয়া
যুদ্ধের কথা শেষ করিয়াছেন।—“সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। মেম-
সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠিতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া-
ছেন। কিন্তু সাহেব মোকদ্দমা সাজাইতে ক্রটি করেন নাই। কুঠির উপর পর্য্যন্ত
যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ মিথ্যা
ফাঁদে ভাল করিয়া আটকাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে,
সকলেই শুনিয়াছে, পার্বীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবের কুঠি লুট করিয়া লইয়া
গিয়াছে। ১০।১২টি লোক জখমী, তিনটি খুন!”

পার্বীসুন্দরী এই কথা শুনিয়া একটুকুও ভীত হইলেন না। ক্ষণকালের
জন্তও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, “বেশ হইয়াছে। আমার
লাঠিয়াল কুঠি লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার স্মৃতি বোধ
হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠি লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা
স্মৃতির বিষয় আর কি আছে! সাহেবের পক্ষে ১০-১২টি জখম, তিনটি
খুন! চিন্তা কি, মোকদ্দমার পথে চলিলে পার্বীসুন্দরী কখনই হটিবে না। সদর
নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এতদিনে জানিলাম—কেনীর ক্ষমতাবল
সকলি বুঝিলাম।—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকালের
জন্তও অন্তরে ভয়কে স্থান দিও না। একবার—দুবার—না হয় তিনবার—চেষ্টার
অশাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা। এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার যোগাড়
অন্তদিকে আবার লাঠিয়ালসংগ্রহ। দেখি কয়বার ফাঁক যায়। একদিন হাতে
পাইবই পাইব। আরও একটি কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যেকোন

কোণলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্ত বাধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারি, বাড়ি, ঘর, নগদ টাকা, আসবাবপত্র যাহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি স্বন্দরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জন্ত রহিল। অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্বেই আহারের সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে বাখিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীসুন্দরী যাহাব দ্বারে দাঁড়াইবে, সেইখানেই সমাদরে স্থান পাইবে। ছরস্তু নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে বক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি আমার জীবনের জন্ত একটুকুও ভাবি না। দেশের দুর্দশা, নিরীহ প্রজার দুর্বস্থার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ কাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জন্ত তোমরা ভাবিও না। যতপ্রকারের তদবির হইতে পারে তাহা কব।”

রামলোচন বলিলেন, “আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই থানাদার দারোগা, জমাদার, আসামী ধরিবাব জন্ত মফস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারোগাকে দেও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়াইয়া দেও যে, আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটিতে নাই, আমার সবকাবে নাই। স্বন্দরপুরগ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমবা কখনও সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দবাবু উপার্জিত ঐশ্বর্য, জমিদারি সকলি আজ কেনীর জন্ত তাঁহারই কন্যা প্যারীসুন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারাও পৈতৃক জমিদারি নহে। ইহাও ইংরেজের অল্পগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ, একপ্রাণী বটে—তবে মানুষ আর শূকর। এক ঝাড়ের বাঁশ—কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজি। কত ইংরেজ কত কার্যে এদেশে আসিতেছেন, কই কেনীর মত নর-রাক্ষস তো একটিও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালির ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠির কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য, এত জমিদারি। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই স্বন্দরপুরের স্রবের সৃষ্টি। বোধহয় কেনীর কল্যাণে সকলি মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে! তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের চুপ। একজন—দৌরাভ্যাকাবী ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, ভালরূপ

শিক্ষা দিতে পারিলে না। ছি! ছি! বড় লজ্জাব কথা। বড় ঘৃণার কথা! দেশ তো এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোকজন লইয়া একা কেনী। আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাঙ্গা, এত জুলুম করিতেছে। তোমরা শতসহস্র লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না। নিশ্চয় জানিলাম তোমাদের মাথায় কিছুই নাই। কিছুই নাই—খালি হাড় আর পচা মজ্জা। কি করি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি জ্ঞীলোক—! কেনীর দৌরাঙ্গো না টিকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও করো না—সেকথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া সে প্রণয় না পারিয়া, সে ভালবাসা, সে আত্মগত্যা—অপমানের ভয় প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়, ভাবিয়া। যাহা মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয়, না দেশের লোক? তাহাদের নিকটে যাওয়া-আসা করা চাই। যথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সাহায্য, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় কবা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা কবা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অস্তর হইতে চিবকালের জন্য অস্তর করা চাই। সকলের একপ্রাণ—একদেহ হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। একভাবে, একমতে বুদ্ধি চালনা করা চাই। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে হই-ছঁ করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে, বিপদকালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। অর্থবল আর বাহুবলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে, অস্ত্র বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতেই পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বহুবলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এ দুই বল বা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাবে সেই বলের অন্বেষণ কর। যদি পাও, সাহায্য চাও—সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বসীয়া, তার অন্বেষণ কর। দেখি, কেনী যায় কোথা? একা কেনী—আসিবার দিন একখানি বেত, আর একটি টুপি লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকের কাছে গল্পও করে যে: আমার বেত-টুপি দার। যদি নাই থাকতে পারি:

মহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া ঘাইব। দেখ তো কেমন সাহস! আর কেমন ভাল হওয়ার চেষ্টা। তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে, না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলি মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হইহই। কাষা বুঝিয়া, কাষের গুরুত্ব বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না। আচ্ছা, যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গোরব বজায় থাকে। কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বাক্য ক্ষয়, আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোর কিছুতেই কমে না। বাকি রহিল মাথা—সে মাথা একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। যাহাইউক, আর বেশি বলতে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ়বিশ্বাস করে স্থির করে রেখ যে, সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এই জালেমের হাত থেকে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি তাতে দুঃখ নাই, কারণ কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমি যেসকল ঘটনা চক্ষে দেখিতে পারিব না। দয়ার হাতবিস্তার—নিষ্কয়ের হাতসঙ্কোচ। যেদিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সেদিন সামান্য বলে, সামান্য কারণে কেনী মহা-অস্থির হইয়া উঠিবে।

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে, দারোগা, জমাদার, বর-কন্দাজ, চৌকিদারের প্রায় চারিশত লোক আসিতেছে।

পারীশ্রুন্দরী বলিলেন, তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্তে আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এই-ক্ষণে সেসব আলাপ কিছু না করে—আগে আহাের যোগাড়, জলখাবার যোগাড়, বাসার যোগাড় বিশ্রাম উপযোগী স্থানের যোগাড় করিয়া দেও, পরে অস্ত্র যোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর, আদরের, যত্নের ক্রটি না হয়। সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্তে চলিয়া গেলেন।

একাদশ তরঙ্গ

দলিলের বাজ

পাঠক! জামাইবাবুর সেই বাজ চুবির কথাটা একবার মনে করুন। তিনি অস্ত্র কোন মূল্যবান জিনিস না লইয়া সামান্য একটা বাজ, অত পরিশ্রমে অত যোগাড়ে হস্তগত করার কারণ কি? তাহা বোধহয় বুঝিতেই পারিয়াছেন। সজানী বিনোদ ঐ বাজে অছিন্নতনামা—

বিনোদ বলিয়াছে, আমি জানি ঐ আলমারির নিকটে হাতবাক্সটির মধ্যেই অছিয়তনামা আছে। আমি মীরসাহেবকে রাখিতে দেখিয়াছি। আমি অছিয়তনামা চিনি। বিনোদ মীরসাহেবের বিশ্বাসী, মীরসাহেবের অনেক গুণ-কথা জানে, সুতরাং অছিয়তনামার সন্ধানও যথার্থ। জামাইবাবু বিনোদকে একেবারে বড়লোক করিবেন—কোরান ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার পরেও শতক দেড়শত বিনোদের বাড়ি গিয়াছে। তাহার পরেও বিনোদের কত তোষামোদ, কত খাতির। বাক্সটি খুব সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ পান নাই বলিয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। একদিন খুলিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, চাবি নাই। “অন্ত অন্ত চাবি দিয়াও দেখিয়াছেন, খোলে না। তালার কলটি পর্যন্ত ঘোরে না। ভাঙ্গিতেও সাহস হয়না। বাক্স ভাঙ্গার কথা প্রকাশ হইলে যদি ঐ বাক্সের তালাস হয়—না পাওয়া গেলেই সন্দেহ হইবে যে, জামাইবাবুই এ কীর্ত্তি করিয়াছেন। বাক্স ভাঙ্গার কারণ কি? রাত্রে বাক্স ভাঙ্গার আবশ্যক কি? নানা ভাবনার পর স্থির করিয়াছেন যে হাতে পাইয়াছি কাজ উদ্ধার হইয়াছে। যে দিন সুবিধা আর সুযোগ পাইব, সেইদিন আবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিতান্ত পক্ষে না খোলে ভাঙ্গিব। দেখি কি হয়। কিছুদিন চাপিয়া যাই। এমন সুন্দর বাক্সটি ভাঙ্গিতেও মনে কষ্ট হয়। ভাবি স্বার্থে অথবা ব্যাঘাত, ভয়, কলঙ্ক, অপবাদ, লজ্জা এই কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া বাক্স খুলিবার কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর করিলেন না। মনে মনে আরও স্থির করিলেন যে মূল দলিলত হাতে আসিল, এখন অন্ত অন্ত দলিল হাতে করা চাই।

সকলের সম্মুখে মীরসাহেব জামাইবাবুকে একদিন বলিলেন, চিরকাল শালঘর মধুয়ার কুঠির মালিক সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় “কেনী” এখন অল্পগ্রহই করেন। এদিকে বিষয়াদিতেও আর কোন গোলযোগ দেখি না। এই সময় আমি একবার সেরাজগঞ্জ হইয়া আসি। অনেকদিন যাইনা। একবার গিয়ে দেখিতে হয়। এ বাড়ির কাজ সকলি আপনি দেখিবেন। বাপু! আমার আর কোন আশা নাই। সকলি তোমাদের, আমার আর কিছুই ভাল বোধ হয়না। তোমাদের কাজকর্ম তোমরা দেখে শুনে কর। আমি নিশ্চিন্তভাবে বসে বসে ছুটো ক্ষেতে পেলেই হল। তোমাদের ঘর সংসার তোমরা দেখে শুনে রক্ষা কর।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, স্ত্রী, পরিবার বিহীন গৃহী বড়ই অস্বখী। ঘরের লক্ষ্মীই ঘরনী। যদি তাহাতেই অনিচ্ছা, তবে একেবারে সৰ্ব্বত্যাগী হয়ে “ককিরী” গ্রহণকরাই ভাল। গৃহী অথচ কিছুই নাই। হুজুর! এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা।

মীরসাহেব বলিলেন, আবার! —জেনেগুনে আবার! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার স্তথের। ভুক্ত ভোগীর নিকট অণু প্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব। সংসারে স্তথ নাই। যদি বলেন আমার বংশলোপ হইবে, স্ত্রী, পুত্র, কণ্ঠা, কিছুই নাই। তাহাতে দুঃখ কি? কতলোকের সন্তান জন্মিবে, বংশরক্ষা করিবে। আমার নাইবা হইল। আমি স্ত্রী, পরিবার এবং দুনিয়ার স্তথ দুঃখ ভাল কবিয়া ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয় সম্পত্তির সাধ সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে শরীরের অবস্থা বয়সে সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত, আমরা মারা গিয়াছি। বড় মীরসাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?

মীরসাহেব বলিলেন, বয়সে কিছু না করুক। আমি আর ও ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। সৰ্ব্বস্ব গিয়া একটি মাত্র ছিল তাহাও যখন গেল, আর আশা কি? সকলি ঈশ্বরের কৃপা। এখন আছি ভাল। দয়াময়ের দয়ায় এখন আছি ভাল।

কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কেনীর চাকর কনিমসদ্দার আসিয়া, সেলাম বাজাইয়া বলিল,—

হুজুর! —সাহেব! —এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন, হুজুরের আমবাগানের নিকট, হাতীর উপরে আছেন, কি কথা আছে—সেলাম দিয়াছেন।

মীরসাহেব যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাগানের নিকট গিয়া, কেনীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনেকেই দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতদৃশ্য দেখিতে লাগিল। কথাবার্তা স্পষ্ট ভাবে হইলেও দূরত্ব হেতু কেহ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। কেবল সময় সময় কেনীর মুখে চক্ষে, রাগের চিহ্ন দেখা—আর

প্যারীসুন্দরীর নাম কানে শোনা।—শেষের কথাটা বোধহয়, স্পষ্টভাবেই সকলের কানে গেল। “বেত আর চুপী—আবার উহা লইয়াই জাহাজে চড়ি।”

অনেকে অনেক অর্থ ঘটাইলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হইল। কেনী যাইবার সময়ে, আব কয়েকটি কথা চুপি চুপি মীরসাহেবকে কহিয়া হাতিতে উঠিলেন। হাতিতে উঠিতে উঠিতে আবার বলিলেন, “ভুলিবেন না, ফের বলিতেছি, ভুলিবেন না।” পুনরায় উভয় উভয়কে সেলাম দিয়া কেনী দক্ষিণমুখী হইলেন। মীরসাহেব উত্তরমুখী হইয়া বাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত দর্শকগণ মীরসাহেবকে আসিতে দেখিয়া আমবাগান হইতে, নানা পথে ছুটিয়া মীরসাহেবের অগ্রেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

মীর সাহেবও ধীরে ধীরে আসিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজলিস আবার জমাট বান্ধিয়া গেল। কথা চলিতে লাগিল।

মীর সাহেব বলিলেন, ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস! সাহেবকে একেবারে অস্তির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেক্রপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়। প্যারীসুন্দরী সাহেবের ধনে প্রাণে সারা করিতে স্থির হইয়া বসিয়াছে! আবার কুঠি লুট করিবে। কেনীর মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে। মেঘসাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসী বানাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সাহেব না কি এই সকল কথা, তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনিয়াছেন। শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইরাছেন। ব্যস্ত হইবারই কথা। হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া কুঠিরক্ষা, আত্মরক্ষা, মেঘসাহেবকে রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছেন। ধন্য—প্যারীসুন্দরী। এতবড় মোকদ্দমা মাথার উপরে, তার উপবেশে এত সাহস! এত জেদ! এতদূর চেষ্টা।

অনেক কথাবার্তার পর সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হজুর! থাকের নকসটা দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে। কি কুক্কনেই যে, আমাদ আমীর সহিত স্বর্গীয় বৃদ্ধ মীরসাহেবের বিবাদ বাধিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। দুই পুরুষ যায়। তবু বিবাদের শেষ হইল না। কত পুরুষ যে এই

বিবাদ থাকিবে ঐশ্বর জানেন। আবার এই সম্মুখেব চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত, নকসাতাব নিতান্তই দরকার হইয়াছে।

“থাকের নকসা কেন? আমি অনেকদিন হইতে ভাবিয়া স্থির কবিয়াছি, বিষয়াদিব যাবতীয় দলিল এক ফিবিস্তি কবিয়া “ভূলা মিয়াকে” বুঝাইয়া দিব। যাহাদেব কাজ তাহারা দেখে শুনে করুক। আমি আব ও ঝঙ্কাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আজ সমুদায় দলিল বুঝাইয়া দেও।”

জামাইবাবু শব্দবের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন! অস্তুরে আঘাত লাগিল। এ অস্তুর আঘাত নহে, এ ভ্রুংখের আঘাত নহে, ভক্তির সহিত প্রেমের আঘাতও নহে। এ গ্লানি! এ আত্ম-গ্লানির বিষম আঘাত।

যাহাব সর্বনাশ কবিত্তে তিনি বদ্ধপবিকব হইয়া কাষাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, যাহাব প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ কবিবাব কথা সময় সময় অতিগোপনে মুখে আনিতেছেন, অস্তুরে খন, কি ঐষদে, নিজে কি অপবের দ্বাবা, এ চিস্তাও মস্তকে আনয়ন কবিয়াছেন, যাহাব মুখ দেখিতে চক্ষু নাবাজ। তাহার এই ভাব? এমন সবল ভাব এমন প্রেমপূর্ণ—পবিত্র ভাব? কি ভালবাসাব কথা। “যাহাদেব কাজ তাহাবা করুক।” সা গোলাম অস্থির হইলেন। মনে সেই একপ্রকার নূতন ভাবেব দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী শক্তিছটা—একটি কথায়, কোথায় সবিয়া গিয়া, ভয়েব সঞ্চাব হইল, হৃদয় কাঁপিয়া গেল, অঙ্গ শিহবিয়া উঠিল, বুক শুকাইয়া দূর দূর কবিত্তে লাগিল কথাটা কি? কথা আব কিছু নহে, মীরসাহেব মাস্তনকে দলিলেব বাক্স আনিতে আদেশ কবিয়াছেন, সমুদায় দলিল এখনই জামাইবাবুকে বুঝাইয়া দিবেন।

কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা কবিত্তে পারেন যে, ও কথায় অঙ্গ শিহবিবে কেন? ভয়েবই বা সঞ্চাব হইবে কেন? জামাইবাবু, তো একপ্রকার শুভ সংবাদ, মঙ্গলের কথা—আনন্দেব কথা। তাহা নহে, পাঠক। তাহা নহে, আনন্দেব কথা নহে, সম্পূর্ণ নিবানন্দ। মহা-সঙ্কট! এবং বিষম ভয়। এখনও বুঝিতে পারেন নাই? জামাইবাবুব মুখশ্রী, বিস্মী হইয়া ধূলা উড়িবাব কারণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই! “তাহার সেই চুরি কবা বাক্স।” সেই বাক্সটিই যদি দলিলের বাক্স হয়, ঐ নিশীথ সময়ে তোষাখানাব মধ্যে হামাগুড়ি পাড়িয়া যাইয়া চুবি করা বাক্সটি যদি দলিলের বাক্স বলিয়া চিহ্নিত থাকে, তবে তো এখনই মহা-গোলযোগ উপস্থিত

হইবে, ধরা পড়িলেও পড়িতে পাবে। এই কারণে জামাইবাবু—চাবিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কত পীৰ, কত ফকিব, দববেশদিগের দবগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মানিকপীরের খাজা, বডপীরের মলিঙ্গা, মুস্কিল আসানেব রোজা, কত কি মানত কবিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাঙ্গন দলিলেব বাক্স আনিয়া মীবসাহেবেব সম্মুখে বাথিয়া দিল। জামাইবাবু বাঁচিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গা দিয়া ঘাম ছুটিল, চিন্তা-বিকার ছাড়িয়া গেল, বক্ষা পাইলেন, ধরা পড়িলেন না। কেহ কিছু জানিতেও পাবিল না। সে বাক্সের কোন কথাই উঠিল না। দলিলেব বাক্স তবে অণু বাক্স, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। আব চিন্তা কি?

মীবসাহেব বাক্স খুলিয়া থাকেব নকসাতা দেবীপ্রসাদেব হাতে দিয়া, বাক্সসমেত দলিল জামাইবাবুর সম্মুখে বাথিয়া দিলেন। এবং বলিলেন—

আপনি সমুদায় দেখিয়া আপন হাতে বাথিয়া দিন। জমিদারী সংক্রান্ত সমুদায় দলিল, ঐ বাক্সে আছে।

বিনা পবিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে. এবং অন্যায়সে, জামাইবাবুব মনেব আশা পূর্ণ হইল। মীবসাহেবেব সরল ভাব, প্রেমপূর্ণ পবিত্র ভাব, মা গোলামেব পাপময় চিব-কলুষিত, হিংসাপূর্ণ অন্তবেব দুই-দুবাশাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কবিয়া দিল।

মীবসাহেব উঠিয়া যাইবাব সময়, দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া একটু গোপন-ভাবে চুপে চুপে বলিলেন, এখনই ৮০/২০ জন লাঠিয়াল যোগাড় কবিয়া, যত শীঘ্র হয়, শালঘর মধুঘর কুঠিতে পাঠাইয়া দেও। বিশেষ দবকাব—সাহেবেবও বিশেষ অত্নবোধ।

দ্বাদশ তবঙ্গ

বিলাতী বুদ্ধি

উভয়পক্ষেবই গুপ্ত সন্ধানী, চর অলুচব, খবুবে,—সকলি আছে। সুন্দর-পুরের খবর কুঠিতে আসিতেছে, কুঠির খবর সুন্দরপুরে যাইতেছে। সাধাবণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারীসুন্দরী কিছুতেই কেনীকে ছাড়িবেন না। হাজার টাকা! কথার কথা—কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজার টাকা। যে ঐ মাথা সুন্দরপুরে

লইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐ টাকা পাইবে। মেমসাহেবকে চান—চাকরানীর জ্ঞাত। শাড়ী পরাইয়া, হাতে বালি দিয়া মনেব মত জ্বক করিবেন, দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীও কম পাত্র নহে, সেও প্যারীসুন্দরীকে কুঠিতে লইয়া যাইবাব যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? —আপন কথাই আপন মুখে প্রায়-লোকের ঠিক থাকে না। —বিশেষ বাঙ্গালী। পবেব কথাগ, কত কথাই যে, বাতাসেব আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহাব নীমা করা কঠিন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর চাবটা। মিসেস কেনী এবং কেনী, উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরেব হলে, আজ বড়ই মিশামিশ, ঘেঁষাঘেঁষি। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তবেব গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল—টেবিলেব উপর টমলটপূর্ণ একসাত্রাণ্ডি। সোডাওয়াটােব মিশ্রিত, এখনও গ্লাসেব নিম্নভাগ হইতে বৃদ্ধ উঠিতেছে, একসাব বড় ক্রমশই ফিকা হইতেছে।

কেনী, পাচারি কবিয়া বেড়াইতেছেন। দুই-তিনপাক ফিবিয়া একটু ব্রাণ্ডি মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তাব কায়া ভুলে নাই। —কেনীব মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটি চিন্তায় বহিয়াছে। অবশ্যই কোন কায়া উদ্ধাবেব জন্মই চিন্তাদেবীকে স্মরণ কবা হইয়াছে। ব্রাণ্ডিব ঢোকে ঢোকে, মনগত ভাবেব, উদয় হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমে কেনী, চিন্তা কবিসা তাহার দোষগুণ সমালোচনাব জন্মেই মস্তিষ্কের সহিত কায়া-বিবরণেব আলোচনা হইতেছে। মনেব একাগ্রতা, চিন্তাব বেগবৃদ্ধি, ভালমন্দ বিচার, পরিণাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনাব জন্মই বোধহয় অল্পমাত্রায়, ব্রাণ্ডি সেবনে মন দিয়াছেন। কাবণ ব্রাণ্ডি যে মস্তকে যাহা পায়, তাহাই বৃদ্ধি করে।

মিসেস কেনীও কিছু গবমেই আছেন। অল্প টেবিলে, শেরির বোতল খোলা রহিয়াছে। —পিয়ানোর সহিত স্তব মিলাইয়া, স্বামী-সোহাগিনী, গান ধরিয়াছেন, আবশ্যক-মত শেরির স্বাদ লইয়া রমনীহৃদয় প্রফুল্ল করিতেছেন। স্বামী-স্ত্রী এককক্ষে—আনন্দময়ী মদিবা সম্মুখে। স্ত্রী-কণ্ঠে গীত। হস্তে বাগযন্ত্র। সুরনজিত, এবং সুসজ্জিত দ্বিতলগৃহ। স্বথ-সেবা-সামগ্রী, খাদ্যাদি প্রচুর—ভাণ্ডার পূর্ণ। —স্বথের একশেষ। কিন্তু এ স্বথ-সময়ে বিলাতী দম্পতীব বদনমণ্ডল প্রফুল্লতার বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। উভয়েই আমোদপ্রমোদে, মনের

স্থখে আছেন বটে—কিন্তু আন্তরিক নহে। —ভাবে বোধ হইল যেন উভয়েরই দূরন্ত শত্রু সময়, প্রয়োজন ও কার্যগতিকে, নিতান্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়, মূল্যবান সময়কেও লোকে শত্রু মনে কবে, ইহা মিথ্যা নহে। সেই অমূল্য সময়, এইক্ষণে ইহাদের পক্ষে নিতান্তই বিষম ও কষ্টকর বোধ হইতেছে। কাণ্ড আছে!

মেঃ কেনীর চিন্তা অন্তপ্রকাবের। চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহর, মাগুরা, পাবনায়, এই তিন জেলা মাথিয়া মোকদ্দমা। আদালত ফৌজদারী। নড়ালেব বামরতন বায়, নলভান্সাব বাজা, পাংশার ভৈরববাবু, আরও কত জমিদার, তালুকদার—সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর স্তম্ভরপুর। মেমসাহেবকে লইয়া শাড়া পবাইবে। বড় শত্রু কথা। আবাব নিজের মাথার কথাটাও কম নহে। কোনদিক রক্ষা করিবেন।

মেমসাহেবের বিশ্বস্ত খানসামা হস্তে আসিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল—
“হুজুর! পাবনাব লোক ফিবিয়া আসিয়াছে।”

মেমসাহেব পিয়ানো ফেলিয়া মহাবাস্তে বাজ-আসন হইতে উঠিলেন। তাড়াতাড়ি নীচে যাওয়া পাবনাব পত্র লইলেন। নীচেবতালেতেই পত্রের লেপাফা খোলা হইল। এক লেপাফায় ছোট বড় দুইখানি কাগজ, ছোট কাগজ-খানা পাকেট পুরিয়া পত্র-হস্তে কেনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কেনী টমলট খালি করিয়া পুনরায় ব্রাণ্ড ঢালিতেছেন। পাবনাব পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা-প্রযুক্ত ব্রাণ্ডেতে সোড়া ওয়াটার না মিশাইয়াই যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস কেনীর বামহস্তে বামহস্ত বাথিয়া পত্রখানির আগা গোড়া দুই তিনবার মনে মনে পাঠ করিলেন। মুখে কথঞ্চিৎ হরিষের লক্ষণ দেখা দিল। বোধহয় কোন স্তম্ভব।

সোনাউল্লা খানসামা বিশ্বাসী ও চতুর। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন। কেনী যেদিন বেশিমানায় ব্রাণ্ড চড়াইতেন, সেদিন বিষয়াদির কাজ আফিসে গিয়া করিতেন না। এমন কি উপবতালে হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না। যদি কথা প্রকাশ হইত যে সাহেব আজ ব্রাণ্ডের বোতল খুলিয়াছেন, তবে কুঠিসমেত নীচব। কাহার মুখে উচ্চকথাটি বাহির হইত না। ভয়ে সকলের প্রাণ কাঁপিত। কেনীর আদেশ ছিল যে আমোদের সময় কোন

আমলা তাঁহার সম্মুখে না যায়। মেমসাহেবের পিয়ানোর আওয়াজ, আর গলার মিহি-স্বর শুনিয়াই কার্যাকারকগণ বুকিয়াছিলেন যে, আজ আমোদের দিন। আমাদেরও ছুটি। কেহ দাবায়, কেহ পাশার খ্যাতে বসিলেন। কেহ অন্য আমোদে মন দিলেন।

ক্রমে দিনমণি অন্ত—সম্পূর্ণ অন্ত। ঘোর সন্ধ্যা। কোথাও লণ্ঠন জ্বলিল, কোথাও প্রদীপ দেখা দিল। কোথায় কোথায় মোমবাতি শোভা পাইল, ঝাড়ে, দেয়ালে, বৈঠকি মেজে, লণ্ঠনে নিজে পুড়িয়া আমোদে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সোনাউল্লা সাহেবেব কয়েকজোড়া কাপড় তুলিয়া চিকণী, ব্রাস, গ্লাস, অল্প পবিমাণ কিছু খাদ্য পুবিয়া একটি পোর্টম্যান সাহেবেব সম্মুখে বাখিয়া দিল।

আহারের টেবিল সাজান হইয়াছে। কেনী তাড়াতাড়ি আহাবে বসিলেন। মিসেস কেনী টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহাব করিলেন না। কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লাব-মুখেব দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা যোডহাতে বলিল—

“খোদাবন্দ! পালকি বেহাবা হাজিব।” কেনী দেশলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং বলিলেন, সব ঠিক?

সোনাউল্লা পূর্নবৎ বলিল—খোদাবন্দ! সকলি ঠিক।

কেনী মুহূর্ত্তবে কয়েকটি কথা মেমসাহেবকে বলিয়া সোনাউল্লাকে বলিলেন দেখ, বাবুরচিকে গিয়ে বল, ভাল ভাল থানা তৈয়াব করিতে। আব যা যা করতে হবে মেমসাহেবের কাছে শুনবে। এই বলিয়াই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন। সিঁড়ির নিকটে পালকি, পালকিতে উঠিবার সময় কাহাকে কোন কথা বলিতে অবসব পাইলেন না। কাবণ, স্ত্রীর-মুখে গাঢ়ভাবে চুষন করিতেই অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। চুষনের স্বাদ লইয়া পালকির দরওয়াজা বন্ধ হইল। বেহারাগণ নিঃশব্দে কুঠির পশ্চাৎ দ্বার হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে চলিল।

কিছু দূর গেলেই মশাল, মশালচি, লোকজন সকলি সঙ্গে হইল। পালকি দক্ষিণদিকেই চলিল। কুঠিতে সোনাউল্লা এবং মেমসাহেব ভিন্ন, কেনীর গমন সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। জানিবার কথাও নহে।

মেমসাহেব উপরে আসিয়াই জাঁকালভাবে খানার টেবিল সাজাইতে আদেশ করিলেন। রুপার চামচ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন। সমুদায় ঝাড়ে

বাতি জ্বালান হইল। বাহিরের কাজকর্ম সমুদায় ঠিক করিয়া ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করিলেন। মনেবমত সাজশযায় অঙ্গ-সাজাইয়া ড্রেসিংরুম হইতে বাহির হইলেন। সে সময়ের ভাবই ভিন্ন - কদ ভিন্ন। বৃহদাকার আবশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেব পবিচ্ছদ-সাজেব নিজেই ভালমন্দ বিচার করিতে লাগিলেন। কোনখানে টানিয়া দিলেন। দুই একটি চুল যাহা বেকেতাভাবে কপালের কি ভ্রব উপর উড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহা হস্তদ্বারা, ত্রাসদ্বারা সোজা করিলেন। মাথা হইতে পা পর্যন্ত হেলিয়াতুলিয়া, ঝাঁকা হইয়া, পাস ফিবিয়া দেখিয়া “অল বাইট” বলিয়া জানালার দিকে মুখদিয়া ইজিচেয়াবে পূ ছড়াইয়া দিলেন। মুহূর্তকাল অতীত হইলেই দেখিতে পাইলেন যে একখানা পালকি আর জন পঞ্চাশ লোক নানাবকম পোষাক পবা, ক্রমে আফিস-দালান বাগদিকে বাহিয়া একেবাবে তাঁহাব দ্বিতল বাসঘবেব সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং পালকিব দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস কেনী আগ্রহেব সহিত ও! মিষ্টার! মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়িব নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজেব হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদানাদি কবিয়া উপবে আসিলেন। পর্দা সরাইয়া দ্বার অব্যবহৃত করিলেন। দস্তরমত পাখা চলিতে লাগিল।

মিসেস কেনী পুনরায় তাড়তাড়ি নীচে গিয়ে সাহেবেব লোকজনকে বিশেষ আদর কবিয়া নীচেবতালায় স্থান দিলেন। তাহাদের আহাবাদিব জন্ত সোনা-উল্লাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উপবে আসিলেন।

পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদেব পূর্ব-পবিচিত গ্যাজি-ষ্ট্রেট। সঙ্গেব লোকজন ইহাবাও নিবর্তক আসে নাই। উহাদেব মধ্যে দাবোগা, নায়েব দাবোগা, ববকন্দাজ—সকলি আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী। মেমসাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষেব নিম্নকুঠবিতে দারোগা, জমাদার এবং বরকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় কবিয়া দিলেন। কুঠিব অগ্ন অগ্ন চাকর, আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিগুডতত্ত্ব জানিতে পারেন নাই।

উভয়পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর্ব। কে কোন সময়ে কোন সন্ধান লইতেছে, কি কৌশলে কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে, বিশেষ সতর্কে থাকিয়াও কোনপক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। কুঠির খবর দিন

দিন স্তম্ভবপুৰে যাইতেছে। — স্তম্ভবপুৰেৰ গুপ্তচৰ সংবাদ দিয়াছে যে, কেনী আজ কুঠিতেই আছেন। আমোদে মাতিয়া আছেন। ত্ৰাণ্ডি-পানিতে মাতয়াৰা— বিভোব। মেমসাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন। হাসি-তামাসা খুব চলিতেছে—ইত্যাদি—

মিসেস কেনী আজ যে অভিনয় ভাৱ গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, কৃতকাৰ্য্য হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ভৱসা এই যে, স্বয়ং-নেতৃ—সোনাউল্লা সাহায্যকাৰী— আগন্তুক পাবনাব দল প্ৰকাশে সাহায্যকাৰী না হইলেও শাস্তিৰক্ষক, বিচাৰক। এবং প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণস্বৰূপ, পৰিদৰ্শক।

সোনাউল্লা মেমসাহেবৰ নিকট বলিল “হুজুৰ! মীৰসাহেব তাহাৰ নিতান্ত বিশ্বাসী লোকদ্বাৰা এই পত্ৰ পাঠাইয়াছেন সে আপনাব সহিত দেখা কৰিতে চাহে। পত্ৰেৰ লিখা ছাড়া আবও কি কথা আছে।”

মিসেস কেনী অতিব্ৰস্তে নাচে আসিয়া গোপালকে দেখিয়াই চিনিলেন। বলিলেন, “গোপাল! খবৰ কি?”

গোপাল সেলাম বাজাইয়া বলিল—“হুজুৰ! একশত আসিয়াছে। আব সমুদায় ঠিক। আফিসঘৰে ইহাদেব স্থান দিলে ভাল হয়।”

মিসেস কেনী আফিসঘৰেৰ দ্বাবানকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। গোপাল এবং গোপালেৰ সঙ্গিৰা আফিসঘৰে স্থান পাইল।

মিসেস কেনী মার্জিষ্ট্ৰেট সাহেবেৰ নিকট বসিয়া খোস-গল্প কৰিতেছেন। আবাব সোনাউল্লা আসিয়া কবযোড়ে বলিল—“হুজুৰ! সাত্তাল মহাশয় সাহেবেৰ নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“তুমি গিয়ে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবেৰ শরীৰ অস্থখ।”

সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূৰ্ত্তপবেই ফিৰিয়া আসিয়া বলিল—“হুজুৰ! বড় জকবী খবৰ—তিনি বলিলেন—“যদি সাহেবেৰ শরীৰ অস্থখ হইয়া থাকে তবে মেমসাহেবেৰ নিকটেই বলিতে হইবে। বড়ই জকবী কথা।”

মিসেস কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়িৰ নিকটে আসিয়া শত্ৰু সাত্তালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন—“কি কথা?”

সাত্তাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“হুজুৰ! এখনই খবৰ পাইলাম যে,

প্যাবীসুন্দরীর লাঠিয়াল সুন্দরপুর হইতে রওয়ানা হইয়াছে। ঢাল, স্ফুটিকি, লাঠি ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠিয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবেব সঙ্গে দেখা হইল না। কোন পরামর্শও কবিত্তে পারিলাম না। দিন-বুঝিয়াই সাহেবেব শরীব অস্থখ হইয়াছে, এখন উপায় কি ?

মিসেস কেনী বলিলেন—“কুটিতেও আমাব অনেক লোক আছে, ভয় কি।”

শম্ভু বলিলেন,—“ভজুর ! কুটিতে যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা কুটি রক্ষা হইতে পারে না। প্যাবীসুন্দরী এবাবে বিশেষ যোগাড় করিয়াছে। আর একটি কথা, তাহারা শুধু কুটি লুটপাট কবিয়া যাইবে না, তাহাদের মনেব ভাব ভাল নহে।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“আব কি কবিত্তে ? আমাকে সুন্দরপুবে লইয়া যাইবে। যে লোক আছে, তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আবও লোক সংগ্রহ কব। টাকায় কিনা হয়। দুই টাকাব জায়গায় চারি টাকা খবচ করলে এই রাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাইবে। যত পাব সংগ্রহ কব আমাব ভকুম।”

শম্ভু বলিলেন—“এত বাত্রে লোক পাওয়াই তো কঠিন কথা।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ ? কোথা পাইবে ? সে কি কথা ? কুটিব চাবিদিকে আমাবই প্রজা—তাহাদিগকে বেশী কবিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আসবে। যত লোক পাব, আনিয়া কুটিব চাবিদিকে খাড়া করিয়া দেও। রাত-প্রভাত ন হওয়া পর্য্যন্ত খাড়া পাহারা দিবে।”

শম্ভু সাত্তাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। মিসেস কেনী নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সাত্তাল মহাশয় বাসাদাডিতে যাইয়া প্রধান কার্য্যকাবক হবনাথ মিশ্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া লোক সংগ্রহেব জন্ত লোক মোতাইন করিলেন। ভকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে ? “ঝাকড়া চুল” লাঠিয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।

উপস্থিত বিপদে আবশ্যকমতে সাহায্য করিবে এই আশ্রয়েই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজাদিগকে আনিতে আদেশ ও রাত্রি-জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থ-ই অনর্থের মূল, স্বার্থ-ই দুর্দশার সোপান, জগতে স্বার্থ-ই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনই বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে কবিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোকদিয়াই স্বদেশীয়ের সর্বস্বান্ত কবিতেন। রাত্র জাগবণে প্রজার কষ্ট হইবে, মেদিকেও মিসেস কেনই লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি হইবে? কার্যাকর্তা বাঙ্গালী—অধীন চাকরগণ বাঙ্গালী, কিন্তু স্বার্থের দাস। দ্বিগুণ পাবিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ করার আদেশ! এখন দেশের লোকেব হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের কি প্রকারে দুর্দশা ঘটে—দেখন।

লোক সংগ্রহকারীরা মেলাম ঠিকিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ কবিল। দেওয়ানের হুকুম কার সাধ্য আর বাত্রে ঘবে থাকিতে পারে? নিদ্রাত্যাগ করিয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব কবিল, কি শব্দই অস্বস্ত—অস্বস্ত হেতু কুঠিৰ পাহাৰায় যাঠিতে নাবাজ হইল, তাহাব ভাগো যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণাব দায়ে, প্রাণেব ভয়ে, অপমানের ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীব প্রেবিত লাঠিয়ালেব সঙ্গি হইল। যাহাবা দুই চাবি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহাবা আব আসিল না। যাহাদেব পয়সা দিবার শক্তি নাই, বাধা হইয়া যাঠিতে প্রস্তুত হইল। কুঠি রক্ষার্থে চলিল কাহাবা? যাহাদেব পেটে অন্ন নাই, সংসাবে কষ্টেব সীমা নাই। কোথায় যাঠিতে হইবে, কি কাষা কবিত্তে হইবে, কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনাপরাধে লাথি, কিল, চড মাবে, সেকথা জিজ্ঞাসা কবিবাব সাধ্য নাই। অনেকেই সাবাদিন নৌলজমিব কাবকিদ কবিয়া বাড়ি আসিয়াছে। নিজেব জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদেব ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, বোদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক “জো” সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নৌলজমি ফেলিয়া ধানেব আবাদ করিতে পারে। আগে নৌল পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শস্ত বপনোপযোগী জমি প্রস্তুত কবিত্তে বিল্ল, বুনিত্তে বাধা, কব দিত্তেও অক্ষম। কাজেই খাবাব সংস্থান অনেকেবই নাই।

বাড়ি আসিয়া কেহ আধপেটা আহাৰ কবিয়াই কুহকিনী-নিশার কুহকে পড়িয়া মাতিয়াছে। কেহ অনাহাবেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। অল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ জন্ত একমুঠো অন্নও অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। যাহা ছিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি দিনেরবেলা নিরন্তে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই মায়ের অঞ্চল

ধরিয়া কান্দিয়াছে। মাঘের প্রাণ। যাহা ঘবে ছিল, তাহাই সিদ্ধ-পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তম সন্তান-সন্ততিগণের মুখে শুধু চুনভাত দিয়া তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। ইাড়িতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলেমেয়েরাই আর কিছু খাইতে পাবিত। কি কবে সজল-নয়নে কৃষকপত্নী ইাড়ি-আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীকে জ্ঞাত রাখিয়া দিয়া স্বামীগত প্রাণাপত্তী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া বহিয়াছে। স্বামী সাবাদিন নীলকুঠির কাজ করিয়া বাট আসিয়াছে, ছেলেমেয়ে দিনে খেতে পায় নাই। —সন্ধ্যাবেলাও ভবপেট হয় নাই। জীব মুখে খবব শুনিয়া অব সে পোড়াভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। ঈশ্বর ভবসা। —মহা জনের বাড়িতে গিয়া দ্বিগুণ তৃগুণ লাভ-স্বীকারে ধান কর্জ করিয়া আনিবেন তাহাবও সময় নাই। বাক্ত-প্রভাত হইতে না হইতেই আমিন, খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। নীলজমির কাবকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত কবে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পাবিলে সে, যমদূতগণের হাত হইতে বক্ষা পাইতে পাবে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দু-এক পয়সার জলপানই পূর্ণ আহার—পরিশ্রমেব ইতি নাই—নিদ্রাদেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক বা না থাক, বালিশে মাথা পড়ুক বা না পড়ুক, ঘুমের ঘোবে সকলেই কাতর। তাহার উপর এই দৌবায়া। যাহাবা দুই-একআনা দিতে পাবিল, তাহাবা কিল লাগি খাইয়া বক্ষা পাইল। যাহাদের দিবার শক্তি হইল না, তাহারা কুঠি পাহাবা দিতে চলিল। হাং বে বঙ্গ! হাং বে নীলকর! হাং বে স্বদেশীয়!

মিসেস কেনী পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বাক্ত-প্রভাত হইতেই কুঠি আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন, তাহাতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে। ভ্রমে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথাটা কাটা যায়, তবে কেনীর মনস্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। প্যারী-সুন্দরীর সর্বসান্ত, কেনীর জয় জয় আনন্দ। কুঠি ছাড়িয়া গুপ্তভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই।

মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট—শান্তিরক্ষকগণ-সহ রক্ষার জ্ঞাত

উপস্থিত, কঠিব লোকজনও সতর্কিত, বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থির, মহাঅস্থির! আজ বাত্রে নিদ্রার সহিত তাহার দেখা নাই। কি জানি কি হয়। বিপদ সম্ভাবনায় অবশ্যই অধিক ভয়, ঘটনাচক্রে কোথায় লইয়া ফেলে, কি ঘটে কি হয় সমুদায় ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। কাজেই অস্থির—কাজেই চঞ্চল। —কাজেই চিন্তা, কাজেই অ'কুল।

উষাদূত-কুকুট বাত্রে শেষ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিল। পাখিরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া ডালে বসে নাই। প্রভাতী গানেও জগৎ মাতায় নাই। দ্যামেষের সত্যনাম ঘোষণা করে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস কেনী গোবগেব ডাকেব দিকেই মন দিয়াছেন; এক ডাক, ক্রমে তিন-চারি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবও একপ্রকার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। একরূপ শব্দ আব একদিন তিনি শুনিয়াছিলেন। সেই ডাক, সেই ভীষণ বব। শরীয় বোমাক্ষিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী, ক্রমেই বেশী আতঙ্ক। ব্যস্তভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেব কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে ছিলেন। মিসেস কেনী'র গলার স্বর শুনিয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দ্বাব খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাপাব কি?”

পাঠক! এইস্থানে লিখক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অস্বাভাবিক দোষের পোষকতা হেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস কেনী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয় ভাষাতেই কথাবলা যুক্তি সঙ্গত। আপনাদের অন্তবিধা ও শ্রুতিকণ্ঠের হইবে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।

মিসেস কেনী বলিলেন—“শুনিতেন না?”

ম্যাজিষ্ট্রেট—“কৈ আমি তো কিছুই শুনিতো পাইতেছি না।”

মিসেস—‘ঐ শুনুন, বিপক্ষদল নিকটবর্তী! বাঙ্গালী বিক্রমের ঐ শব্দ! প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ একরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সেদিনও আসিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট—“কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিন্তভাবে আপন কামরায়

থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গভর্নমেন্টের বাজ্য—আমি ব্রিটিশ গবর্নরের পক্ষের লোক। আমি থাকিতে আপনাব কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।”

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপন পরিচ্ছদ লইয়া জোবপায়ে নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিমপারে আসিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারোগা, জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবেব আদেশে কোমর বান্ধিলেন, কিন্তু ঘবেব বাহিব হইলেন না। কুঠির-হাতায় প্রবেশ করিলেই গ্রেপ্তার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা,—ঘটিলও তাহাই।

এখনও রাত্র-প্রভাত হয় নাই, উষা দেখা দেয় নাই—তাবাদল লইয়া তারা-পতি এখনও স্ব-স্থানে চলিয়া যান নাই। একে একে যাইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণ-রূপে চক্ষের আড়াল হন নাই। আবার সেই হো হো শব্দ। সেই ঝ ঝ শব্দ! সেই হৃদয়-কম্পিত, দেহ-কম্পিত শব্দ—ভীষণ বব মেমসাহেবেব কণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ দক্ষিণেও ঐ।

বামলোচন এদ্যাবে বিশেষ যোগাড করিয়াছেন। কুঠির পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয়দিক হইতে কুঠি আক্রমণেব যোগাড। মিসেস কেনী, দুইদিকে দুইপ্রকার শব্দ শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। নিমকহালাল চাকর সোনাউল্লাহ চক্ষে নিদ্রা নাই। কি হইল? —একি ব্যাপার? সাহেব কুঠিতে নাই, একি কাণ্ড। এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মহা-অস্থির। একবার নীচে একবার উপরে যাইতেছে। ক্রমে কুঠির নেগাহবান সর্দারগণও জাগিয়া উঠিল—ঢাল, মডকি, লাঠি লইয়া সকলেই খাড়া হইল।

সোনাউল্লাহ সিঁড়ির নিকটে মেমসাহেবকে পাঠিয়া বলিল, “ভজুব। মীব-সাহেবেব চাকর গোপাল সর্দার ছজুরে সেলাম দিতে চায়।”

বোধহয় পাঠকগণেব মনে নাই—মনে করিষা দিতেছি। মীরসাহেব আমবাগানের নিকট কেনীব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিষা যে লাঠিয়াল জোটাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেই আদেশেই সর্দারগোপাল একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। আফিসঘবে স্থান পাইয়াছে।

মিসেস কেনী বলিলেন—“গোপাল। তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর।

কুঠির লাঠিয়ালেবা কুঠি রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীবা লাঠিয়ালেব সম্মুখীন হইয়া লাঠি মাঝিবে—তুমি আমাকে রক্ষা কব।’

পুনর্বার দক্ষিণদিকে পূর্ববৎ শব্দ হইল—গোপাল বলিল—ভ্জুর! প্যারী-সুন্দরীবা লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুইদিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণদিকে কোন বাধা নাই। পশ্চিমে নদী—বেশী জল—অধিক পবিমান পবিসর না হইলেও নদী—কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পুরেও তাহাই। পূর্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণদিক হইতেই পূর্বদিকে যাইবার পথ। এখন দক্ষিণ-দিক না ঠেকাইলে কুঠি রক্ষা কবা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে নদী—জল কম হইলেও তরাচ ঐদিক হইতে *ক্রন্দন আসিতে যত বিলম্ব হইবে, দক্ষিণদিক হইতে আসিতে তত বিলম্ব হইবে না। আমি দক্ষিণদিকেই চলিলাম। ভ্জুর! অব বিলম্ব করিতে পাবি না। —এই পর্যন্ত বলিয়া গোপাল মেমসাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কুঠির নিযুক্তির লাঠিয়ালেবা ও ডাক ভাঙ্গিয়া কুঠির পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহের পশ্চিমদিকে ‘আনি’ বাধিয়া দাড়াইল। কত লোক কুঠির উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বাৰে ঢাল, তববাব বাধিয়া খাড়া হইল। এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপাল সন্দের আপন বেবাদবীদিগকে বলিল “দক্ষিণে এত আলো কিসেব?”

সকলেই দেখিল অনেকব হাতেই মশাল। মশালের আলোতে আরও দেখা গেল, সড়কিব অগ্রভাগেব চাকচিক্য, লাঠির দীঘতা, কোমববান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা, বাঙ্গালাব যোধ, অগণ্য লাঠিয়াল দেখিতে দেখিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসব হইতেছে।

কালীগঙ্গাব পশ্চিম পারেও ঐরূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব,—মাঝে মাঝে ভয়ানক চীৎকার,—দেখিতে দেখিতে কালীগঙ্গাব পশ্চিমতট আলোক-মালায় পরিশোভিত হইল—জলে-স্থলে জলন্ত মশালের শিখা অধো-উর্দ্ধভাবে প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে ছলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য! সে স্তূদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। উষাদেবী পূর্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীবা লাঠিয়ালেবা ‘মার মার’ শব্দে গঙ্গাজলে

ঝাঁপ দিয়া বীরত্বের শেষ, সাহসের শেষ, কাষের শেষ দেখাইয়া মহাতেজে কুঠি
অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠির সকলেই জাগিয়াছে। — মুছুদৌ, দেওয়ান, নায়েব, পেষকার, ইত্যাদি
আমলাগণ, লাঠিয়ালগণেব হু-হুকাবে ভীষণ চীৎকারে জাগিয়াছেন, কুঠিব
লাঠিয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উত্তরদিকে প্রবেশদ্বারে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল।
প্রায় শতাধিক লাঠিয়াল নদীৰ পূর্বপারে দাঁড়াইয়া জনস্ত শত্রুদলের আগমনে বাধা
দিতে লাগিল।

প্যাবীসুন্দরীর কড়া-ভকুম। কার্য্য উদ্ধাব কবিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কাব
আছে। তাহারপর এক হাজাব টাকা অতিরিক্ত। যে সেইকাজ পারিবে, তাহার
ভাগ্যেই হাজাব—সে হাজাব কাহাব ভাগো আছে তাহা কেহই জানে না। কিন্তু
আশা আছে আমি পাইব।

বে টাকা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পবেব জন্ত, পরেব প্রয়োজনীয় মাথার
জন্ত জলে ঝাঁপ, সম্মুখ-শত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষবিস্তার, লাঠিবতলে মস্তকদান। রে
টাকা! তোর জন্তই কেনীর বিলাত পবিত্র্যগ। তোব জন্তই নীলের ব্যবসা।
জমিদাবেব পতন। তোব জন্তই নিবীহ বক্ষেব প্রজাব প্রতি অত্যাচার—পিশাচি!
তোব জন্ত আজ এই বাঙ্গালী যুদ্ধ। পবিনামকল ভবিষ্যৎ গর্ভে। জয়-পরাজয়
অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি। জয় পক্ষেও তুমি তোমাবই জয়, জগতে
তোমারই জয়!

প্যাবীসুন্দরীর পক্ষেব লোকেরা পূর্বেই স্থির পরামর্শ ছিল যে, পশ্চিম-দক্ষিণ
উভয়দিক হইতেই কুঠি আক্রমণ কবিলে। কবিলও তাহাই।

দক্ষিণদিকে গোপাল—গোপালেব দলেব সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং
গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গিরাও বাছা বাছা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠি,
সড়কি সমানভাবে চলিতেছে। প্যাবীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা—একপাও অগ্রে
বাডিতে পারিতেছে না। যেখানে বাধা সেইখানেই দণ্ডায়মান।

এদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ভিন্নপ্রকার কাণ্ড। একদল জলে ঝাঁপাইয়া
ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপরপক্ষে উপর হইতে লাঠি-
দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিবে? দক্ষিণে
ফিরাইতে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠিয়ালদিগকে

ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। আব কতক্ষণ—মাথা-ভাঙ্গা, পা-ভাঙ্গা, মাজা-ভাঙ্গা, হাত-ভাঙ্গা, হইয়া পিঠ দেখাইল। লাঠি, মডকি ফেলিয়া কেনীর দ্বিতল শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। —ছুটিল তো ত্রাসে একেবাবেই ছুটিল। কে কোন্ পথে কোথায় পালাইল তাহাব খবর আব কে করে? কিন্তু সেসময় সন্ধান করিলে বাবুরচিখানায়, ঘোড়ার আস্তাবলে, নীল হাউজেব মধ্যে, জাঁতঘরের জাঁতের নীচে অবশ্যই অনেককে পাওয়া যাইত। দেওয়ানজীর আদেশে আবাব বেশী পরিমাণ লাঠিয়াল, কুঠিব পশ্চিমে কালীগঙ্গা-তীবে ডাকে-ইঁকে বিক্রমে উপস্থিত হইয়া প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়াল প্রতি লাঠি ঝাড়িতে লাগিল। জল হইতে তাহারা আর ভাঙ্গায় না উঠিতে পাবে। কুঠি আক্রমণ করা দুবে থাকক কুঠিব সীমায় পা ধরিতে না পাবে, তাহাবই চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার সাধা আজ প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়ালগণকে বাধা দেয়? কার সাধা তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায়? কালীগঙ্গাজলে—লাঠিয়াল পূর্বতীবে কেনীব লাঠিয়াল—পশ্চিমতীবে প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়াল, ক্রমাগত আসিয়া জুটিতেছে। আব ডাক ভাঙ্গিয়া ‘আলী আলী’ শব্দ কবিত্তে কবিত্তে জল পড়িতেছে। কয়েকজনকে কয় হাতে বাধা দিবে? মাথা কাটিল, জলে ডুবিল, হাবুডুবু খাইয়া আবাব উঠিল। একদিক এইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু বামদিক হইতে জল সাঁতরাইয়া ‘মার মার’ শব্দে লাঠিয়ালগণ কেনীর লাঠিয়ালদিগকে ঘিরিয়া লাঠিবাজির প্রতিশোধ আবস্ত করিল। কুঠির দক্ষিণদিকে ও খবর গোল। —পূর্বেই বলা হইয়াছে প্যারীসুন্দরীব কতক লাঠিয়াল দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া পশ্চিম, পূর্ব এই দুইদিক হইতে একে বারে আক্রমণ কবিবে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীরসাহেব প্রেবিত লাঠিয়ালগণ দক্ষিণ-দিক রক্ষা করিতেছে, গোপাল স্বয়ং লাঠি ধবিয়াছে।

নদীতীবে এখন আব লাঠির ঠকাঠক শব্দ হইতেছে না। —কাবণ কুঠির লাঠিয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পিঠটান দিয়াছে। —আব কোন বাধা নাই। প্যারীসুন্দরীব কতক লাঠিয়াল ‘মার মার’ শব্দে কেনীর শয়নঘরের সম্মুখে আঙ্গিনায় আসিয়া কেনীর নাম ধবিয়া বেজায় গালাগালি দিতে আবস্ত করিল।

আয়, নামিয়া আয়! দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ-বাচ্চা হও —বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করো না যে দালানের কপাট এঁটে বাঁচতে পারবে। পঞ্চাশ-তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও,

আজ খালি হাতে যাবার লোক নাই। তোমার মাথা হাতে হাতে সুন্দরপুর যাইবে। বাহিব হও, শীঘ্র বাহির হও।

মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নানাপ্রকার সাস্ত্যনা বাক্য বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই।—ঐ লাঠিয়ালেরা আব একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়াও করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

মুখেব কথা মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে একেবারে সিঁড়িব নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল। এমন সময় লালপাগড়িধারা কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া ‘পাকড়ো পাকড়ো’ শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আবহু করিল।

লাঠিয়ালের ১ক্ষে লালপাগড়ি বড়ই মাঝাক অস্ত্র, বড়ই ভয়ের কাবণ। —নামডাকেব লাঠিয়াল হইলেও লালপাগড়িব নিকট মাথা হেঁট।

লালপাগড়ি দেখিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূৰ্ব্ভাব অনেক পরিবর্তন হইল। স্পষ্ট বলিতে লাগিল। যা থাকে কপালে হইবে আগে ধব বেটাকে। এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল। —পিছে হটিল। ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল। ও তো কেনী সাহেব নহে? আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি, কখনই ও কেনী নহে।

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কাবণ লালপাগড়িওয়াল সেপাই সাহেবরা ‘পাকড়ো পাকড়ো’ বলিয়া বেগে ছুটিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও স্বীয়দলের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া ঐ বোল ‘পাকড়ো’, দারোগা, জলদি পাকড়ো, লোককো হাতকোড়ি লাগাও—

লাঠিয়ালেরা বলিতে লাগিল। “আজ মাঝা গিয়াছি। ধরা পড়িলাম। এতদিনের পবে মাঝা পড়িলাম। আর দেখ কি, ও কেনী নহে! আমি ভাল করিয়া চিনি, ইনিই সেই ম্যাজিষ্ট্রেট—”

ইহারাও ‘পাকড়ো পাকড়ো’ করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু একজনকেও পাকড়াতে পাচ্ছেন না। পিছে হটিয়াই নদীতীর পর্যন্ত চলিয়া গেল। লালপাগড়িধার সেপাই সাহেবেরা মুখে ‘পাকড়ো পাকড়ো’ করিতেছেন, পাকড়া করিবার জ্ঞাত হাত বাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাদের লাঠির নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

তাগড়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল—সেপাই সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে ‘ডিক্রি লাও ডিক্রি লাও’ বলিয়া টেঁচাইতে টেঁচাইতে তাহারা নদী পার হইয়া কালীগঙ্গার পশ্চিমতীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। পিঠ দেখাইয়া দৌড়িল না। সকলেই দাঁড়াইল এবং সাহেবকে বলিতে লগিল। ‘হজুর! আপনি রাজা—আপনি দেশের বাদশা! আমরা তাবেদার, চাকর, গোলাম, নফর—দয়া করে আমাদেরকে মাপ করিবেন।’ হজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। —

ঘোড়হাতে লাঠিয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং দারোগা জমাদার নদীপারের নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেই কথা—সেই বুলি—নৌকা পশ্চিমতীরে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়ায় উঠিয়াই দারোগা মাহাম্মদ বক্সকে বলিলেন—“কি কর তোমরা কর কি? একজনকেও ধরিতে পারিলে না?”

লাঠিয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে ক্রমে পিছে হটিতেছে। ইহা বাও অগ্রসব হইতেছেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মাহাম্মদ বক্স দারোগা বলিল—“হজুর! লাঠিয়াল গ্রেফতার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দিবে, তাহার পাছে পাছে ঘোড়া উঠাইবেন।”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাবিরক্ত হইয়া দারোগাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, এত বরকন্দাজ, এত চৌকিদার, কেনীষ এত লোকজন থাকিতে উহাদের একগাছা সডকি, কি একখানা লাঠি ধরিতে পারিলে না? লাঠিয়াল গ্রেফতার করা তোমার কাজ নহে।

লাঠিয়ালদল হইতে একজন হাতযোড় করিয়া গলায় কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল—“ধর্মাবতার! আজ ফিরিয়া যাউন। দারোগা সাহেবকেও ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্মাবতার! ফিরিয়া যাউন, একজনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর! হজুরের সাহায্যে আজ বাঁচিয়াছে! হজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা স্তম্ভের পুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্মাবতার! ঘোড়হস্তে বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন।

আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারোগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন আমরাও ফিরিয়া বাইতেছি।

সাহেব শুনিলেন না। বেশীর ভাগ, ডায়, গুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিলেন এবং মাহাম্মদ বক্সকেও যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। জমাদার বরকন্দাজ কেহই বাকি রহিল না।

মাহাম্মদ বক্স নিরুপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারগণও ‘ধর ধর’ রব করিতে করিতে দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

পর্যায়ীস্বন্দরীর লাঠিয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, “ধম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না। আজ ছাড়িয়া দিন। যোড-হাতে গলায় কাপড় লইয়া বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ-প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও ধরিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্তে বাইয়া একেবারে লাঠিয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।

লাঠিয়ালগণ মধ্য হইতে উচ্চৈশ্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া তখনি আনি বাকিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল। “ভাই সকল! আর দেখ কি? বাঁচিবার আশা তো নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন শুনিতেছেন না, আমাদের কথা মানিতেছেন না। এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাহার মত ফিরিল না, তখন জ্বীলোকের গায় কান্দাকাটি করিয়া মরি কেন? ধর দারোগা! ধর জমাদার বরকন্দাজ—নে মাথা, নে ঐ বেটার মাথা—একে একে দেখাইয়া দেই। আয় আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা—দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা! কেনীর গোলাম। হারামখোর আয়! ধর দেখি কাকে ধরিবি। আয়!”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মাহাম্মদ বক্সকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। “পাকড়ো পাকড়ো, পাকড়ো ডাকু লোককে পাকড়ো।”

মাহাম্মদ বক্স সাহেবের আজ্ঞায় একটু অগ্রসর হইলেনই মাজিষ্ট্রেট সাহেব

দেখিলেন যে, একজন লাঠিয়াল ঢাল মাথায় করিয়া ‘খি খি’ শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মাহাম্মদ বক্সের বক্ষে সড়কি মারিয়া পিঠ পার করিয়া দিল। পলক ফেলিতে ফেলিতে আট গাছি সড়কি মাহাম্মদ বক্সের বুক, পেট পার হইয়া রক্ত মুখে বাহির হইল। অল্প দিকে আর একটি বরকন্দাজের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলের কাছে, কিন্তু চক্ষু সকলের অগ্রে-চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজর পড়িল—তিন, চারগাছা সড়কি তাঁহার মস্তক, বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব, মাহাম্মদ বক্সের অবস্থা দেখিয়াই একপ্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোনদিকে কোন পথে যাইবেন, পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লাঠিয়ালের হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভাবনাই অধিক। সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্রুকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চম্পট দিলেন না—প্রস্থানও করিলেন না রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না। আত্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের পলকে বাতাসের আগে আগে উড়িয়া বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদারেরা লাঠিয়ালদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহারিও আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ লাঠিয়ালেরা ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কির আগাস গাঁথিয়া ডাক ভাঙিতে ভাঙিতে ‘মার মার’ শব্দে চলিয়া গেল। যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল। দারোগার লাস লইয়া চলিয়া গেল।

মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ প্যারীসুন্দরীর ভারলের কাছারিতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন—‘সর্ব্বনাশ দারোগাখুন! বড় ভয়ানক কথা।’

লাঠিয়ালেরা বলিল, “দারোগাখুন সহজ কথা! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম যে কাদে আমাদিগকে আজ আপনি ফেলিয়াছেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি প্রাণের দায় মহাদায়! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারোগার দশা সাহেব স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাততঃ রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়াছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি হজুরে হাজির

হইব। নতুবা এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম। এই কথা বলিয়াই লাঠিয়ালেরা ঢাল, সড়কি ফেলিয়া তখন চলিয়া গেল। কাছারি আসিনায় দারোগার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

কাযাকারক মহাশয় কি করিবেন, কোথাকাব খুন কোথায় আশিয়া পড়িল। কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহাবা তো চম্পট। তাহাদের বাড়ি কোথা? কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা।

মাহাম্মদ বক্সের শরীর সহস্রথাণ্ডে খাণ্ডিত হইয়া চাপাইগাছি বিলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল—কোথায় কোন মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কাল মাহাম্মদ বক্স পাবনা—আজ মংস্ত্র-কচ্ছপের উদরে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠিতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার-কোলে অচেতন হন নাই। ভাবটা অচেতনেব। মনে মনে নানাচিন্তা, মাহাম্মদ বক্সের পরিণাম দশা—পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। চাকুবীর দায়ে প্রাণ বিয়োগ—কি উপায়ে অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন, বোধহয় এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পবে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি সাক্ষ্য লোকজন আসিয়া জুটিল—সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। “মাহাম্মদ বক্সের লাস কি হইল?”

জমাদার উত্তর করিল—ধম্মাবতার! লাস শূন্যে শূন্যে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা কবিয়া কুঠিব হেফাজতে জমাদার বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন বাখিয়া, তখন জিলায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। না—তখনই চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

হাত বাজ

যাহার জন্ত চিন্তা—দিনরাত চিন্তা, কত কৌশল, কত পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন, অধিকন্তু আরও শ্রম চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা আর কিছুই করিতে হইল না। নিকটকে, সমুদায় দলিল-দস্তাবেজ সা গোলাজের হস্তগত হইল।

খুসির সীমা নাই। অছিয়তনামা যে বাস্কি ছিল, সে বাস্কিটিও চুরি করিয়াছেন। কিন্তু স্বযোগ ও সময়াভাবে বাস্কিটি খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এখন কি প্রকারে যথার্থ অছিয়তনামার লিখিত স্তম্ভ ও নির্দিষ্ট অংশ বদলাইয়া জাল অছিয়তনামা প্রস্তুত করিবেন, এই চিন্তাই সা গোলামের মাথায় ঘুরিতে লাগিল। রাত্রে দেবীপ্রসাদের বাটিতে যাইবেন। অছিয়তনামার বাস্কিটিও সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবীপ্রসাদের সম্মুখে খুলিয়া অছিয়তনামা হইতে কোন কোন কথা পরিবর্তন করিয়া কি কি কথা বসাইতে হইবে তাহার পরামর্শ যুক্তি অণুই করিবেন। অছিয়তনামা ত্বরন্ত না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকিবেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে নিজমুক্তি ধারণ করিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা-ক্রমেই ঘোর অন্ধকার—রজনী সমাগত। কাহাকে হাসাইতে কাহাকে কান্দাইতে রজনী সমাগত। সংসারী মাত্রই সংসারের কার্য্য হইতে অবসব লইয়া বিশ্রাম, আরাম, ঈগরে মন-নিবেশ করিলেন। মীবসাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মোসাহেব বসীরুদ্দিনকে লইয়া গান বাজ, হাসি-তামাসায় মন দিলেন। সা গোলাম আহা করিয়া সকালে সকালেই নিদ্রারভান করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। বাড়ির অন্তলোক ক্রমে আহালাদি করিয়া আপন আপন নির্দিষ্ট বিশ্রামস্থানে চলিয়া গেলে—সা গোলাম উঠিলেন, এবং তাহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, “আমি বিশেষ আবশ্যক জন্ত বাহিরে যাইতেছি। আসিতে বিলম্ব হইবে।”

সা গোলামের স্ত্রী পূর্ক হইতেই স্বামীব চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন। কোন উত্তর করিলেন না।

সা গোলাম বিশেষ গোপনে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। চুরি করা হাত বাস্কিটিও সঙ্গে লইলেন। বাড়ির বাহির হইতেই হাঁচি, টিকটিকি সকলি পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃকপাতও করিলেন না। মাথায় চাদর জড়াইয়া, বাস্কি বগলে দাবিয়া দেবীপ্রসাদের বাটিতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপ্রসাদের চবিত্র ভাল ছিল না। সে সময় কেন অতি বুদ্ধারস্বাতেও নিশাচরের আয় বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময়ে অনেক স্থানে ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তত্রাচ স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। দেবী—দিক্খি মাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় সা গোলামকে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। এবং মায়া জানাইয়া ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন—

“আপনি কি পাগল হইয়াছেন? একা একা এতরাঞ্জে বাটির বাহির হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই? আপনার পায় পায় শত্রু, সর্বদা সাবধান সতর্কে থাকি। রাত-দুপুর সময় একা, কি আশ্চর্য্য!”

স। গোলাম বলিলেন—“কি করি যে বোকা মাথায় করিয়াছি, ভালয় ভালয় নামাইতে পারিলে হয়। কিছুতেই মনের শাস্তি নাই!”

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“নূতন আর কি কথা আছে যে, এতরাঞ্জে?”

“না থাকিলে কি আসিয়াছি? এই দেখুন সেই অছিয়তনামার বাস্ক। যদি খুলিতে পারি খুলিব না হয় ভাঙ্গিব। অছিয়তনামা দেখিয়া কোথায় কি পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে বলিতে হইবে।”

“এ বাস্ক কাহার? এত মীরসাহেবের বাস্ক নয়।”

“বলেন কি? সেই বাস্ক। আমি বহু পরিশ্রমে এই বাস্ক হাতে পাইয়াছি।”

“তা যাইহউক, না খুলিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এই দেখুন না ইহার নীচে কুইধরা। মীরসাহেব এই বাস্কে অছিয়তনামা রাখিয়াছেন, আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

“এখনি দেখিবেন! এখনি সন্দেহ দূর হইবে। এই দেখুন আমি আপনার সম্মুখেই খুলিতেছি।”

এক গোছা চাবি বাহির করিয়া স। গোলাম কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। এসকল চাবি অনেকবাব লাগাইয়া দেখিয়াছেন। তত্রাচ দেবীপ্রসাদের সম্মুখে এক এক করিয়া লাগাইয়া দেখিলেন। একটিও লাগিল না। বাস্কও খুলিল না। শেষে বাস্ক ভাঙ্গাই স্থির হইল। দেবীপ্রসাদ একখানি “দা” আনিয়া দিলেন। স। গোলাম অতি কষ্টে বাস্কটি ভাঙ্গিয়া যাহা দেখিলে, এবং যাহা পাইলেন, তাহাতে আর মুখে কথা সরিল না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“সাহেব! দেখিলেন! বাস্কে কি আছে! “কাগজপত্রের নামও নাই। একদলা কুইর মাটি। বোধহয় বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র কুইতে থাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে। বাস্কের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন। তলাতেও স্থানে স্থানে ছিন্ন, স। গোলামের

মুখেরভাব এক আকৃতিতে বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি এ জগতে 'নাই দেহটা' যেন অকারণে পড়িয়া আছে। এক প্রকার সংজ্ঞাহীন—কঁত কঁটে, কঁত পরিশ্রমে, যে চুরি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন সাংঘাতিক বেদনা তাহার জীবনে অমুভব করেন নাই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“আর চিন্তা করিয়া কি করিবেন এবারেও ঠিকিয়াছেন। সন্ধানী যথার্থ সন্ধান দিতে পারেন নাই।”

“কিসে যে কি হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? যে এই বাক্সের সন্ধান দিয়াছিল, সে মিছে বলিবার লোক নয়।”

“সন্ধানীর দোষ না হইতে পাবে, আপা-হ আন্ধারে ডুল করিয়াছেন! সোনা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।”

স। গোলাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া মূহুরবে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হইল। বোধ হয় আমিই ডুল করিয়াছি। যাহাহউক রাত্রিও অধিক হইয়াছে, আজকার মত বিদায় হই।

এই বলিয়া স। গোলাম যতনের ধন বাক্সটি বগলে করিয়া উঠিলেন। দেবী-প্রসাদও বক্ষা পাইলেন। তাহার প্রাণে ভবসার জন গড়াইতে লাগিল। স। গোলামের প্রস্থান তাহার গমন—

স। গোলাম ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটেই গৌরীন্দী, গৌরীর শ্রোত অবিরত বেগে কুমারখালির দিকে যাইতেছে। নদীতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাক্সটি গোপনে লইয়া আসিয়াছি—আবার এ ভাঙ্গা-বাক্স ফিরাইয়া লইয়া কি করিব। এই বলিয়া বাক্সটি গৌরীগর্ভে ফেলিয়া দিলেন এবং ভাবিতে ভাবিতে বাটি আসিয়া বিছানায় পড়িলেন। বালিসে মাথা দিলেন।

মৌবসাহেবের আমোদ তখনও শেষ হয় নাই। বসীকুদ্দিন মাথায় পাগ বাধিয়া হাতে চামর ধরিয়া জারী আরম্ভ করিয়াছেন।

চতুর্দশ 'তরঙ্গ

মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রা

টি. আই. কেনী. মাগুরা হইতে আসিয়া কুঠির অবস্থা সমুদায় শুনিলেন। কারোগার লাস পাওয়া যায় নাই, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাজিষ্ট্রেট

সাহেবের বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—দারোগার লাস ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অত্যাচার হইয়াছে। মোকদ্দমাটি মাটি হইয়াছে। যাহা-হউক কিছুদিনের জন্য প্যারীসুন্দরী মাথা নোয়াইয়া থাকিবেন। কুঠি লুটের মোকদ্দমা এ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। তাহার পর আবার এই ঘটনা। এ মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের তত আবশ্যক হইবে না। স্বয়ং মাজিস্ট্রেট সাক্ষী। প্যারীসুন্দরীকে জব্দ করিতে আব বেশি চেষ্টা করিতে হইবে না। কোম্পানী বাহাদুরই এখন বাদী। দারগা খুন, কম কথা নয়। মোকদ্দমার খোজ খবর রাখা তদন্ত করা, আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য। নায়েব, দেওয়ান যাহাকে যাহা বলা আবশ্যক মনে করিলেন বলিয়া “প্রাইভেট ক্রমে” গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন। মামলা-মোকদ্দমা বিষয়াদি এবং নীল বেশমের অধিক আবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা ও মনে মনে বাদানুবাদ করিয়া যাহা স্থির করিলেন মনেই রাখিলেন। এসকল চিন্তার পর একটি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্কের পব সাব্যস্ত হইল। মিসেস কেনীকে আপাততঃ বিলাত পাঠান কর্তব্য। মেমসাহেবকে স্থানান্তর করিলে প্রধান একটি চিন্তা হইতে অবসর হওয়া যাইবে। বিশেষ—অন্য আর একটি চিন্তারও সুবিধা হইবে।

কেনী মনে মনে “মনের কথা” স্থগিত করিয়া মেমসাহেবের নিকট বলিলেন। “প্যারীসুন্দরীর টাকা অনেক, জমিদারীও আমার অপেক্ষা অনেক বেশি, বুদ্ধিও বেশি, সাহসও বেশি। জমিদাবেব মেয়ে জমিদাব, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। সে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দুবার তিনবার ঠাকিলে কি ফেল করিলে, পারিয়া না উঠিলে যে কখনই পারিবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।”

সেখানে অন্য লোক আব কেহই ছিল না। তত্ৰাচ কেনী, মিসেস কেনীর সহিত অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে মেমসাহেবের চেহারায় আনন্দ আভা চমকিতে লাগিল মুখেও ফুটিল “হোম”—

“হোম” যে কি জিনিস, “হোম” কথাটি যে কত মিষ্টি তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধা নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোমকে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে

হয় তাহা জানি না। এই হোমই যে, স্বর্গস্থ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝাড, জঙ্গল, জলে ডোবা, সৈত সৈতে, কুঁড়েঘর শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী, তাহাই বা কয়জনে মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতিরও “হোম” মায়া আছে। হোমেব প্রতি ষড় আছে, আদরও আছে। বিলাতী হৃদয়ে থাকিবারই তো কথা। আমরা নিমকহাবাম, আমরা কুতল্প, তাহাতেই এই দশা। আমরা বাঙ্গালী প্রায়ই মা বাপের মর্যাদা বুঝি না। সুপুত্র বলিয়াই হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্রানি, হোমটা একটা “নেষ্টী প্লেস, বাঙ্গলা-দেশ পায়খানার সামিল” অধঃপাতে যাক—আমরা স্বাধীন। ধর্ম, কর্ম, সমাজ যথেষ্টরূপ ব্যবহার কবিত্তে পারি, আমরা স্বাধীন। আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমুদয় জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টান্টিনোপল কি আমাদের নহে? সেন্টপিটার্সবার্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।

এ তো লাক কথার এক কথা, একথাব উক্তব নাই! আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি। —এ জগতে আমাব কেহই নাই, সেকথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা বাখিবাব স্থান নাই। ইহার পবেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পাঠক! হোমেব জগৎ পথিকের প্রাণ কাঁদে।

অনেক বাজে কথা বলা হইল। মিসেস কেনী হোমের নামেই গলিয়া পড়িলেন। তবে এখানেও অনেক স্থখ, সেখানেও অনেক স্থখ। বেশীর ভাগ জন্মভূমি।

হোমের আলাপেই মিসেস কেনী গলিয়া পড়িলেন। প্রাণ খুলিয়া স্বামী-মুখ চুসন করিলেন। বিশেষ আদরের প্রতিদানও পাইলেন। বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রার কথা পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সকলেই শুনিল মেমসাহেব বিলাত যাইতেছেন। বজ্রার দাঁড়ি, মাগি, সাজ-সরঞ্জামসকল সংগ্রহ হইল। পাঁড়ে, দোনে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল। মিসেস কেনী বেলা বার টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা যাইয়া বজরা বিদায় দিবেন জাহাজে চাপিবেন।

মেমসাহেব বিলাত যাত্রা করিলেন টি. আই. কেনী তিন দিবস শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। কোন কাজকর্মও দেখিলেন না।

মামলা-মোকদ্দমার কথাও কিছু তুলিলেন না। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব “শোয়ার কামরায়।” কার্যাকারকগণ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাব্যস্ত করিলেন, মেমসাহেব বিলাত গিয়াছেন, তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।— কাজকামের দিকে তত মন নাই।

সাহেবের মন ভালই থাক আর যাহাই থাক, তিনদিন তিন-রাত্ৰের পর কেনী সাংসারিক কার্যে মন দিলেন। কুঠিব লোকে দেখিল সাহেব নীচে নামিয়া ফুলবাগানদিক যাইয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। “পাইপ” চলিতেছে।

কেনী শুধু পায়চারি করিতেছেন না। মনের কথা মনেই তুলিতেছেন, মনেই আলোচনা, মনে মনেই মীমাংসা করিতেছেন।

প্যারীসুন্দবীর সহিত মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখিয়া পরে অল্প কথা। পাংশার ভৈরববাবু, নলডাঙ্গার রাজা, নড়ালের রতন রায়, এই তিনটিই এখন দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের সহিত লাঠালাঠি, মারামারি নাই। আইন-আদালতের মাঝে পৌঁচে আমাকে জব্দ করিবেন, তারই যোগাড় হইয়াছে। চলুক—কিন্তু মারামারি, লাঠালাঠি না হইলে মনের ফুর্তি হয় না। আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহাবা কেহই ওপথে যাইতে চাহে না!

ভৈরববাবু ভাবী চতুর! কিছুতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভেড়ে না। বাবুকে বশে আনার জন্ত এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। নিকটে নয় কি করি। আচ্ছা এবারে একহাত বাবুর সহিত খেলাইতে হইবে।

কেনী পায়চারী করিতেছেন। একবার দক্ষিণমুখী হইতেছেন, আবার ফিরিয়া উত্তরদিকে যাইতেছেন। একবার দেখিলেন, হরনাথ কতকগুলি কাগজ-পত্র হস্তে করিয়া বাগানের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের নজর পড়িতেই হরনাথ প্রায় মাটি পর্যন্ত মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাইলেন। কেনী ইঙ্গিতে হরনাথকে ডাকিলেন। হরনাথ বাগানের মধ্যে আসিয়া পুনরায় দস্তরমত সেলাম বাজাইয়া খাড়া হইলেন। কথা চলিল—

মোকদ্দমার কথা—খুনী মোকদ্দমার কথা, লুটের মোকদ্দমার কথা, রাজার কথা, নড়াইলের কথা, নানা কথা চলিতে লাগিল। হরনাথ সাহেবের পিছে পিছে হাঁটিতে লাগিলেন। তাহার হাওয়া খাওয়া—ইহার প্রাণে মরা! পাঠক! আমরা নিষ্কর্ষ বাঙ্গালী, হাওয়া খাইতে ভালবাসি না। ঘরে বসিয়া কেবল

বাতাস খাইতে বড়ই ভালবাসি। হরনাথের গা দিয়া ঘাম ছুটিল। কেনী একটি কথায় রাগিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ রক্ষা পাইল।

কেনী বলিতে লাগিলেন—“আমি ভয় করি না—আমি তোমার বাজালার সকল ভেদ বুঝিয়াছি। বাজালার—সাহস, বল, বিক্রম সকলি জানিয়াছি। বাবুকে একবার দেখা চাই। তোমরা আমাকে এইমাত্র খবর দিবে যে, অমুক তারিখে ভৈরববাবুর জমিদারীর সদর খাজনা অমুক পথে যশোহর রওয়ানা হইল। আর আমি কিছুই চাই না। এই খবরটি চাই মাত্র।”

হরনাথ যে আজ্ঞা, যে হুকুম হুকুরের, আবার সেলাম বাজাইয়া বাগানের বাহির হইলেন। সাহেবও শয়নকক্ষে ঢুকিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বাকুনী, মিল-গরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্যই নাই। মনের কথা, তায় আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোটবেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন। মনে হয়?—পোষাপাখির কথা মনে হয়? জকি গাডওয়ানের পোষাপাখি। বুলি ধরিয়াছে, বেশ কথা কয়—মনে হয়? কেনী যে কথাটা শেষে বলিয়াছিলেন মনে আছে? “উচিৎ মূল্য দিয়া আনিবে, সকের জিনিস জবরানে লইব না।”

পাখিটাব কি হইল? জকি সম্মত হইয়া দিল—কি জবরানে আনা হইল, সে কথা এ পর্যন্ত মুখে আনি নাই। কিছু আভাষ প্রথম তরঙ্গে দিয়াছি। মার্জনা করিবেন, সময় পাই নাই।

ভাকে খবর আসিল—মিসেস কেনী নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। কেনী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেমসাহেব ক্লিরিয়া আসিতে আসিতে এদিকে প্যারীসুন্দরী টিকিবেন কি না? তাহাতেই সন্দেহ! ইহাতে কার বালা কে পরায়? আর কার শাড়ী কে পরে?

টি. আই. কেনী নিয়মিতরূপে বিষয়াদির কার্য করেন, এবং প্রায় সকল সময়েই কুঠিতে থাকেন। ডিহি দেখিতে আর—কুঠির বাহির হন না। আফিস-দালানে বসিয়া মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ করিতে করিতে, বিষয়াদির কার্যে

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উঠিয়া যান। কিছুক্ষণ শয়নঘরে থাকিয়া আবার আফিস-ঘরে আইসেন। দশ পোনেব মিনিট অতীত না হইতেই পুনরায় শয়নকক্ষের দ্বিগে ছুটিয়া যান। কেন জান? তিনিই জানেন। কেন তাহার মন এত উতাল তিনিই জানেন।

অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? প্রভুর অমুগ্রহ পাত্র হইলে, তাহার অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? জকি গাড়ী চালাইত, কুলি, মজুরের সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিত। এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে। জকি এখন আর গাড়িওয়ান নাই, এক ময়নাই জকির সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে।

মিসেস কেনী কুঠিতে থাকিতে জকিকে কেহ কুঠির হাতায় দেখে নাই সেই গাড়ীর আড্ডায়।

এখন দিন দিন জকির উন্নতি—কপালের জোরে ক্রমে ক্রমে সাহেবেব ঘবেব কার্যে নিযুক্ত হইল। সকলেই শুনিল, জানিল এবং দেখিল, সাহেব জকিকে বড়ই ভালবাসেন। সাহেবেব ইস্তক বন্ধনশালা, লাগাদ শয়নকক্ষ, সকল স্থানেই জকিব সমান অধিকার! সোনাউল্লা যে এত বিশ্বাসী খানসামা ও পুবাঁতন চাকর, সময়ে সময়ে জকি তাহাকেও কটু কথা কহিতে ক্রটি করে না। সাহেবের পেয়ারের চাকর বলিয়া সোনাউল্লা কিছুই বলে না। ক্রমে জকির নাম জাকিয়া গেল। যে জকিকে কুঠির আমীন, তাগাদগীর, পাদা পাইক বা ইচ্ছা তাই বলিয়াছে, এখন বড় বড় আমলা—বড় বড় লোক জকির নামে চমকিয়া উঠেন। যে দেখে, জকির সহিত যাহার দেখা হয়, সেই আদর করে, ভালবাসে।—কেমন আছ জিজ্ঞাসা করে—মায়া দেখায়, মমতা জানায়। সময় সময় কাণ্ডা উদ্ধাবেব জন্ম জকিকে কেহ কেহ সেলামীও দেয়।

জকি, সাহেবের নিকট বলিতে পাকক বা না পাকক, সাহেবের অমুগ্রহ ও ভালবাসা সকলেরই বিশ্বাস যে, জকি যাহা বলে, সাহেব তাহাই শুনে। অল্প-দিনের মধ্যে জকির কপাল একেবারে ফিরিয়া গেল। জকি যাহা বলিত প্রায়ই তাহা হইত। জকি বলিল, উহার চাকুরী যাইবে, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সাহেবের অর্ডার পাশ হইল। নির্দোষী বেচারীর চাকুরী গেল। জকি বলিল আজ ঐ আমীন বেটার পিঠের চামড়া উঠাইব, সূখ্য ডুবিতে না ডুবিতে আমীন মহাশয়ের পিঠে চাবুক পড়িল, চামড়াও উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জকির নামে

অনেকেই কঁাপিতে লাগিলেন। এখন যা করে জকি।—আমীন, তাগাদগীরি, খালাসী, পাইক, বরকন্দাজ, প্যাঙ্গা, বাবুরচি, খানসামা, খেদমতগার জকির জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। জকি অনেক সময় প্রধান প্রধান কার্যকারকদিগের প্রতিও হুকুম চালাইত। তাহারা মান-সম্মত বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া জকির হুকুম তামিল করিতেন।

দিন দিন জকির অবস্থা পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাটিতে বড় বড় ঘর উঠিল। বাঁশের খুঁটি উঠিয়া শাল কাঠের খুঁটি হইল। ভাল ভাল গরু ও ভেড়াতে গোশালা পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবেশীরা শেষে গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই জকিকে ভালবাসিতে লাগিল। সদাসরুদা জকির বাটিতে লোকের গতিবিধি, আমোদ-আহ্লাদ, লেনা দেনা, কথাবার্তা, পবামর্শ চলিতে লাগিল। যে জকি এক কাঠা ধানের জন্ম মহাজন বাড়িতে ছালা পাতিয়াছে। আজ মনিবের ভালবাসায়, গোলাভরা ধান, বাক্সভরা টাকা। কত লোককে ধান কর্জ দেয়, টাকা কর্জ দেয়। জকি এখন মহাজন। ইচ্ছাধীন চাকুবী। পরিবার মধ্যে এক স্ত্রী। যে কারণেই হউক জকি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল।

জকির ময়না বেশ কথা কয়। মানুষের মত কথা কয়—কান পাতিয়া কথা শুনে। কথার উত্তর করে। এ বিবাহের কথা শুনিয়া কিছুই বলিল না।

জকির বিবাহেব সম্পূর্ণ ব্যয় সাহেব দিলেন। সাহেবই ভালবাসিয়া আবার বিবাহ দিতেছেন, কুঠির লোকে এই বলিতে লাগিল। এক বলিতে দশজনে রাজি হইল। সতীনের ঘর বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিল না। সপ্তাহ মধ্যে বাজি বাজনায়ে, জকির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের খাওয়া দাওয়া বিদায়, ইত্যাদি গোলযোগ মিটিয়া গেল। একদিন টি. আই. কেনী জকিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে আজ হইতে তোমার অগ্র কাজ আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আমার হাতি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির তদারক করিবে। আর ইহাদের দানার বন্দোবস্ত তোমার হাতে থাকিবে। স্ত্রীবিধা মত প্রতিদিন কোন সময়ে একবার কুঠিতে আসিয়া হিসাবমত দানা বাহির করিয়া মাহত ও সইসের জেঙ্গা করিয়া দিয়া যাইবে। আর কোন কার্য করিতে হইবে না। সেই হইতে জকি দুই এক দিন পর কি সপ্তাহে একদিন কুঠিতে যাইয়া দানা বাহির করিয়া দিয়া আসিত। আর কোন সময় কুঠিতে যাইত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন জকি

কুঠি হইতে আসিতেছে, বাটির নিকটেই জকির খুড়তুত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল, তাহার নাম কি আমরা জানিতে পারি নাই, পূর্বে এক বাড়িতেই ছিল, এক্ষণে সুন্দরপুর প্যারীসুন্দরীর এলাকায় বাড়ি করিয়াছে। জকি বহুদিনের পর ভাইকে পাইয়া খুব খুশি হইল। বাটিতে লইয়া গিয়া হাত, পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। তাল একটি মাদুর ও পরিষ্কার একখানি কাঁথা ও একটি বালিশ আনিয়া বাহির বাটিরঘরে বিছানা করিয়া দিল। জকির বাটিতে ডাবা-ভুকার অভাব ছিল না। তামাক সাজিয়া একটা নিজে খাইতে খাইতে আসিল, আর একটি ভাইয়ের হাতে দিয়া দুই ভাইতে কথাবার্তা চলিল। অগ্ন্যান্ত রুধক হইতে জকির অবস্থার উন্নতির সহিত খাতাখাতেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঘরে খাত-সামগ্রীর অভাব নাই সকল সময় খাজা, বাতাসা, চিড়ে, মুড়কি, গুড়, দুধ সকলি থাকিত। ঐ সকল জিনিসে ভাইকে জল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরেই ভাতের যোগাড় করা হইল। দুই ভাই একত্রে আহাৰ করিয়া অনেক কথাবার্তা পৰ, আগন্তুক ভ্রাতা প্রত্যাষেই বাড়ি যাইবে বলিয়া বিদায় হইয়া বহিল।

দুইদিন পর জকি ছোট স্ত্রীকে বাটির কাজকর্মের কথা বলিয়া শেষে বলিল যে, আমি ভাইয়ের বাড়িতে সুন্দরপুর যাইতেছি। বাড়ির কাজকর্ম দেখিয়া করিও। ভাইয়ের বাড়ি আজ যাইতেছি, দুই-এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। এই কথা—ছাতা, লাঠি লইয়া রঙ্গিন গামছাখানা কাঁধে করিয়া বাটির বাহির হইল। দুইদিন চলিয়া যায়, জকির খোঁজ খবর নাই। কুঠির ঘোড়া গরুর দানা বন্ধ। কারণ জকির হাতেই দানার ঘরের চাবি। জকির বাটি পর্যন্ত খোঁজ করা হইয়াছে। জকির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুঠির লোকে জকির বাহিরবাটি হইতেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ বাটির মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। সর্দার, পাইক, মুখা, বরকন্দাজ, প্রভৃতিরা অগ্ন্যান্ত বাজে চাকরের বাটির উপর জোর জব-রানে চলাফেরা করে—জকির বাটির উপর গিয়া বড় করিয়া কথা কহিতে কাহারও সাহস হয় না। জকি বাটিতে নাই এ-স্থির করিয়া শেষে সাহেব পর্যন্ত খবর হইল যে, জকি বাড়িতে নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। দুইদিন যায় কোন খবর নাই। গুদাম বন্ধ, দানা বাহির করার কোন উপায় নাই। ঘোড়া, গরু মারা পড়িল।

টি. আই. কেনী. বলিলেন—জকি যেখানে গিয়াছে আমি জানি, গুদামের

চাবি বোধহয় তাহার বাড়িতেই বাখিয়া গিয়াছে। চাবি আনিয়া ওদাম খুলিয়া দেও। জকিকে জল করিবার আশায় যাহারা সাহেব পর্যন্ত এতলা দিয়াছিল তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইল।

পরদিন জকি বাটি আনিয়া বাটির কাজ কাম দেখিয়া কুঠিতে যাইয়া আপন কর্তব্য কার্য্য করিয়া আসিল। জকির বিরুদ্ধে সাহেবের নিকট কোন কথা কহিতে কেহই আর কোমদিন সাহসী হইল না।

জকি তিন চারদিন বাটিতে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সুন্দরপুর হইতে কুটুম্ব-স্বজনও প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গোপনে গোপনে অনেক পরামর্শও হয়। এই সকল দেখিয়া ময়না ভারি চটিয়াছে। লোকজন চলিয়া গেলে মিষ্টি মিষ্টি রাগের সহিত বলিতে লাগিল। “এত ঘন ঘন ভায়ের বাড়িতে যাওয়া ভাল হইতেছে না। মারা পড়িবে।” তাহাতে জকি যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া ময়না মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ষোড়শ তরঙ্গ

ভয়ানক ব্যাধি

রাত্র জাগরণেই হউক কি অল্প কোন অনিয়মেই হউক মীরসাহেব পীড়িত হইলেন। পীড়ার কয়েকদিন পূর্বে রাত্রে দুগ্ধপান করিতে দুগ্ধের স্বাদ-বিস্বাদ-বোধে সে দুগ্ধ পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হইতে শরীর অসুস্থ, ক্রমে জ্বর, ভয়ানক জ্বর—একেবারে চৈতন্যহীন। মীরসাহেব বাহির দালানের কুঠিবীতে পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। মাস্তন, বিনোদ বিশ্বাসী চাকর, তাহারা নিকটে আসেন না। একমাত্র গরিবুল্লা! যথাসাধ্য মনিবের সেবা-গুশ্রুণা করিতেছে। বাড়িপোরা লোকজন, কেহই তাহাব দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কি মনে করিয়া যে, মনিবের পীড়ার সময় সেবা-গুশ্রুণা করিতে নারাজ, তাহা তাহা-রাই জানে। একা গরিবুল্লা কি করিবে? বাটির অন্ত্রাণ লোকজন স্বচ্ছন্দে “খানা-পিনা” করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়িতে সে একটি পীড়িত লোক আছে—সে কথা কাহারও মনে আছে ভাবে একপঙ বোধ হয় না। কেবল বসীকুদ্দিন সদা সর্বদা দেখাশুনা করে। সা গোলাম বসীকুদ্দিনকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বসীকুদ্দিনের দিকে নজর পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া অন্ত্রদিকে ঘুরিয়া বসেন। বাটির কর্তা-ব্যক্তির কুদৃষ্টি হইলে কয়দিন কে টিকিতে পারে? বিশেষ বসীকুদ্দিন যাহার

বলে সা গোলামকে গ্রাহ্য করিতেন না, যে দাঁত কিচিরমিচির ভয় করিতেন না, তিনি শয্যাগত পীড়িত। উঠিবার শক্তি নাই, বসিবার শক্তি নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই, তাঁর কথা কে শুনে। বিশেষ নূতন আমল প'লে, পুরাতনে প্রায়ই লোকেব ঘৃণা হয়। কোন দোষ না থাকিলেও, একটু বেশি পরিমাণ আদর পাবার লোভে, সাচা, মিচা, হক, নাহক সাতকথা বলিয়া মন হইতে তফাত করিতে চেষ্টা কবে। এ গুণটা প্রায়ই মোস্তা-খোডা জাতি—কুটুম্ব এবং বাড়ির চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীর হইয়া থাকে।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি, কষ্টের একশেষ। রোগির পথ্য, সেবা-শুশ্রূষার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। কে প্রস্তুত কবে, কে চেষ্টা কবে, কেইবা যত্ন করে, কেইবা কার কথা শুনে? সা গোলাম মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রোগির আপাদমস্তক একধানে চক্ষু পাতিয়া দেখিতেন। নাড়ি-জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। সা গোলাম মনের ব্যাগ্রতায় কোন কোন দিন স্বপ্নবের হাত ধরিয়া নাড়িব গতি দেখিতেন।

টি. আই. কেনীও শুনতে পাইলেন যে, মীরসাহেব অত্যন্ত পীড়িত। হাতিতে চাপিয়া, মীরসাহেবকে তখনই দেখিতে আসিলেন। সেদিন মীরসাহেব একটু ভাল। কেনী আসিয়া দেখিলেন, সা গোলাম একজন কবিরাজের ঔষধ মীরসাহেবকে খাওয়াইতে জিদ করিতেছে—মীরসাহেব খাইবেন না, কবিরাজের ঔষধ খাইবেন না বলিয়া ঔষধ খাইতে অস্বীকার হইতেছেন। সা গোলাম কত অচুনয় বিনয় করিতেছেন। মীরসাহেবের পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়ার জন্ত সা গোলাম বডই ব্যস্ত। টি. আই. কেনী চিকিৎসা শাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাহার কুঠিতে থাকিত। কোন পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনামূল্যে দান করিতেন। কেনী মীরসাহেবের হাব ভাব, চক্ষু দেখিয়া কি পীড়া, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রথম অবস্থা এবং এ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে কি প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কেনীর মুখেব ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিল যে, মীরসাহেবের পীড়ার ভারূপ চিকিৎসা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মাছুষে আর কি বুঝিবে কেনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সা গোলামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মীরসাহেবকে বলিলেন—আপনি কোন চিন্তা

করিবেন না। আমি আপনার ঔষধ করিব। কুঠিতে গিয়াই আপনার ঔষধ পাঠাইব। আমি জ্বরের কথা শুনিয়া কয়েকটি ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনার এ-জ্বর ভয়ানক জ্বর, বিষাক্ত জ্বর, আর ভয় নাই। আরাম পাইবেন। আজ যে ঔষধ পাঠাইব, তাহা খাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ঔষধে আরাম পাইবেন কি না। আমি আপনাকে বার বার নিষেধ করিতেছি কাহারও ঔষধ খাইবেন না। আমি এখনি ঔষধ পাঠাইয়া দিব। যে যে নিয়মে পান করিতে হইবে তাহাও পত্রে লিখিয়া পাঠাইব। টি. আই. কেনী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সা গোলামের মনের আশা পূর্ণ হইল না। যে নূতন চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে কিস্তিমাত হইল না। কেনীর ঔষধ ভিন্ন মীরসাহেব আর কাহারও ঔষধ খাইবেন না। সা গোলাম স্বয়ং কমল কবিরাজের বাড়িতে গিয়া যে যে ঔষধের যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজের পুঁটুলিতেই রহিয়া গেল। প্রাণ বাঁচিল, টাকাও থাকিল। উপস্থিত ঘটনায় সা গোলাম মনে মনে হাসিলেন কি কান্দিলেন, তাহা তাহারই মনে জানে। প্রকাশে সকলের নিকটেই বলিলেন—ঔষধ না খাইলে আর আমি কি করিব! কমল কবিরাজের মত কবিরাজ বোধহয় এদেশে আর নাই। তারই ঔষধে যখন তাঁর ঘুণা, তখন আর ভরসা নাই। সাহেবের ঔষধ কত ভাল হয় দেখতে পারবেন। সা গোলাম কমল কবিরাজকে অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলেন। একটি টাকা দর্শনী দিলে কবিরাজ মহাশয় আর দুটি কথা বলিতেন না। সা গোলাম স্বপ্নের খাতিরে একমুঠো টাকা কবিরাজের হাতে দিয়া, কবিরাজ বিদায় করিলেন। ব্যবস্থা লওয়া হইল না, ঔষধও গ্রহণ করা হইল না। একমুঠো টাকা দিয়া কবিরাজ বিদায় করিলেন।

টি. আই. কেনীর প্রদত্ত ঔষধ বসীরাউদ্দিন মহাশয়ে মীরসাহেবকে সেবন করাইলেন। এতদিনের পর ঔষধ সেবন-মাত্রই চক্ষে নিদ্রা আসিল, ঘোর-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সা গোলাম এতদিন নিশ্চিন্ত স্বপ্নে নাই। মীরসাহেবের বাস, পেটারী ও সিন্ধুক মাক্কন-বিনোদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়াছেন, কোন স্থানেই অছিয়ত-নামা প্রাপ্ত হন নাই। খুঁজিতে আর বাকি নাই। শেষে মীরসাহেবের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, সা গোলামের মনে হইল যে, হা! এত স্বযোগ পাইয়াও

তাঁহার হাতবাক্সটি খুঁজিলাম না কেন? যদিও বাক্সটি মীরসাহেবের নিকটেই থাকে, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেখিতে পারিতাম। তাহার মধ্যে কি আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতাম। এইক্ষণে সে উপায় আর নাই। ক্রমেই স্তম্ভ হইতেছেন। হাতবাক্সের কাছে যায় কে? একটি কথা—সামান্য হাতবাক্স মধ্যে যে ঐ মহামূল্য দলিল রাখিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি।

অদ্বিত্যনামার চিন্তাই—সাঁ গোলামের প্রধান চিন্তা। মীরসাহেব দিন দিন স্তম্ভ হইতে লাগিলেন। চাকরেরাও কিছু কিছু কবিতা নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ-মধ্যে একেবারে নিরোগ হইয়া কার্যাক্ষম হইলেন। কেনী প্রতিদিন মীরসাহেবের খবর লইতেন। ক্রমেই ভালকথা, ভাল-খবর, একেবারে নিরোগ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন মীরসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মীরসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিদিন খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, ঠাণ্ডা জিনিস খাইবেন।

কেনী পীড়া সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়া শেষে সাঁ গোলামের কথা তুলিলেন।

মীরসাহেব বলিলেন, “তুলা মিঁয়া” আজ বাটিতে নাই, চাপড়ার বিলে পাখি শিকার করিতে গিয়াছেন।

কেনী বলিলেন আপনার জামাতা বড় চতুর। বুদ্ধিও খুব পেঁচাও। যে মাগুষের সর্বদাই ক্রু কুঞ্চিত থাকে তাহার মন সরল নহে।

মীরসাহেব বলিলেন, বুদ্ধি যে খুব পেঁচাও, তাহা জানিয়াই বিষয়াদির কাজকর্ম সমুদায় তাহার হাতে দিয়াছি। বিষয়াদির চিন্তায় আর আমাকে এখন চিন্তিত হইতে হয় না। কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না। খুব চতুর ছেলে। বেশ স্তখে আছে।

কেনী একটু হাসিয়া বলিলেন। জামাই পরের ছেলে।

মীরসাহেব বলিলেন, না না, সে পরের ছেলের মত পর নহে। আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, পিতার গায় পূজা করে, মান্য করে। আমার পীড়ার সময় নিজে কবিরাজের বাড়ি পর্য্যন্ত গিয়া কবিরাজ আনিয়াছিল। ঔষধ খাওয়াইতেও কষ্ট বড় করিয়াছিল। কত অল্পনয়-বিনয় করিয়াছিল। কবিরাজের ঔষধে আমার ভক্তি নাই বলিয়া খাই নাই। তজ্জ্ব সাঁ গোলাম কবিরাজকে টাকা দিতে কম করে নাই।

কেনী বলিলেন—ভাল হয় সে ভাল কথা। কিন্তু হঠাৎ হাতছাড়া করিবেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাঁদা করিবেন।

মীরসাহেব কেনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোন কথাই আসিল না। একটু পরে বলিলেন ভাল কথা দারোগা। খুনের কি হইল?

“সে মোকদ্দমায় মহা-হুলস্থূল বাধিয়াছে। শেষে সেকথা বলিব। বলুনতো পাংশার ভৈরববাবু সম্বন্ধে কি করি। তিনি আমার সহিত সময় সময় দেখা করেন বটে, কিন্তু আসলকাজে ভিড়িতেছেন না। লোকটি ভারি চতুর বটে। আমি বাঙ্গালাদেশের অনেক লোককে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করিলাম। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু। ভৈরববাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতাস্তই কৌশলী, দাঙ্গা-ফেসাদে অগ্রসব হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ একরূপভাবে লিখিত-পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনাবায়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। ইহাই তাঁহার আস্তরিক-ভাব। নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।

“ভৈরববাবু বড়ঘরানা বনিয়াদীবাবু। আমাদের সহিত এত নিকট-সম্বন্ধ যে, হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনপ্রকার হিংসার ভাব নাই। পুরুষানুক্রমে ভ্রাতৃত্ব চলিয়া আসিতেছে। জাতিব-বিচ্যায় মহাপণ্ডিত, ফারসী ও আরবীতে মহাবিজ্ঞান, সঙ্গিত-বিচ্যায় এদেশে অমন গুণীলোক আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যাহাই করুন তাঁহাকে সম্মত করিয়া করিবেন। এইটি আমার বিশেষ অনুরোধ।

তাঁহার অসম্মতিতে আমি কিছুই করিব না। কিন্তু তিনি কেমন ভৈরববাবু আমি একবার পরীক্ষা করিব। তিনি বাঙ্গালাদেশের বুদ্ধিমান, চতুর। আমিও বিলাতী ‘শয়তান’ দেখি, তাঁহার বাঙ্গালী-বুদ্ধির দোড় কত? আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না, কেবল বুদ্ধির দোড় দেখিব। মস্তিস্কের ক্ষমতা বুঝিব।

মীরসাহেব বলিলেন—আচ্ছা তা দেখবেন—প্যারীসুন্দরীর কি হইল?

কেনী বলিলেন—হাঁ হাঁ! সে কথাটা ভুলিয়াছি। জানেন—আমরা নিশাতির লোক যতগুলি এইদেশে বাস করিতেছি, আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব

করিয়া মনের কথা বলিতেছি, কিন্তু আমাদের মনের নিগূঢ়ত্ব—গুপ্তকথা কখনই পাইবেন না। আপনি দেখিবেন, কালে প্যারীসুন্দরীর যথাসর্বস্ব যাইবে। খুঁচি-হস্তে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিতেছে না। কারণ এখনও টাকার অভাব হয় নাই। ঘটিতে বিলম্ব আছে। কুঠি লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণ সাতটি বৎসরের জন্ম জেলে গিয়াছে। দারোগা খনের মোকদ্দমায় স্বয়ং কোম্পানী বাদী। শীঘ্রই দেখিবেন সুন্দরপুরের জমিদারী খাস হইয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে আর অধিক কি বলিব।

“আমিও একবার সোলি যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার এই গোলযোগে সেবাবে যাইতে পারি নাই। তাহাবপবই জ্বর,—জ্বর নয় বিষম জ্বর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

“আরও কয়েকদিন বিলম্ব যাইবেন। শরীরটা ভালকবে শুধরে যাক, তার পর যাইবেন। আর একটি কথা—বিরক্ত হইবেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান-সতর্কে দেখিয়া শুনিয়া খাইবেন।

এ পর্যন্ত বলিয়াই কেনী উঠিলেন। মীরসাহেব কেনীর সঙ্গে সঙ্গে দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত আসিলেন। কেনী সেকথা শুনিয়া অশ্রু চাপিলেন। সেইস, বব-কন্দাজ প্রভৃতি কেনীর-সঙ্গে লোকজন মীরসাহেবকে ভক্তির সহিত সেলাম করিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

সপ্তদশ তরঙ্গ

অনন্ত-আকাশে মরণাপাখি

আশাই জীবনের আশ্রয়, আশাই সংসারের মূল—আশাই মানব-হৃদয়ের একমাত্র ভরসা। ভাবিতে গেলে—আশাতেই সংসার। কে না জানে মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিবার নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আজ যদি কেহ বলে যে, কাল তোমাকে মরিতে হইবে—আর তাহা যদি নিশ্চয় হয়, তবে কাল কেন? যখন মৃত্যুর কথা কানে প্রবেশ করে, তখনই যেন মরিয়াছি বলিয়াই বোধহয়। মরণে ভয় করিয়াও আশার কুহকে পড়িয়া মরণ কথাটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি, অগৎ চিরস্থায়ী,—আমিও চিরস্থায়ী। এত ভ্রম হইবার কারণ কি? আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র

আশা। আশা আমাদিগকে মাতাইয়াছে,—মজাইয়াছে। আশাই আমাদিগকে ভুলাইয়াছে।

জকির আশা কি? সে কি আশায় সুন্দরপুর গ্রামে ভ্রাতার বাড়ি যাওয়া-আসা করিতেছে। গরু, লাঙ্গল, জমি, বাড়ি, ঘর, ধান, টাকা যাহা জকির আশা ছিল, সকলই তো একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর কি আশা? এ ভাই তো পূর্বেও ছিল। আগে এত যাওয়াআসা হয় নাই। এখন এত ঘন ঘন আসা কেন? আর একদিন ছাতি, লাঠি হাতে করিয়া জকি ভ্রাতার বাড়ি যাইতে উদ্বৃত্ত হইলেই ময়না বলিল—“দেখ! কুটুম্ববাড়িতে এত যাওয়াআসা ভাল নয়।”

জকি দাঁড়াইয়া লাঠি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—“একটা কথা ছিল তাহাতেই”—

“কথা থাকুক সুন্দরপুর যাওয়াআসার কথা সাহেবের কানে গেলে কি ঘটবে? তুমি সাহেবের প্যারাচাকর, তুমি সাহেবের শত্রুর এলাকায় কুটুম্বিতা করিতে যাও। নিশ্চয়ই জেনো, সাহেবের কানে গেলে তিনি হাড়ে হাড়ে চটে যাবেন। জল, জঙ্গল, মনিব কোনকালেই আপন নহে। আবার প্যারীসুন্দরীও সাহেবের প্যারাচাকর—মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই কবিতো পারেন।

“প্যারীসুন্দরী আমাকে কিছুই বলিবেন না। তিনি আমাকে বড় ভাল-বাসেন।”

ময়না আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল “তিনি তোমাকে ভালবাসেন? তার মানে কি? তুমি কি তাহার বাটিতে যাও নাকি?”

জকি চুপে চুপে কয়েকটি কথা ময়নার কানের নিকট কহিয়া আপন শয়নগৃহ-মধ্যস্থিত হাতচাক্সির উপর হইতে ধুতি-চাদর বাহির করিয়া আনিয়া ময়নাকে দেখাইল। আর যাহা পাইয়াছিল, তাহা আর দেখাইতে সাহসী হইল না। কারণ সে পাঁচশত টাকার একটি তোড়া—টাকার তোড়া ধানের ভোলের মধ্যে থাকিল। তাহা বাহির করিয়া ময়নাকে দেখাইতে কিছুতেই জকির সাহস হইল না। ময়না ধুতি-চাদর দেখিয়া বলিল “দেখ, এ কাপড় তুমি কখনই পরিও না। লোকে দেখিলেই সম্বোধ করিবে। তুমি যে কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিবে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যে যেমন, তাহার আশাও তেমন। চক্কুও তেমন—পছন্দও তেমন। নিশ্চয় লোকে একথা বলিবে যে, তুমি এ কাপড় চুরি করিয়া আনিয়াছ।

না হয় তোমাকে বড়লোক দিয়াছে। এ ধুতি-চাদর কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দেও। নয় পোড়াইয়া ফেল। আর ঘরে রাখিও না। আমার কথা শুন।”

“জকি বড়ই দুঃখিত হইল। মনে করিয়াছিল, ময়না তাহার কাষে যোগ দিবে—কত প্রশংসা করিবে। ধুতি-চাদর দেখিয়াই এইকথা—পাঁচশত টাকার কথা শুনিতে তো আজই আগুন জ্বলাইয়া দিয়া ছারখার করিয়া দিবে। টাকার কথা না বলিয়াই ভাল করিয়াছি। জকি মনে মনে এইকথা কহিয়া ময়নার সম্মুখ হইতে ধুতি-চাদর উঠাইয়া লইয়া গেল। একটুকু পবে আসিয়া বলিল যে, আর সুন্দরপুর যাইব না।

“কুটুম্ব-স্বজনের বাড়ি যাওয়া আসায় দোষ কি? তবে ঘন ঘন যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আদরও থাকে না। মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হয়। আমি যাইতে বারণ করি না, মাসেক-ছমাস পরে কুটুম্ববাড়ি যাওয়াই ভাল।”

“না আমি সে বাড়িতেই আর যাইব না। সুন্দরপুর গ্রামেই আর যাইব না। সেখানে আমার কোনই কাজ নাই।”

ময়না কাতরস্বরে বলিতে লাগিল। “দেখ আমার পেটের বেদনা আজ বড়ই বেশী হইয়াছে। সাহেবের নিকট হইতে যদি একটু ঔষধ চাহিয়া আনিয়া দিতে তাহা হইলে ঠাঁচিতাম, কত লোককে তিনি ঔষধ দেন। তুমি চাহিলেই ঔষধ দেবেন।”

জকি সুন্দরপুর না যাইয়া কুঠিতে চলিয়া গেল। ময়না মাটিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কি? স্বামীর সহিত সময় সময় দেখা হয়, কিন্তু বিবাদ-বিসম্বাদ, বিচ্ছেদ, মিলন কিছুই নাই। স্বপত্নী আছে, তাহার সহিতও মনবান্ধ নাই। ময়নাই ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে বিবাহ দিয়াছে। স্বপত্নী-স্বরে আনিয়াছে। একদিনের জন্তও স্বপত্নী সহিত বাদ-বিবাদ হয় নাই। অন্ন-বস্ত্রে ময়নার কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। তাহার আচরণে, কথাবার্তায় প্রতিবেশি-গ্রামস্থ লোক সকলে একমুখে ভাল বলে। এবং ভালবাসে। প্রতিবেশিনীর মধ্যে একজন বয়োধিকা স্ত্রীর সহিত ময়নার বিশেষ আলাপ ছিল। সে সর্বদাই ময়নার নিকট কথাবার্তা কহিত, হাসি-তামাসা করিত। ময়নার পীড়ার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়া বলিল—

“কি হয়েছে দিন দিন যে একেবারেই সারা হইতেছে? আগে তো ভালই ছিলে,—পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তোমার ভাব অনেক বদল হইয়াছে। আবার আজ কয়েকদিন হইতে তো একেবারেই যাচ্ছেতাই দেখিতেছি। ক্রমেই যে সারা হলে? কথাটা কি বলত?”

ময়না কোন উত্তর করিল না। কিন্তু চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষুজল সম্বরণ করিতে ক্ষমতা হইল না। দুই-এক ফোঁটা মাটিতে পড়িল অবলা নিঃসহায়। চক্ষুর জল মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজাইল। পরে বলিল “আমার কিছু হয় নাই। কোন, পীড়াই আমার শরীরে নাই। তবে বলবে এ ভাব কেন? সতীনের জ্বালায় জলিতেছি—তাহাও নহে। সে দতীন তো আমিই আনিয়াছি—এ সংসারে আমিই কর্তা, আমার হাতেই সকল, কিছুতেই আমার দুঃখ নাই। অথচ এ জগতে আমার আর স্মৃতি নাই। আমার মনেব কথা মনেই রহিল।”

“বোন! অনেকদিন হ’তে ইচ্ছা একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সময় পাই নাই। তোমার সম্মুখে কেহ বলে না। ভেঙ্গেচুরে খোলাসা করেও কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আকার-ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক অনেক কথা বলে। ভাই জকির সহিত তুমি কথা বল না। সে তোমার ঘরে আসে না। এ কথাটা প্রকাশই সকলে বলে। পুরুষ ঝাঞ্জা হইলে দশটি বিয়ে করিলেও ছেলেপেলে হয় না। এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। কিন্তু তোমার মুখের ভাব, শব্দবোব অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু মৃথফুটে কেহই কিছু বলিতে সাহস পায় না। একটু ঘাৎ রাখিয়া দেয় যে, হলেই দেখা যাইবে।”

ময়না নিরব—কিন্তু চক্ষের জলে মাটি ভিজিতেছে।

প্রতিবেশিনী পুনরায় বলিল, কান্দ কেন? সকলই কপালের লেখা। ময়না অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল বোন! আমি সকলকেই চিনিয়াছি। বিশেষ করিয়া স্বামীকে চিনিয়াছি। স্বামী, আপন স্বামী—হায়!

জকি ঔষধের শিশি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, সাহেব ঔষধ দিয়াছেন।

প্রতিবেশিনী বলিল—কিসের ঔষধ?

ময়না বলিল—বেদনার ঔষধ।

জকি শিশি রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার জ্ঞান তারি ব্যস্ত হইল। সাহেব বলিয়াছেন তোমার জ্বর হাতে ঔষধ দিও। তুমি খাওয়াইও না। এ কথাটা

বলিতে তখন জকির সাহস হইল না। কারণ সম্মুখে পাড়ার একটি দ্বীলোক।
কিসে ঔষধ খাওয়াইবে, এইকথাই বার বার বলিতে লাগিল।

ময়না বলিল ঔষধ দেও থাই! ব্যস্ত হইতেছ কেন?

জকি বলিল—না না ব্যস্ত কি! তা—না—ঔষধ খাও। এখনই বেদনা
সারিয়া যাইবে।

ময়না বলিল—“দেও তুমিই হাতে করিয়া দেও থাইতেছি।”

জকি—তা আচ্ছা দেই, খাও বলিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ ময়নার মুখে
ঢালিয়া দিয়া জকি নিস্তার পাইল। ঔষধ গলাধ করিতে ময়নার মহাকষ্ট হইল।
অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

জকি ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল যে, সাহেব জন দিয়া মিশাইয়া থাইতে বলি-
য়াছিলেন, তাহা তো হইল না। সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি
ষটি আনিয়া ময়নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ময়না জনপান করিল না। জকি
শিশিটি লইয়া বার বার দেখিতে লাগিল, এবং শিশির গলায় সূতা বাধিয়া ঘরের
বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিল। এবং তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হুঁকা-কলকে
লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রতিবেশিনী আবাব জিজ্ঞাসা করিল বোন!
কিসের বেদনা?

ময়না একটু স্থির হইয়া বলিল—বেদনা আমার মাথা আর মুণ্ড!

জকি কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতে লাগিল—সাহেব বলিয়া
দিয়াছেন যে, ঔষধ খাওয়াইলে কিছুক্ষণপর কি ভাব হয়, বেদনা কমে কি বাড়ে,
আসিয়া বলিও।

প্রতিবেশিনী বলিল—বোন! আমি এক্ষণে যাই, বাড়ির কাজকাম অনেক
বাকি আছে। আবাব আসিয়া দেখিয়া যাইব। প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল।
ময়না যেখানে ঔষধ খাইল, সেইখানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পেটমধ্যে যেন
আগুন জালিয়া দিল। কয়েকবার উঠিয়া ঘরের কানাচি-গিয়া শেষে একেবারে
অচল হইয়া পড়িল। সপত্নী ব্রজ বাড়ির অনেক কথাই জানিত। ময়নাকে
ধরিয়া কয়েকবার কানাচি লইয়া গেল। শেষে ময়না অস্থির হইয়া পড়িল। কাপড়
অসামান হইল। জকি সাহেবের নিকট সংবাদ দিতে দৌড়িয়া ছুটিল। বাঁচিবার
ভরসা নাই, চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল, সপত্নী ব্রজের কোড়ে মাথা রাখিয়া

অতি যুহু যুহু স্বরে বলিতে লাগিল—“বোন ! আমি যে, ঔষধ খাইয়াছি কেন, তাহা তুমি বোধহয় জান ? যে জ্ঞাত ঔষধ খাওয়া তাহা অপেক্ষা মরণ ভাল । আমার স্বামী বর্তমান । ঐ ঔষধের পরিমাণের বেশী আমি খাইয়াছি । যিনি ঔষধ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, বড় ভয়ানক ঔষধ । যাহা দিব, তাহার চারিভাগের একভাগ চারিগুণ জলে মিশাইয়া খাইবে । যদি তাহাতে না হয়, তবে সেদিন আর খাইবে না । তারপরদিন আবার ঐ পরিমাণ ঔষধ আটগুণ জলে মিশাইয়া খাইও । এটি ছিল ঔষধের ব্যবস্থা । সেই ঔষধের ব্যবহার-নিয়ম জানিয়াও যে অকাতরে শিশির সমুদায় ঔষধ বিনাজলে পেটে ঢালিলাম কেন ? মরিব বলিয়া । আমার ঠাচিবাব সাধ নাই । আমি অনেকদিন হইতে মরিয়া বহিয়াছি ।

বোন ! তুমি তোমার স্বামীকে চিন্তিতে পার নাই, আমি অনেকদিন হইতে চিনিয়াছি । সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে চিন্তিতে পারিয়াছি । ইহার বিচার অবশ্যই একদিন হইবে । যিনি সকলের বিচারের মালিক, তাঁহার হাতে একদিন পড়িতেই হইবে । কথা অনেক, কিন্তু বলিবার সাধা নাই । বোন ! একটি কথা বলি—তোমার স্বামীকে তুমি কখনই বিশ্বাস করিও না । তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য্য হুনিয়ায় নাই । মানুষে যাহা কখনই করিতে পারে না, তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে কবিত্তে পারেন । পারেন তো পরের কথা—করিয়াছেন । আর কি বলবো বোন ! আর কি বলবো ! ঐ যে ধুতি-চাদর দেখিয়াছ, নিশ্চয়ই জানিও ঐ ধুতি-চাদরেই তোমাদের সর্বনাশ হইবে । ঐ কাপড়েই তোমাদের যথাসর্বস্ব যাইবে । প্রাণ যাইতেও বড় আশ্চর্য্য নাই । আগেই বলিয়াছি, তোমার স্বামী টাকা পেলে না পারে, হুনিয়ায় এমন কোন কু-কাজই নাই । প্রথম লোভ ধুতি-চাদর তারপর যে লোভ আছে সে লোভ তোমার স্বামী—কখনই সামলাইতে পারিবে না ।

আমি তো চলিলাম, তুমি যদি ঠাচিয়া থাক তবে দেখিবে তোমার স্বামীর কি দুর্দশা ঘটে । বোন ! “তোমার স্বামী” বলিলাম বলিয়া মনে কোন দুঃখ করিও না । মনের কথা চিরকাল মনেই রাখিয়াছি । এখন আর কেন ? ইচ্ছা করিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ খাইয়াছি । খাইলাম কেন ? আপন প্রাণ আপন-হাতে বাহির করিলাম । তাহা বলিব না । মরণের মন জানে, আর সেই পাক-পরও-য়ারদেগার জানেন ।

একদিকে স্বামী, অত্রদিকে ছরস্ত বাঘ ! বাঘ হা করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল । আর বাঁচি কি করিয়া, যাই কোথা—কে রক্ষা করে ? খোদায় আছেন জানি, তিনি সকলের রক্ষক তাও লোকের মুখেই শুনি ! সেও হতভাগিনীকে তো রক্ষা করিলেন না ! আর শক্তি নাই—কথা কহিবাব আর শক্তি নাই । উহ ! স্বামীর এই কার্য্য ! জকির মুখ আর দেখিব না বলিয়া ময়নাব দুটি চক্ষু একেবাবে বন্ধ হইয়া গেল । ব্রজ এই তিনটি অশ্রুট কথা শুনিল মাত্র । নির্দয় স্বামী ! নির্দয় ইংরেজ ! মুখের কথা মুখেই রহিল । ময়নার প্রাণবায়ু কোনপথে কোথায় চলিয়া গেল ব্রজ তাহার কিছুই দেখিতে পাবিল না । নিববে কান্দা ভিন্ন ব্রজের আর কি ক্ষমতা আছে ? —কান্দিতে লাগিল ।

জকি সাহেবের নিকট পাড়ার অবস্থা জানাইতে গিয়াছিল, উর্দ্ধ্বাশে দৌড়িয়া আসিয়া ইঁপাইতে ইঁপাইতে বলিতে লাগিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে ! সাহেব কত দুঃখ করিতেছেন । আমাকে মারিতে তাড়া দিয়াছেন । আর পাছা খাবড়াইয়া বলিতেছেন “ও ম্যান—তুমি ক্যা করিয়া” । ঔষধে জল দেই নাই, আর সমুদায় ঔষধ খাওয়াইয়াছি শুনিয়া কেনী আঙ্গুল দাঁতে কাটিতেছেন । সাহেব মহাব্যস্ত হইয়াছেন ।

এখন কেমন ? ময়নাব নাকে মুখে হাত দিয়া দেখিয়া জকি মাথায় ঘা মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল । ব্রজের কান্না তখন একটু বাড়িল । প্রতিবেশিনীরা যে যেখানে ছিল ছুটাছুটি করিয়া ব্রজের কান্নার সহিত যোগদিয়া কান্দিতে কান্দিতে চক্ষের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া ফেলিল । জকি প্রতিবেশীদের সাহায্যে ময়নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ি ময়নার ঘরের জিনিস-পত্র বাক্স-পেটাবায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল ।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

জন্মভূমি

জন্মভূমি কাহার না আদরের ? উপমা-রহিত কাহার না ভাল বাসস্থান ? জন্মভূমির জন্ত কে না লালায়িত ? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই স্মৃতি ! আনন্দ ! মিসেস কেনীর মন কিরূপ তাহা জানি না । বাঙ্গালার কাল-মুখের ভাব এবং খোলা বুকের ভিতরের খবর বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য । তাহাতে

সেই ধ্বংসে সাদা মুখের হাব-ভাব, সাদা চোখের চাউনির আভাষে, এবং আটা-সাটা সাতপ্রকার কাপড়ে ঢাকা—সাদা-চর্ম সাদা-অস্থি জড়িত—সাদা কি কালো ঈশ্বর জানেন—কোমল কি কঠিন ভগবান জানেন, সে মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করা উদাসীন পথিকের সাধ্য নহে। জন্মভূমি পশুরাও ভালবাসে, পক্ষীরাও ভাল চেনে, কীট-পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণীরাও বোধহয় হঠাৎ ভুলিয়া যায় না। আপন আপন বাসস্থান, বাসা, কোটর, গর্ত, অগাধজলে অনায়াসে চিনিয়া যাওয়াআসা করে। সীমা-বিশিষ্ট—জ্ঞানের ভালবাসাই চেনা, এবং আপন আপন স্থানে সমমত চিনিয়া যাওয়া।

মিসেস কেনী জন্মভূমিতে পা বাখিয়াই যেন বিবস্ত্র হইয়াছেন। কেহ দুহাত তুলিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দম্ববমত সেলাম বাজায় না। সরিয়াও দাঁড়ায় না। গা ঘেঁষিয়াই যাতায়াত করে। মান মর্যাদার নাম নাই। খানসামা নাই, বেয়ারা নাই, বাবুরচি নাই, সর্দারবেয়ারা নাই, বয় (boy) নাই। সমুদায় কাজ নিজে করিতে হয়। ইস্তক রন্ধন-লাগাদশয্যা, তাহার পরেও ছি! ছি! বড় স্বগার কথা। নিজের মলমূত্র নিজেই পরিষ্কার—চিঠিখানা দিতে হলেও ডাক-ঘবে নিজে যাঠিতে হয়। হুকুমের-তানে কেহই খাটে না। একে বলিতে দশজন আসিয়া উপস্থিত হয় না। অগাধ হুকুম কেহই শুনে না। ভদ্রতা ব্যবহারে কার্য্য করিতে হয়, কথা বলিতে হয়। সকলের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতা ব্যবহার না করিলে বড়ই অপদস্ত হইতে হয়। চক্ষু রাঙ্গাইয়া, সাদা মুখ বাঁকা করিয়া কার্য্য লওয়া দূরে থাকুক, প্রতি কার্য্যে ধন্বাদ না দিলে, অসভ্য, জঙ্গলী বলিয়া বেতন-ভোগী কার্য্যকারকেরাও উপেক্ষা কবে। নির্ধারিত এবং নিয়মিত কার্য্য সময়েই একটু নরম বোধহয়। তাহারপরেই যেন অগ্ন্যভাব। খাওয়া দাওয়াতেও অস্থখের একশেষ। মুরগী মেলে না। আগা পাওয়া যায় না। তরকারীও তথৈবচ। পাওয়া যে না যায় তাহা নহে। দাম কত? সে দামের কথা হঠাৎ শুনিলে, সোনার ভারতের কথা মনে পড়ে। এইপ্রকারে মিসেস কেনী ভাবিতেছেন আর বলিতেছেন—এমন প্রভুভক্ত দেশ কোথাও নাই, আমার বোধহয় জগতে নাই। চাকরে-মনিবে কি সঙ্ক, রাজা-প্রজায় কি সঙ্ক, তাহা ভারতবাসীরাই জানে। সেকথা আর কি বলিব। আমাদিগকে দেবদেবীর ত্রায় পূজা করে। রাস্তা-ঘাটে জেখিলে সেলাম বাজাইয়া পঞ্চাশ হাত সরিয়া যায়। দিবারাত্রি খাটুনি—চাকর

হইলেই যেন সে চিরকালের জ্ঞা বাধা পড়িল। সর্বদা প্রস্তুত, সর্বদা ষোড়হাত ৮ মার কাট কথাটি মুখে নাই। যত ইচ্ছা মাথায় বোঝা চাপাও আহা কি উচ্চ শব্দটি মুখে নাই। যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লও কিছুই বলিবে না। যেমন অবোধ তেমনই সরল। আর কত বলিব। যাহা ইচ্ছা তাহা কর, সোভাগ্য-জ্ঞানে সঞ্চ করিবে, কত সাহেব শিকার করিতে যাইয়া, মাছুষ শিকাব কবিয়া বসেন, কিছুই হয় না। ক্রোধবসে এড়ির গুতোয় পিলে কাটাইয়া দেন, টু শব্দটি মুখে আনে না। টাকা লইতে ইচ্ছা হইল, হুকুম জাবি করিয়া দাও অমনি আদায়। আমাদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, রূপা বলিগা দস্তা হাতে দেও, মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। এমনই ভক্তি যে আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া আমাদেরকেই কায়মনে পূজা করে, মনের সহিত সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে, এ দেশের ছাইভস্ম জিনিস দেখিয়া—ভুলিয়া সকলই আমাদেরকে দেয়। এই আমি যে খণ্ডে বাস কবি, সমুদায় ক্ষমতা আমার হস্তে—আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি। পরিশ্রম তাহাদের, ভোগ আমাদের। এমনই সরল, এমনই সাধু যে, সর্বস্ব দিয়াও আমাদের খাতিব রাখে, মন যোগায়। হায়! হায়! এমন সোনার দেশ কি আছে? আমার এত কষ্ট হইতেছে যে, একমুখে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। খাওয়া দাওয়াই সুখই বা কত! দান-দাতব্যের ঘটাই বা কত! আদর-অভ্যর্থনার ধুমই বা কত! সকলেরই বাড়ি, ঘর, দোর আছে, ঝাইবার সংস্থা আছে। সাতপুরুষ দূরে থাকুক এক জীবনের মধ্যে ষাট দিনও কেহ গাছতলায় বাস করে না। ভাড়া দিয়াও পবের ঘরে নিদ্রা যায় না। যেমনই হোক থাকিবার, শুইবার ঘর সকলেরই আছে। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরি জানে না। মিথ্যাতান করিয়া কাহাবও সম্পত্তি হরণের কেহ চেষ্টা করে না। তবে যাহারা পাওনাদার, তাহারাই দাবী করে, মামলা-মকদ্দমাও হয়। সে বিচারও আমবাই করিয়া থাকি। বিচার-দরুন নজর সেলামী টাকা লই। তাহাদেরই দেশ, তাহাদেরই টাকা, তাহাদেরই সম্পত্তি—মজা করি আমরা। এমন সুখ কি আর কোথাও আছে?

আহা সে দেশের দ্বীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগে। তাহারা যেন বন্দিনী! চিরবন্দিনী! ঘাটে-মাঠে বাহির হয় না। সর্বদা মাথা, মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা করা দূরে থাক, হঠাৎ নজর

পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশি বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধকরে এক পরিবারস্থ একবাড়ির আপন আত্মীয়-স্বজন— এমন কি পিতার সম্মুখেও আহ্বার কবে না। স্বামীসহ সর্বদা একত্র উঠাবসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয় না। অতের কথা কে বলে। পুরুষেরাই সর্বেসকী, পুরুষেরাই তাহাদের হৃদয়কর্তা একরূপ বিধাতা। স্বামীমুখে কতকথা শুনিতেছে, কত বকুনি খাইতেছে সময় সময় স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, করিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ করে। এত কষ্ট, এত অসুখ, এত যন্ত্রণা, তবু পিতামাতায় ভক্তি, ভ্রাতাভগ্নীতে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মা, একপ্রাণ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা কোথায়ও শুনি নাই। কেতাবে স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, মিথ্যা বলিতেছি না, আমবা সেই স্বর্গের রাজ্যে বাস করিতেছি। এই কতকদিনে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। ক্ষণকালও আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আজই মিষ্টার কেনীকে পত্র লিখিব এবং এই সপ্তাহেই দেশের মুখে চুনকালি দিয়া সোনার ভাবতে যাত্রা করিব। বাপরে! এমন বে-আদব, বেতমিজ্জ দেশে ভদ্রলোক বাস করে? সকলই সমান। কেহ কাহারও খাতির রাখে না—গ্রাহ করে না—মাত্ৰও করে না। ছ-দও বসিয়া খোসগল্লেও সময় অতিবাহিত করে না। চাকর বেতনভোগী। চাকর মনিবের কত প্রশংসা করিবে, কত প্রকার যশঃগান গাইবে। সে কথার আভাষ কাহারও মুখে নাই। নির্ধারিত বেতন, নিয়মিত কার্য্য। আর সকলেই যেন ব্যস্ত, আপন আপন কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত। ইস্তক লক্ষ্যপতি ধনী, লাগাদ মুটে, মজুর, সকলেই আপন আপন কার্য্যে সমান ব্যস্ত। কাথোর মূল্যে অবশ্যই ন্যূনাধিক আছে। কিন্তু ব্যস্ত ও যত্নের মূল্য সকলেরই সমান। এমন কড়া দেশে আর আমার বাস করা সাজে না। আমি শীঘ্রই এদেশ পরিত্যাগ করিব। এ জীবন থাকিতে আর জন্মভূমির নাম করিব না।

মিসেস কেনী সেইদিবসই শালঘর মধ্যায় কেনীর নিকট পত্র লিখিয়া নিজে ডাকঘরে দিয়া আসিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর! নাথ! আর আমার সহ্য হয় না! বিরহ-বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়াছি। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। একরূপ ঘটিবে আগে জানিলে, বিরহে এত যাতনা আগে বুঝিলে,

নাথ ! আমি কখনই শালঘর মধুয়া পরিত্যাগ করিতাম না । ক্ষণকালের জ্ঞাত ছাড়িয়া আসিতাম না । খুব শিক্ষা হইল । আর না কখনই আর একরূপ হইবে না । আমি শীঘ্রই পৌঁছিতেছি । এই সপ্তাহেই জাহাজে উঠিব । অল্পই টিকিট খরিদ করিব ।

উনবিংশ তরঙ্গ

প্যারীসুন্দরীর পরিণাম

কুঠি লুটের মোকদ্দমায়, হাজারী আসামীগণের ফাটক হইয়াছে । দারোগা খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই—গ্রেপ্তারও হয় নাই । কিছুই সন্ধান হইতেছে না । সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদায় জমিদারী ক্রোক করিয়া আছি-সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন । বরিশালের নিকট সায়েস্তাবাদ নিবাসী সৈয়দ আবি আবদুল্লাহ আছি-সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সমুদায় জমিদারী সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রোক করিয়া কার্য চালাইতেছেন । প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়াছেন । বহু তদবিব, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে জমিদারী খালাস করিলেন ।

নিরপরাধী কয়েকজন আমলা এবং বাজে চাকর, বিনা অপরাধে সাক্ষীর দোষে, দোষী সাব্যস্ত—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল । অল্পদায়ে চাকুরীতে মজিয়া, একেবারে প্রাণেই মারা পাইল । বামলোচন খালাশ পাইলেন । “আহম্মদ” মনিবের আদেশে বিশেষ কতব্য-কার্য্য করিতে গিয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইল । কান্তর মাতার চির-কান্না সার হইল । বাঁসুর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া গেল । প্যারীসুন্দরী জমিদারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণ-দায় হইতে মুক্তি হইলেন । আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রায় কমিয়া গেল । পাঠক ! প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সাক্ষ হইয়া অল্প কথা আরম্ভ হইল ।

বিংশ তরঙ্গ

মীরসাহেবের নৌকাযাত্রা

পূর্বকথা! অল্পসারে মীরসাহেব এক্ষণে সিরাজগঞ্জের অধীন সৌলিগ্রামে জমীর বাটিতে বাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন । নিকটেই গৌরীনদী হইয়া ধুমাকলের

নৌকা (ষ্টিমার) প্রায়ই উজ্জান-ভাটি যাতায়াত করে। কিন্তু কোথায় যায়, কোথা হইতে আইসে তাহার খোঁজ খবর কেহই রাখেন না। সকলের মনেই বিশ্বাস যে, সাহেবলোক না হইলে, ধুমাকলের নৌকায় দেশীলোকের চড়িবার অধিকার নাই। সাহস করিয়া সে সময় ষ্টিমারে চড়িতেও কেহ ইচ্ছা করে নাই।

নদীগর্ভে দপ দপ শব্দ হইলে এবং আকাশে ধোঁয়া দেখিলেই তীরস্থ গ্রাম-বাসীরা আপন আপন কর্ম ফেলিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং চলতি ষ্টিমার দেখিয়াই চক্ষু জুড়াইত। নদীতীরে যে যে স্থানে পাখুরিয়া কয়লার আড্ডা, সেই সেই স্থানে ষ্টিমার আগাইয়া কয়লা লইয়াই চলিয়া যাইত। কোন আরোহী কি বাঙ্গালীব মালামাল লইত না। কেহ মাল দিতেও প্রস্তুত হইত না। কোম্পানীর কার্য্যই কবিত, মালামাল যাহা কিছু আমদানী-রপ্তানি হইত সে কুঠি-য়াল নীলকরের একচেটিয়া।

মীরসাহেব নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ যাইতেছেন। বিছানা, বালিশ, খাণ্ড-সামগ্রীর ভার, ভাবে ভাবে দাঁড়ী-মাকিরা এবং কুলী মজুরেরা নৌকায় তুলিতেছে। বাবুচিখানা নৌকায়—জ্বালানী কাঠ, বাউলী, বটি, হাতা, তামার পাতিল ঝাঁকা বোঝাই করিয়া উঠাইতেছে। বসীরুদ্দিন নিজের কাপড়ের গাঁটরী, সেতার, তবলা ইত্যাদি বাহকের মাথায় দিয়া নৌকায় উঠাইতেছে, পাশা-খেলার কোট, গুটী আপনহাতে রাখিয়াছেন।

সা গোলাম, দেবীপ্রসাদ এবং অন্যান্য কন্মচারী, দুই চারিজন প্রতিবেশী মীরসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে নৌকা পর্য্যন্ত যাইতেছেন। সা গোলামের মুখে কথা নাই, বড়ই দুঃখিত, বড়ই চিন্তিত। এত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না, অছিয়তনামা হাতে আসিল না। কি হইল? শেষে কি হইবে? এই চিন্তাতেই একবারে সারা হইতেছেন। আহা-বিহারে, সাংসারিক কার্য্যে কিছুতেই মন নাই—কিছুতেই আরাম নাই, বড়ই উদ্বিগ্ন—চিন্তার সহিত উদ্বিগ্ন।

অছিয়তনামা নিশ্চয়ই মীরসাহেবের হাতবাক্সে আছে, এইটি তার ঞ্বে বিশ্বাস। এইতো হাতছাড়া হইয়া চলিল। এইতো চলিয়া গেল। আর কি হইবে। সকল আশায় ছাই পড়িল। ঐ তো এখনি হাতবাক্স হাতছাড়া হইয়া চলিল। উপায় কি? মনের আশা মনেই মিটিয়া গেল। মধ্যখানে কতগুলি কথা দেবীপ্রসাদের কানে গেল। একবার মনে করিলেন, হাতবাক্সটা চাকরের হাত

হইতে কাড়িয়া লই। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে। আবার ভাবিলেন যদি এ বাস্কেও না থাকে. তবে আরও বিপদ। এতকালের পরিশ্রম, চিন্তা সকলই মাটি। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন।

মীরসাহেব গৌরীতটে যাইয়া নৌকায় না উঠিয়া জলের কিনারায় দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও দাঁড়াইল। সা গোলামকে দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—বাপু! চিন্তা কি? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমি তো আর চিরকালের জন্ত যাইতেছি না যে, এত দুঃখিত হইয়াছ। বিষয়াদি, বাড়ি, ঘর, পরিবার সকলই থাকিল। আপন কাজকর্ম দেখিয়া করিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার কাবণ থাকিল না! মধ্যে মধ্যে কেনীব সহিত সাক্ষাৎ করিও। কোন গুরুতর কাৰ্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি যেক্রপ উপদেশ দেন, সেইক্রপ করিবে। সাবধান! কেনীব সহিত কোন বিষয়ে গোলযোগ না হয়। সাবধান! লোকের কথাও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইও না। এইপ্রকার নানা কথা বলিয়া, সা গোলামের মাথায়, মুখে, হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া মীরসাহেব বিদায় হইলেন। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সালাম বাজাইল। নৌকার সিঁড়ির উপর উঠিতেই কি কথা মনে হইয়া হাতবাক্স আনিতে অস্থমতি করিলেন। বাক্স খুলিয়া একখান জড়ান কাগজ বাহির করিয়া, সা গোলামকে বলিলেন—আমি নৌকাপথে যাইতেছি। পদ্মা, যমুনা হইয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না না। এই দলিলখানিই মূল। ইহাই আমাদের সর্বস্ব-ধন! আমার পিতা-কৃত “অছিয়তনামা” এই দলিলখানি বড় দরকারী এবং আবশ্যকীয় দলিল—হারাইলেই সর্বস্ব হারাইতে হইবে। কারণ এ সম্পত্তির শত্রু অনেক। আর যত দলিল আপনাকে দিয়াছি, সকলের অপেক্ষা এ-খানি অধিক সাবধানে যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। জলের উপরে যাওয়া, এ সকল দলিল বাটিতে সাবধানে রাখাই ভাল। বাপু! সাবধানের মার নাই। আমি বহু যত্নে দলিলখানি সর্বদা আপনকাছে রাখিতাম, তুমিও যত্নেই রাখিবে। বিশেষ সাব-ধানে রাখিবে বলিয়া অছিয়তনামা সা গোলামের হাতে দিলেন।

সা গোলাম অছিয়তনামা হাতে পাইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। যা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই ঘটিল। যাহার জন্ত এত চক্র, যে দলিল

হস্তগত কবিবার জ্ঞান তুষ্কে বিষদান, কবিরাজের সহিত ষড়্‌বল্ল, কত চক্র, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, আজ তাঁহার ভাগ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই বিশ্বাসী পাত্র করিয়া মীরসাহেবের সর্বনাশ ঘটাইতে মীরসাহেব হস্তেই অছিয়তনামা না গোলামের হস্তগত হইল। কি আশ্চর্য! ঘটনাস্রোত নিবারণ করে সাধ্য কার! বিধির-নির্বন্ধ ঘূচাইতে ক্ষমতা কার! আত্মবিশ্বাসে খণ্ডরকে প্রণাম করিতেও না গোলামের মনে হইল না। মীরসাহেব নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা লগি উঠাইয়া “দরিয়া গাজী, পাঁচ পীর বদর বদর” বলিতে বলিতে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিল। স্রবাতাস পাইয়া দাঁড়ীরা আর গুণ টানিতে নামিল না। পাইল খাটাইয়া মনের আনন্দে যাইতে লাগিল। নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ু-সহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীরসাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন।

একবিংশ তরঙ্গ

গারদের কয়েদী

ছয়মাস যায় পেটে অন্ন নাই, তবে বাঁচে কিসে? প্রাতে প্রতিজন একসের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটা জল ইহাই মালখানার কয়েদীর আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিনস্থান। যাহার ভাগ্যে সে গারদবাসের অবসর হয় তাহার জীবনে সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোবের অত্যাচারে, অর্থপিশাচদিগের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না। তবে যাহার আত্মীয়-স্বজন আছে, ভুটাকা সেলামী—গারদ-সেলামী দিবার সাধ্য আছে, তাহার পক্ষে দুই একদিন একটু নরমে যায়। তাহারপরেই হাড় ভাজাভাজা হয়। প্রাণ যাই যাই করে। মানুষের কঠিন প্রাণ—বিশেষ বিপদগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ব্যক্তির কষ্টের জীবন। সহজে প্রাণ বাহির হয় না। তাহাতেই কেনীর গারদের কয়েদী—কাজী সমসের আলী এবং তাঁহার ভাতৃপুত্রগণের প্রাণ আজ পর্যন্ত বাহির হইয়া সংসারচক্রের জালা-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় নাই। হায়! কি দুঃখের কথা! বিনাপরাধে কয়েদ। পৈতৃক সম্পত্তি লিখিয়া দেয় নাই, তাহাতেই এই বিপদ—গারদে আবদ্ধ। দ্বারে দ্বারে খাড়া পাহারা। হায়! কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে? কোন হাতে, কোন কলমে, কোন

কালিতে, কোন কাগজে লিখিয়া দিবে? পৈতৃক সম্পত্তি, বাহার আয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কতজনার প্রাণ ঝুঁটিতেছে। কত বিধবার জাতি, ধর্ম রক্ষা পাইতেছে। কত পিতৃহীন বালকের একমুঠা ভালভাতের সংস্থান রহিয়াছে। কত পুত্রহীনা বৃদ্ধার জীবনোপায়ের উপায় রহিয়াছে। কোনপ্রাণে বিনাপ্রাণে লিখিয়া দিবে? আবার প্রাণেও আর সহ হয় না। কষ্টের দিন শীঘ্র যায় না। সে রজনী শীঘ্র প্রভাত হয় না। এ সকল সহিয়াও সমসের আলী ভ্রাতৃস্পৃহাগণসহ আজ ছয়মাস বন্দী। সেই যে বসন পড়িয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই যে বিছানা হইতে হাত পা রাখিয়া, নিশীযোগে ডাকাতের ন্যায় কেনীর লাঠিয়াল সমসের আলীর বাড়িতে পড়িয়া, শয়নঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কুঠিতে আনিয়াছে। ভ্রাতৃস্পৃহাগণ বৃদ্ধ খুড়ার উদ্ধারহেতু কুঠিতে ইচ্ছাপূর্বক আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, ফাঁদে ঝাঁটকিয়াছে, গারদখানায় নীত হইয়া বৃদ্ধ খুড়াব সহিত যন্ত্রণাব একশেষ ভোগ করিতেছে। ক্ষৌরী কাষ্য নাই। চুল বাড়িয়াছে, হাতপায়ের নখ বাড়িয়া সেই এক বিশ্রীভাব ধারণ করিয়াছে। চিন্তায়, ভাবনায়, পেটের জ্বালায় অস্থি-চর্মসার হইয়াছে। যাহাদের বীরত্ব কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সেই সকল বীরবাহুগণ, বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অম্মাভাবে ক্ষীণকায় এবং হীনবল হইয়া জরাগ্রস্ত চিররোগীর ন্যায় গারদের মধ্যে পড়িয়া জীয়ন্ত মৃত্যুযাতনায় অস্থির হইয়া ছটকট কবিতোছে। কে দেখে? কে জিজ্ঞাসা করে? সূর্য্য-অস্ত না হইলে আর দ্বার খোলা হয় না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞেস করে না। কাছে আসে না, একঘটা জল এগিয়ে দেয় না। খুড়া—ভাইপোয়ে অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্তা হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আর কতকাল এভাবে থাকিব। সাহেব যে প্রকারে লিখাপড়া করিতে চাহে, দিয়া চল অন্তর্দেশে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। পরিবার প্রতিপালন করি। এ-কষ্ট আর সহ হয় না। এ-যন্ত্রণা আর প্রাণে সয় না। সম্পত্তির জগুই যখন এতকষ্ট তখন আর সে সম্পত্তিতে লাভ কি? বিপদ-মাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই সম্পত্তিই আমাদের কাল হইয়াছিল। সম্পত্তি ছিল বলিয়াই এতকষ্ট। পৈতৃক বিষয়বিভব ছিল বলিয়াই আজ আমরা কেনীর গারদে। সন্ধ্যার পর দরজা খুলিবেই, একঘটা করিয়া জল দেওয়া—ওটা একটা তান মাত্র। দুবেলা দুবার দরজা খোলার কারণই এই যে, আমরা কোন কৌশলে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করি, কি

পারছে কয়েদী অবস্থাতেই থাকি, কি নূতন কোনরূপ ঘটানোর মন্ত্রপার চেষ্টা করি। অবশুই দরজা খুলিবে সেইসময় বলিয়া দিব যে, আমাদের বিষয়াদি, বাড়িঘর সমুদায় লিখিয়া দিতে রাজী আছি। আমাদেরকে কয়েদখানা হইতে বাহির কর। প্রাণ বাঁচাও।

সময়মত জীবনদাতার নিকটে মনের কথা জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশুই সে তাহার কর্তব্যাকার্য্য করিয়াছে। প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রীর নিকট বলিয়াছে। কোনই ফল হইল না। হরনাথ মিশ্রী, শত্ৰু সাংঘাত প্রভৃতি কার্য্যকারকগণ মহাঅস্থির—সপ্তাহকাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেনী শয়নকক্ষ হইতে আর নীচে নামিয়া আইসেন না, উপরেই থাকেন। কি ভাবে থাকেন, তাহা কাহারও জানিবার ক্ষমতা হয় না। যে কেনী সাংসারিক কার্য্যে সর্বদা ব্যস্ত, সর্বদা প্রস্তুত। মুহূর্তের জগৎ সংসার ভুলে না। আজ সপ্তাহকাল একেবারে নিরব। আরদালী, চাপরাসী দ্বারা খবর পাঠান হইয়াছে কোন উত্তর আইসে নাই। কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেনীর ছকুম “আমার বিনাদেশে আমার নিকট কেহ না আইসে।” সে আদেশ ঠেলিয়া কারসাধ্য সেদিকে পা ধরে। কাজেই সকলে মহাব্যস্ত। পাংশার ভৈরববাবুকে লইয়াই এখন চলিতেছে। কত মাব পেঁচ, পেঁচাও বুদ্ধির পাক নায়েবমশায়ের মাথায় ঘুরিতেছে। কত মিথ্যা প্রবঞ্চনার বৃহৎকনা সকল নীলকরের চাকরের মক্কাভূমিসদৃশ মনোক্ষেত্রে চাকচিক্য দেখাইয়া, মনিবের মনভাবের কারণ অব্যক্ত অজ্ঞাতহেতু চিন্তাবায়ুর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া কোথায় পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না। কুল-কিনারা পাইতেছে না। এতদিন কয়েদের পর সমসের আলী পৈতৃক সম্পত্তি যোলআনা বিনাপণে লিখিয়া দিতে রাজি হইয়াছে। সে কথাও জানাইতে পারিতেছেন না। একেবারে নিষেধ। কেহ কোনকথা লইয়া তাহার বিনামুমতিতে কে তাহার সম্মুখে যায়।

মেমসাহেবের আসিবার দিনও অতিনিকট হইয়া আসিতেছে। প্রথম বিলাতেব পত্র, তাহারপর কলিকাতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেও প্রায় দশ বার দিন। বাতাসের জোর নাই বলিয়া, বজরা-নৌকা আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। সকলেরই অমুমান এই যে, অগ্ন লাগাদসন্ধ্যা অবশুই বজরা ঘাটে লাগিবে। নিতান্ত পক্ষে না আসিলে কাল আর কিছুতেই পথে থাকা সম্ভব নহে।

টি. আই. কেনী আজ সপ্তাহকাল নির্জনে বাস করিতেছেন। বিষয়বিভবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা-মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ কি কারণে, তিনিই জানেন। বাহার স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া পাঠকগণেব নিকট প্রকাশ করিতে উদাসীন পথিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীর, স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিবার পথিকের ক্ষমতাই নাই। কেনী কয়েকদিন হইতেই বিষাদিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? সে স্বদীর্ঘ গোঁপ এবং গালপাট্টা সংযুক্ত ধবল মুখ এত মলিন হওয়ার কারণ কি? সে নিটোল, নিরেট বিলাতী মজ্জাপূর্ণ বৃহদাকার মস্তক সর্বদা বালিশের আশ্রয়ে থাকিবার কারণ? সে রক্তরাগ পরিপূর্ণ হৃদয়-মধ্যে সর্বদা জাগে কি? সাধ্য নাই—বুঝিবার সাধ্য নাই! উদাসীন পথিকের বুঝিবার সাধ্য নাই। সহস্র অবলার অঙ্গাবরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুও নড়ে নাই, শত-সহস্র প্রজার ঘরের চালের আঙুন দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—জালাও, লাগাও, লুটিয়া লও, এই সকল হুকুম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, কুল-বধুর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু ঐ সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল! গণ্ডস্থল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্গের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম কে বুঝিবে? তবে কি যে কারণে মহাবিদ্যান অপদস্থ, বুদ্ধিমান নিরস্থ, পূণ্যবান অধস্থ, ধনবান বিপদগ্রস্ত, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরাস্ত, সেই কারণেই কি এই কারণ?—যাক বাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মনের কথা কে জানে? যে জানে, সে জানে, সে বুঝে তাহার গোপন করাই কর্তব্য। উভয়েই বন্দী, কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায়।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

মিলন

অক্সমান মিথ্যা হইল। মিসেস কেনী সেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন না। প্রধান প্রধান কার্যাকারকগণের দ্বিতীয় একটি চিন্তার কারণ হইল। আজিকার দিনও যায় যায়। কিন্তু কুঠির আমলা, চাকর, নেগাহবানগণ সকলেই দেখিল যে, কেনী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া শয়নগৃহের সম্মুখস্থ ফুলবাগানে ধীরে

ধীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের সংলগ্ন কালীগঙ্গা, দুই একবার ফিরিয়া ফুরিয়া কালীগঙ্গার তীরে যাইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া দূরবীন দ্বারা কি যেন দেখিতেছেন। হরনাথ মিশ্রী সময় বুঝিয়া বন্দী কাজী সমসের আলীকে লইয়া বাগানের গেটের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কেনী দ্বিতীয়বার ফুরিয়া আসিতেই হরনাথের উপর নজর পড়িল। একটু ত্রস্ত-পদে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি? কাজীসাহেব এবশে কোথা হইতে আসিলেন।

হরনাথের মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই কাজী সমসের আলী বলিতে লাগিলেন সাহেব! তোমাব যেক্রপ ইচ্ছা হয় লিখিয়া লও। আর আমরা বাঁচি না। আর প্রাণে সহ্য হয় না।

কেনী একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—কি হইয়াছে? আপনি এতদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই কেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? ভাল আছেন তো? লোকে আগে বুঝে না, শেষে পায় ধরিয়া কান্দিতে থাকে। আচ্ছা আর আমার কোন আপত্তি নাই। সকলই মিটিয়া যাইবে—লিখাপড়া কন্যাই হইবে। আব আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কাজীসাহেব বলিলেন—ব্যস্ত আমরাই এখন বেশী হইয়াছি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর অধিক কি বলিব! পৈতৃক তালুক, জোত ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু আছে, সমুদায় লিখিয়া লইয়া আমাদেরকে ছাড়িয়া দিন। আর বাঁচি না। দোহাই আপনার! প্রাণ গেল—আর বাঁচি না।

কেনী বলিলেন—“বাঁচি না. বাঁচি না” করিতেছেন, আগে বুঝেন নাই কেন? আচ্ছা, আজ কোনকথা হইবে না। বোধহয় মেমসাহেব এখনই আসিয়া পৌঁছিবেন। আমি তাঁহার বজ্রার মাস্তুল দেখিতে পাইয়াছি। বোধহয় কুঠির বজ্রাই আসিতেছে আপনি এখন আপনার বাসস্থানে গমন করুন। কাল লিখাপড়া হইবে—আজ দিবি আহার করিয়া শয়ন করুন গে।

কাজী সাহেব মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। বরাতে যাহা আছে তাহাই আহার করিব। কোন পাপে ইহা ঘটিল—খোদায় মালুম। আর আপনাকে কি বলিব। চলিলাম, আপনার গুদাম ঘরেই চলিলাম।

কেনী মুচকি হাসির আস্তা দেখাইয়া আবার নদীর তীরে যাইয়া দূরবীন

চক্ষে ধরিলেন। দেখিলেন, এবারে স্পষ্ট দেখিলেন। সেই বজরা—সেই তাঁহারই কুঠির বজরা। যে বজরায় মেমসাহেব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। * স্বেচ্ছাসেবক পাইয়া পাইলভরে জল কাটিয়া শ্রোত ঠেলিয়া যেন উড়িয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বজরা নিকটবর্তী হইল, পাইল পড়িয়া গেল সকলেই দেখিল মেমসাহেব ছাতের উপর ইজিচেয়ারে কুঠির দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে বজরা ঘাটে লাগিল। লাগিবামাত্র সিঁড়ি পড়িল। টি. আই. কেনী দ্রুত-পদে ঘাইয়া প্রিয়-তমার হস্ত ধারণ করিলেন। কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের স্তম্ভবোধ-স্থানে বাব বার চুষন করিলেন। এবং প্রাণ প্রতিমার দক্ষিণহস্ত বামবগলে চাপিয়া ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিলেন। মেমসাহেবের আসবাব, লগুজাজিমা ঘরে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অস্বীকার করিয়া লোকের চক্ষুজ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলনস্থলের স্তব্ধতা করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে, ভাবদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটিমিটি ভাবে চাহিতে চাহিতে, বিমানরাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীব শোভাবর্ধন কবিতা লাগিলেন। পুরাতন-দম্পতি বিশ্রামগৃহে, মখমলমণ্ডিত-কোচে উপবেশন করিয়া হাসিমুখে নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

সোনাউল্লার স্মৃতি দেখে কে? সর্দার বেহারার ছুটাছুটির অন্ত পায় কে? দেয়ালগীর, ল্যাম্প, লণ্ঠন, হাতবাতি যেখানে যাহা প্রয়োজন মনের আনন্দে জালিয়া দিয়া মেমসাহেবের শয্যার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

নিয়মিত সময় সাহেব, মেমসাহেব আহারাদি সমাপন করিয়া আপন আপন শয্যায় গমন করিলেন। মিসেস কয়েকমাস পরে কুঠিতে আসিয়াছেন। পরিবর্তন-শীলা জগতে পরিবর্তন কথা নূতন নহে। মিসেস কেনী রাত্রিবাস পরিধেয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পালঙ্কে বসিয়াছেন। মনে নানাকথা উদয় হইয়াছে। স্বামীর হাবভাব, চাকরদের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার মনে মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অল্পপস্থিতকালে, বিশেষ কোন ঘটনা যেন ঘটয়া গিয়াছে। কি ঘটিল? কি হইল? এমন ঘটনা কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিলেন, কোন কিছুই স্থির হইল না। স্বভাবতঃই হউক কি চিন্তার বিকারেই

হউক, কি দশ-বারদিন নৌকায় থাকা গতিকে মাথার ঘোষেই হউক, স্থির করিলেন, একটি স্থির করিতে দশটির প্রমাণ পাইলেন। প্রথম বজরায় স্বামীর কবল্লার্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব বিজলীছটা শরীরের নানাস্থানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব রসময় প্রেম-চুম্বনে প্রেমাত্মরূপ যেন বৃদ্ধি করে নাই। বজরার সিঁড়ি হইতে নামিবার সময়, হরিহরআত্মা হইয়া নামিয়াও প্রেমউল্লাসে মন গলিয়া যায় নাই। কারণ কি? তাইতো একত্র একাসান বসিয়াও হৃদয়কমল, অত্মরূপ প্রতিভায় যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্বের ত্রায় স্নেহ বোধহয় নাই—তৃপ্তি জন্মে নাই। স্নম্পুর আশ্রমের মাস স্বামীহস্তে গ্রহণ করিয়াও যেন মন খোলে নাই। কাণে কি অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক কথা মনে তুলিলেন, কিছুতেই মন বুঝিল না। শান্তিস্থখে-মন ভরিল না—মজিল না। কেন এমন হইল? দোষ কাহার? লজ্জিত হইলেন। নিকটস্থ বৃহৎ দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। উপস্থিত চিন্তার সমালোচনার ফল প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। সে মনোবেগ আমাতে প্রবেশ করিবে, আমার মনোবেগ তাঁহাতে যাইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধহইল দোষ তাঁহার? তাঁহারই মনে যেন কি বসিয়াছে। স্বামী-হৃদয়েই যেন কি পশিয়াছে। পুরুষের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণের কাজ। চিন্তা কি? আজ নাই কাল, কাল নাই পরন্তু, বুঝিতেই পাবিবে। কয়দিন গোপনে থাকিবে? রাত্রিও অধিক হইয়াছে। কয়েকদিন জলেব উপর থাকিয়া এখনও যেন মাথা তুলিতেছে। একটু শ্বুমাই।

ত্রয়োবিংশ তবঙ্গ

অধঃপাতের সূত্রপাত

ময়নার মৃত্যুর পর জকি প্রায়ই স্কন্দবপুর যাইত। দুই-তিনদিন থাকিয়া আবার আসিত। জকির প্রতি টি. আই. কেনোব বিশেষ অনুরাগ। ময়নার মৃত্যুর পর জকির ইচ্ছাধীন চাকুরী হইয়াছে। জকী অভাবে কোন কাজকর্ম আর বন্ধ থাকে না। গুদামের চাবি, দানার গোলাচ চাবি জমাদারের হস্তে গিয়াছে। জকির ছোট স্ত্রী মাখনা সপত্নীর নিকট যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার প্রতিবর্ণ অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। জকিকে দেখিলেই মাখনার শরীরে আশ্রয়

জলিয়া উঠে। মাথনা ক্ষুব্ধিত করে, চক্ষু পাকল করে, ভার ভার মুখখানি আরও ভারি করিয়া সরিয়া যায়। জকির মুখ দেখিতেই একেবারে নারাজ। কি করে, উপায় নাই। আর কি করিতে পারে?

ভারতে জ্ঞীর নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর। বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয় করে। স্বামী দেবতা, স্বামী অন্নদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণকর্তা,—স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীই সকল, স্বামী পদসেবা করাই কুলজ্ঞীর প্রধান ধর্ম। জকি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, স্বন্দরপুরের কোন লোক আজ আসিয়াছিল? মাথনা বলিল—“একটি লোক আসিয়াছিল। তোমার নাম করিয়া ভাই! ভাই! বলিয়া, কয়েকবার ডাকিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বাটিতে কেহই ছিল না আমি কোনকথার উত্তর দেই নাই।”

জকি রোষভরে বলিল—“এমন হতভাগিনী তো আর দেখি নাই যে, আমি বাটিতে নাই বলিয়া কি আর কাহার সহিত কথা কহিতে নাই? তোদের তো বুদ্ধি নাই। তোরা মানুষও নহিন। বনের পশুও নহিস। একটি কাজ নষ্ট হইয়া গেল।” মাথনা বলিল—“আমি কি জানি, তোমার সহিত তাহার কি কাজ। ভাই ভাই করিয়া ডাকিল, আমি বেড়াব আডালে থাকিয়া দেখিলাম সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আছে। আর সেই লোকটির বগলে কাপড়ে জড়ান একটা ভারী কি জিনিস আছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া বগল হইতে কাপড়ের পুঁটলি মাটিতে ফেলিতেই বোধহইল যেন কতকগুলি পয়সা কি টাকাই একত্রে বাঁধা।”

জকি শুনিয়াই অস্থির। প্রকাশে বলিতে লাগিল—“তোদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই! আমি সাহেবের কুঠিতে থাকিয়া দেখিতেছি, নূতন কোন সাহেব আসিলে মেমসাহেব নিজে যাইয়া আগু বাড়াইয়া আনেন। দুইজনে চুমা খাওয়া হয়, গলায় গলায় মিশিয়া হাত ধরাধরি হয়। তোরা কোন কার্যের নহিস। কেবল ঘোমটা—তোদের কেবলই ঘোমটা।”

“আমি গরিব, দুঃখী বাঙালীর মেয়ে। বাঙালী আমাদের দেশ। আমার দেশের চাল-চলন যাহা আছে তাহাই করিব। সাহেব বড়লোক, দেশের রাজা। তাহার যাহা কখন, আবার সে সকল দেখিয়া দরকার কি? আমি গরিব মানুষ, মেমসাহেবের মত ব্যবহার করিতে আমার ক্ষমতা নাই। হইবেও না।”

“আমি জানি, যে আমার ঘরের লক্ষী ছিল সে চলিয়া গিয়াছে।”

“সে চলিয়া গিয়াছে না বাঁচিয়াছে। তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি টাকার লোভে তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাকে যে পথে চালাইয়াছ, যে প্রকারে বাঘের মুখে—মাহুঘ-বাঘের মুখে ধরিয়া দিয়াছ তাহা সকলি শুনিয়াছি। তুমি টাকা হাতে পাইলে না পার এমন কোন কুকাজ দুনিয়া-জাহানে নাই। সে কি করিবে? তোমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। নিজের প্রাণ নিজে দিতেও কতদিন সে প্রস্তুত হইয়াছে, পারে নাই। নিরুপায় হইয়া তোমার অত্যাচার সহিয়াছে। স্বামী হইয়া যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সে পাপের ভোগ তোমাকে কোনদিন ভোগ কবিতাই হইবে। তা যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমি তোমার দুখানি পাশ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার বাপ-মাঘের বাড়িতে আমাকে পাঠাইয়া দেও। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অনেকদিন হইতে মাকে দেখি না—বাবাও আর এখানে আসেন না। তাহাদিগকে দেখিবার জগা আমার মন বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি খোদার নাম করিয়া বলিতেছি, এখানকার কোনও কথা আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দেও। কিছুদিন পরে আমি আবার আসিব। তুমি না পাঠাও তাহাদিগকে খবর দিলে তাহারা আমাকে লইয়া যাইবে।”

জকির মুখে কথা নাই। যে কথা কেউ জানে না—মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, সেই কথা তুলিয়া এত কথা বলিল। জকির গা দিয়া ঘাম ছুটিল। রোষ-ভাব বহুদূর সরিয়া গিয়া লজ্জায় মাথা নিচু হইল। কালমুখ আর কাল হইয়া গেল। এই সময় বাটি হইতে কে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, ‘ভাই জকি বাড়িতে আছে?’

জকি গলার আওয়াজেই চিনিতে পারিয়া ভাঙ্গাস্বরে উত্তর করিল—ভাই! বাড়ির তিতরে আইস। আমার ঘরের লক্ষী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন এক অলক্ষীর হাতে পড়িয়াছি—আর আমার ভালাই নাই।

আগন্তুক বাড়ির মধ্যে উপস্থিত। জকি আদর করিয়া একখানি পিঁড়ি আনিয়া দিল, আগন্তুক ভ্রাতা ছাতি, লাঠি সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাত-পা ধুইবার জল, তখনই জলযোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা ভাইয়ের সম্মুখে দিয়া ময়নার মরণকথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া নানা-

প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল—‘তাই ! দুঃখ করিয়া আর কি লাভ হইবে ! শেকি আর ফিরিয়া আসিবে ? যে ভাল হয় সে থাকে না। এখন কথা শুন ! আমি আবার এখনই যাইব। বড় জরুরী কাজ।’

‘কথা তো শুনিয়াছি, আমিও প্রস্তুত আছি। তবে কথাটা কি জান ? আশা অনেকেই দেয়, কার্য-উদ্ধারের জন্য অনেকেই কথা বলিয়া থাকে। কাৰ্য শেষ হইলে বুঝিতেই পার—তুমি বা কে আমি বা কে ?’

‘সে কি কথা ! তুমি কি আমাকেও অবিশ্বাস কর ?’

জকি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল। ‘না—না তাও কি হয়। তোমায় অবিশ্বাস করিব ? তাও কি হয়।’

‘তবে আর আপত্তি কি ? আব দেখ তোমাকেই তো আগে বিশ্বাস করিয়াছে। কিছুই হয় নাই। কাজের কিছুই হয় নাই। আগেই তোমার হাতে একটি নয়, দুইটি নয়, দশটি নয়, পাঁচশত দিয়াছে। আর চাই কি ? অর্দ্ধেক তো হাতেই আসিয়াছে। আবার আমিও কিছু আনিয়াছি। এরপর যাহা বাকি থাকিবে, তুমি আমার নিকট হইতে লইও। তুমি জানিও, এদিকের চন্দ্র ওদিকে গেলেও সে ঘরের কথা, একটুও এদিক-ওদিক হইবে না। এখন তুমি পারিলে হয়। আর আমি বেশীক্ষণ তোমার বাটিতে থাকিব না। এই টাকা আর এই সেই জিনিস নেও, যত শীঘ্র হয় করিবে। আমি চলিলাম।’

জকি টাকার তোড়া এবং কাঠের ছোট একটি কোটা ত্রস্তে ভাইসাহেবের হস্ত হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ভাইসাহেবও ত্রস্তপদে বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

জকি ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বীকে বলিল—‘তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেহারাবাড়ি চলিলাম আজই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।’

জকি বাড়ির বাহির হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই বালাইকে আর এখানে রাখিব না। আজ আমাকে বলিল, কাল আর একজনকে বলিবে, ক্রমেই কথা প্রকাশ হইবে। ভাল হইল, কিছুদিন বাপ-মার বাড়ি গিয়া থাকুক।

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

বিষ

জকি জীকে বাপেরবাড়ি পাঠাইয়া কুঠিতে হাজিরা দিতে আসিয়াছে। সে-দিন নাই, সে-কাল নাই, সে আদর নাই, জকির সে খাতির নাই। জকির নামে কাহাব ভয়ও নাই। প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে, মেমসাহেবের বকুনি খাইতে হয়। কিন্তু মেমসাহেবের কামরা ব্যতীত জকির সকলস্থানেই যাওয়াব অধিকার আছে। সেটা এখনও বারণ হয় নাই।

অন্যকক্ষে সাহেব-মেম উভয়ে ত্রাণ্ডিপানীর স্বাদ লইতেছেন। মিসেস কেনী পূর্বে ত্রাণ্ডিব নাম শুনিতে পারিতেন না—এবাবে বিলাত হইতে আসিয়া খুব চালাইতেছেন। সকল সময় হাসি-খুশী-বাজনায় গানে সময় কাটাইতেছেন।

জকি মেমসাহেবের নিকট হাজিরা দিয়া সেলাম রাজাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু বাড়িতে আসিল না। একবার নীচে একবার উপরে, একবার বাবুরচিখানায়, একবার সাহেবের লিখিবার ঘরে, এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জকি যেন মনে মনে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কোন জিনিস খুঁজিবার ভাব নহে। সময় খুঁজিতেছে। স্বেযোগেব সন্ধান করিতেছে।

খানসামা, সর্দার বেহাবা সকলেই আপন আপন নিদিষ্টস্থানে বসিয়া নানা-প্রকারেব গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে। জকি পুনরায় উপরে আসিল। খানার মেজ্ঞ সাজান। সাহেব-মেম অন্য কামবায। খুব হাসি-তামাসার রগড় চলিতেছে। জকি ক্রমে ক্রমে খানাব কামরায় উপস্থিত। চাবদিকে তাকাইয়া অগ্রসর, আবার তাকাইয়া আরও অগ্রসর—চারদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। কোমরের খুঁট হইতে একটা কোটা বাহির করিল। কোটার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া কি দিব। সেই কোটা ভায়ের-দস্ত কোটা। কোটা হইতে কি যেন উঠাইয়া চা-দানির মধ্যে ফেলিয়া দিল। চা-দানির সরপোষ দিয়া পূর্বমত ঢাকিতেই ভয়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল। সরপোষের প্রতিঘাতে একটু শব্দ হইল। ঠিকভাবে পূর্বমত সরপোষ বসিল না। ভাল করিয়া পূর্বমত ঢাকিতেও আর সাহস হইল না। তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোনাউল্লা, সর্দার বেহারার খোশ-গলপে মন মাতাইয়া বসিয়াছিল। খানারকামরা মধ্যে হঠাৎ একটি শব্দ হইয়া তাহার কানে গিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া আসিয়া দেখা, কি, কি কারণে শব্দ তাহার কারণ অল্পসন্ধান করা তত

আবশ্যক মনে করিল না। কারণ মুখ ফিরাতেই দেখিল যে, জকি সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে। আর কোনরূপ সন্দেহের কারণই হইবার কথা নহে। জকি ঘরের চাকর, সাহেবের বিশ্বাসী ও ভালবাসার। অন্তলোক হইলে তখনই উঠিত। কি কারণে শব্দ হইল তাহার অনুসন্ধান করিত। জকিকে চিনিয়া আর উঠিল না। কান পাতিয়া রেঙ্গুনের গলপ শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণপরেই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া কেনী খানারকামরায় আসিলেন। সোনাউল্লা, বেহারী প্রভৃতি চাকরেবা হাজির। খানার বাসনের সরপোষ উন্মোচন হইল। ছুরি-কাঁটা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রাম্পিনের কাক ফুটিতে আরম্ভ হইল। প্লেট বদল হইতেছে। ছুরি চলিতেছে। গ্লাস উড়িতেছে। একটির পর একটি খাণ্ড উদবে ঢুকিতেছে। পবম্পব কথাবার্তাও হইতেছে, উচ্চহাসি, মৃদুহাসি উভয়েব মুখেই দেখা দিতেছে। পাকা একঘণ্টাব পব আহাৰ শেষ হইল। এখন “চা” খাওয়ার পালা। সোনাউল্লা চা-দানির নিকট গিয়া দেখে যে, চা-দানির সরপোষ নিয়মমত বসান নাই। কোন অজ্ঞানালোক সব-পোষটি চা-দানির উপর রাখিয়া গিয়াছে সন্দেহ হইল। সোনাউল্লার মনে সন্দেহ হইল। হঠাৎ সেই শব্দের কথা মনে পড়িল। সোনাউল্লা অনেক বিবেচনা করিয়া সাহেবের নিকট ঘোড়হাতে বলিতে লাগিল—“জুব, ! এই চা-দানির সরপোষ আমি যেভাবে রাখিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবে নাই। আর একটি কথা—আমি বাহিরে বসিয়া ঘরের মাঝে একটি শব্দও শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেইসময় জকি এই ঘর হইতে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল। তাহাও দেখিয়াছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। যেই হউক চা-দানির সরপোষ উঠাইয়াছে।”

সাহেব চা-দানির নিকট যাইয়া বলিলেন—“জকি খানারকামরায় আসিয়া চা-দানি নাড়িবে কেন?”

সোনাউল্লা বলিল—“সে তো চিরকাল খানারকামরায় আসিয়া থাকে।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“খানার ঘরে তাহার কাজ কি? সে এখানে কেন আসিবে? তোমরা এ ঘরে তাহাকে আসিতে দাও কেন? শুনিয়াছি যে, সে ঘরের কাজের চাকর। তার যে কি কাজ, তাহা আমি দেখি নাই। অথচ সে ঘরের চাকর—কি অজ্ঞায় কথা।

মেমসাহেব চা-দানি হইতে, প্যালায় চা ঢালিয়া কেনীকে দেখাইলেন—চায় আসল রং নাই। একটু ময়লা ময়লা রং! বেশী কড়া হইলেও একরূপ হয় না। টি. আই. কেনীর মনে সন্দেহ হইল। প্যালায় চায় মধ্যে এক টুকরা রুটি ভিজাইয়া মেমসাহেবের কুকুরকে খাইতে দিলেন। টরী লেজ নাড়িতে নাড়িতে চপর চপর শব্দে বিধাক্ত রুটি উদবস্থ করিল। কেনী ঘড়ি ধরিয়া খানায়কামরা-তেই বসিয়া রহিলেন। ত্রিশ মিনিট অতীত হইতে টরী ভারী-অস্থির হইল। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, একখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গড়াগড়ি দেয়। অস্বাভাবিক স্বরে খেউ খেউ করে। খানসামা, খেদমতগার, বাবুরচির মুখ শুকাইয়া গেল। একঘণ্টা পূর্ণ না হইতে টরী মাটিতে হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। গড়াগড়ি পড়িয়া হাউ-মাউ করিতে করিতে একেবারে নিশ্বেজ হইয়া পড়িয়া গেল। সোয়া-ঘণ্টার মধ্যে কুকুরের চেতনা রহিত, মৃত্যু।

কেনী ক্রোধে অধীর হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন—“যত সর্দার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল আমার চাকর আছে, এই মুহুর্তে ঘাইয়া জকিকে বান্ধিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।”

জমাদার সেলাম বাজাইয়া, তখনই লাঠি ঘাড়ে করিয়া ছুটিল। জকির প্রতি কেহই সন্দেহ ছিল না। অনেকে পূর্ব-দাদ তুলিতে সর্দারের সঙ্গি হইয়া জকিকে ধরিয়া আনিতে চলিল। কেনী—সোনাউল্লা, সর্দার, বেহারা, বাবুরচি, মশালচি, পাখাওয়ালা সমুদায় চাকরকে আটক করিয়া রাখিলেন।

জমাদারদিগকে জকির বাড়ি পর্যন্ত যাইতে হইল না। জকি রুটিতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সাহেবের খানাখাওয়া হইলে ছটফটি দেখিয়া স্বন্দরপুর যাইবে মনস্থ করিয়াছিল। তাহা আর ঘটিল না। ঈশ্বর টি. আই. কেনীকে রক্ষা করিলেন। একজনের চক্ষে পড়িতে পড়িতে জকি দশজনের চোখে পড়িয়া ধৃত হইল। বন্ধন-অবস্থায় সাহেবের নিকট আনীত হইল, সাহেব দালানের খাখার সহিত বান্ধিতে আদেশ করিয়া, শ্রামচাঁদ বাহির করিয়া আনিতেই জকি বলিতে লাগিল—হজুর! আমাকে প্রাণেশ্বর করিবেন না। আমি যখন ধরা পড়িয়াছি আমার জীবন শেষ হইয়াছে। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

টি. আই. কেনী কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চায় ঘা মারিতেই জকি বলিতে লাগিল—আমি বিষ দিয়াছি। ধর্মবতার! আমি

চার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। বিষের কোটা এখনও কোমরেই আছে। সাহেব প্রহার ক্ষান্তদিয়া কোমরের কাপড় খুলিতে খুলিতে কোটা পড়িয়া গেল, আর জকিকে প্রহার করিলেন না! বন্ধন অবস্থায় একটি কক্ষে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে, এই রাত্রেই জকির বাড়ি, ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। মালামাল, টাকাকড়ি যাহা থাকে, সমুদায় কুঠিতে লইয়া আইস।

আদেশ মাত্র রামইয়াদ, ধনইয়াদ, লছমীপং সিং, রামলাল তেওয়ারী, কুড়ান, জুড়ান, নবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সর্দার, দেশওয়ালী উর্দ্ধ্বাসে ছুটিল। কুঠির বাজ্রে চাকর যাহারা চিরকাল জকির নামে হাড়েচটা তাহারাও মাঠিয়ানদিগের সঙ্গে যাইয়া জকির বাড়ি লুট আবস্ত করিল।

জকির স্ত্রীর পূর্বেই পিতার বাটিতে গিয়াছিল। বাটিতে কয়েকজন চাকর মাত্র ছিল। কে কোথায় পালাইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।

টি. আই. কেনীও চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কুবুরের দশা যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন, নিজের অবস্থাও তাহাই ঘটত—এই সকল চিন্তা করিয়া আরও নানা-প্রকার কথা মনে উঠিল। চিন্তিতভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষেই প্রধান কার্যকারক হরনাথকে ডাকিয়া জকির অবস্থা বলিলেন। আর আদেশ করিলেন যে, তুমি নিজে যাইয়া দেখ, জকির সমুদায় ঘর ভগ্ন হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে—একেবারে সমভূমি করিয়া কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দিও। বাড়ীর নিশান মাত্র না থাকে। এবং ভিটায় চাষ দিয়া এখনই নীল-বুনানি করিয়া আসিবে ইহার কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়।

হরনাথ সেলাম বাজাইয়া মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন। সাহেব পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। আর একটি কথা। মুসলমানেরা কবরকে বড় মান্ত করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান! আমি এখনই জকিকে পাবনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান করিব।

হরনাথ পুনরায় সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। টি. আই. কেনী পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া জকিকে বন্ধন করিয়া পাবনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে জকির স্বীকৃত-জবাবে বিষ পরীক্ষার পর সেসনের বিচারে জকির

যাবজ্জীবন স্বীপাস্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল। জ্বকির স্ত্রী পিতা-মাতার বাড়ি থাকিয়া স্বামীর অবস্থা শুনিয়া কান্দিয়া, নাকের নখ, হাতের চুরি সমুদায় খসাইয়া ফেলিল। জ্বকির প্রমত্ত, জ্বকির স্বীপাস্তর পমনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

ভৈরববাবু

পাংশা স্টেশনের নিকটেই ভৈরববাবুর বাড়ি। ভৈরববাবু বনিয়াদীবাবু। যে সময়ের কথা, সে সময় বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরব-বাবু। বিশেষ মাত্ৰ-গণ্য, বনিয়াদী-ঘরানা, সচ্চবিত্ত, সৎ-স্বভাব, সকলের প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। শুধু আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরববাবু যথার্থ বাবু। ভৈরববাবুকে জ্ঞদ করাই এখন কেনীর মতলব। মীরসাহেব ভৈরববাবু সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। বাবুকে বিশেষ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না করিয়া তাঁহাকে একটু জ্ঞদ করাই কেনীর নিতান্ত ইচ্ছা। সকালেই বলে ভৈরববাবু ভারি চতুর, বুদ্ধিমান, সহজে ঠকিবার পাত্র নহেন। কেনীর তাহা সহ হয় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী সূচতুর, বাঙ্গালী বিচক্ষণ-একথা কেনীর সহ হয় না। ভৈরববাবুকে আচ্ছা করিয়া জ্ঞদ কবিয়া সাধারণকে দেখাইবেন, বিলাতী চাল চালিয়া বাবুকে মাত করিবেন, এই আশাতেই বড় সাবধানে ব'ড়ে টিপিতেছেন। বাবুও কম নহেন আত্মরক্ষায় খুব সাবধান হইয়াছেন। তিনিও তুখোড় খেলোয়াড়, সহজে পড়িতেছেন না।

কেনীর প্রধান গোয়েন্দা ফটিক, আর হরিদাস। ফটিক প্রায়ই ফকির-বেশে গোয়েন্দাগিরি করে। হরিদাস বৈরাগী সাজিয়া খমক বাজাইয়া মনিবের কার্যোদ্ধার জন্ত গান করিয়া বেড়ায়। সময় সময় খনজনীও বাজায়। ভিক্ষাও করে।

ভৈরববাবুর চাকরেরা সন্ধানে জানিয়াছে যে, এবারে লাটের কিস্তির খাজনা যশোহরে যাইতেই, যে কৌশলে হউক পথ হইতে কেনী লুটপাট করিয়া লইবে।

বাবুও সে কথা শুনিয়াছেন।

খাজনা দাখিলের দিন নিকটে আসিল। আমলারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবু খাজনা পাঠানোর কোন উপায় করিলেন না। পক্ষে

কেনী এবারে নিশ্চয়ই টাকা লুটিয়া লইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, টাকা লুটিয়া লইলে, যশোহরের খাজনা দাখিল হইবে না। মহাল লাটে উঠিবে। যত টাকাই হউক, নিলাম ডাকিয়া খরিদ করিবে। বাবু সে-বিষয় কোনই যোগাড় করিতেছেন না। কেনী যে দুরন্তলোক—সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা করিবেই, করিবে। সম্পত্তি নিলামে উঠিলে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য কেনীর সম্মুখে নিলাম ডাকে? কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন, কথাটা এমন গুরুতব নহে। নোট খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইলেই তো হইতে পারিত। সে সময় নোটের চলতি এত ছিল না। ডাকবিভাগের অবস্থাও এত ভাল ছিল না। মহকুমা, ব্যতীত গ্রামে গ্রামে ডাকঘরও ছিল না। টাকারই কারবার। নগদ টাকারই বেশী চলতি।

ভৈরববাবুর বৈঠকখানা অতি পরিষ্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোনা-বান্ধান, রূপা-বান্ধান ছঁকাগুলি, ধূতরাফুলে কলকি ও রূপার সরপোষ মাথায় করিয়া বৈঠকের উপর বসিয়া আছে গুডগুড়িও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। শ্রামাদানে বাতি জলিতেছে, দুই একটি দেয়ালগিরি ও নারিকেল-তেলে জলিতেছে। ভৈরববাবু বড় শোখিন, সঙ্গীতবিজ্ঞান মহাপণ্ডিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অজ্ঞও হইতেছে। প্রধান শিষ্য মাধবচন্দ্র রায় তানপুরা লইয়া, সুরট, মল্লার খেয়াল ধরিয়ান্নে। বাবুর মধ্যম পুত্র দেববাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা, অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা পাখওয়াজ-তবলায় দেববাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উতরিয়াছে। অল্পলতা ক্রুতি-দোষ, দোষভাবাপন্ন কোনপ্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।

প্রধান কার্যকরক মহাশয় সেলাম বাজাইয়া দণ্ডায়মান হইলে, ফরাসের এক-পার্শ্বে বসিতে অনুমতি পাইলেন। সে সময় আর খাজনা পাঠানোর কথা কহিতে অবসর পাইলেন না। কেনীর চক্রান্তের কথাও বিশেষরূপে বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেদিন বড় জাঁকাল-মজলিস। প্রাচীন নগর দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াজ খাজা খাঁ আসিয়াছেন। মাধববাবু গান শেষ করিয়া তানপুরা রাখিলেন। খাজা খাঁ বৃহৎ এক তানপুরা লইয়া, সাত আটবার সেলাম বাজাইয়া তানপুরা ফোড়ে করিয়া বসিলেন।

খাজা খাঁ দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় সাদা পাগড়ি, দাড়িগুলিও সম্পূর্ণ সাদা—পাগড়ি, দাড়ি আর দস্ত এই তিনটি সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আডাল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারায় খাজার সাদা জিনিস কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

খাজা খাঁ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গান করিলেন। দুই বাহাব পড়িতে লাগিল। খাজা খাঁও সেলাম বাজাইতে বাজাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কালওয়াতজিব গান শেষ হইলে মাধব রায় পুনরায় গান ধরিলেন। রায়জি মাথা মুখ হাত নাড়িয়া গলাবাজী কবিত্তে ক্রটি কবিলেন না। খাজা খাঁ পর্য্যন্ত রায়জিকে বাহবাব বাতাসে খুব দোলাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীরা মুখে বাঙ্গালাদেশে এই প্রথম তানলয় পরিশুদ্ধ গান আজ শ্রবণ কবিলেন। রায়জির আনন্দের সীমা নাই। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। তানপুরা খোলে পুরিয়া কালওয়াতজি বিশ-পঁচিশবাব সেলাম বাজাইয়া বাণায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের অধিকাংশ লোক বাহিবে আসিল। কার্য্যকারণক মহাশয় বসিয়াই বহিলেন। তিনি আর উঠিলেন না।

ভৈরববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথা আছে নাকি ?

কার্য্যকারক মহাশয় বলিলেন—ভজুব ! কেনীক কথা তো ক্রমেই বেশি বেশি শুনিতেছি। পথে পথে লোক রাখিয়াছে। গোয়েন্দা রাখিয়াছে। শুনিতেছি লাটের খাজানা যশোহরে লইয়া যাইতেই স্ত্রযোগ ও স্ত্রবিধামত—দিনে হউক বাত্রে হউক, যে উপায়ে হউক লুটিয়া লইবে। সর্ব্বদা সন্ধানী লোক ঘুরিতেছে। কে কোন বেশে, কোন স্ত্রযোগে যে আমাদের কাজকর্মেব সন্ধান লইতেছে তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। অথচ আমরা এখানে যেদিন যে কার্য্য করিতেছি, তাহার খবর প্রতি মুহূর্ত্তে সাহেবের নিকট যাইতেছে। আশ্চর্য্য ! এমন লোক কে আমাদের এখানে আসা যাওয়া করে যে, তার কল্যাণে এখানকার কোন কথাই আর গোপন থাকে না—যে পরামর্শ, যে গুপ্ত-মন্ত্রণা করা হয়, অমনই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এখন উপায় কি ? লাটের দিন অতি নিকট, কোন পথে, কি উপায়ে টাকা পাঠাইব তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। অত কিছু নয়, খাজানার টাকা। দেখুন কি আশ্চর্য্য কথা ! যে পথে টাকা পাঠান সাব্যস্ত করি, অমনি সংবাদ আসিয়া পড়ে যে, সন্ধানীরা সে পথেও ঘুরাফিরা করিতেছে। সন্ধি-

পথে সাহেবের গুপ্ত লাঠিয়াল নিয়োজিত হইয়াছে। যে বেশেই হউক, যেভাবেই হউক তাহারা গম্যপথে বাধা দিবেই দিবে। টাকাও কাড়িয়া লইবে।

ভৈরববাবু বলিলেন—আমিও সে বিষয় না ভাবিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে কিছুতেই মার নাই। সেই একমাত্র বল ভরসা। যাহা হউক আগামী পরশু দিবস নিশ্চয় টাকা রওয়ানা করিব। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে আর উপায় কি? আমাদের যেক্রপ সংসার, আয় হইতে ব্যয়ের ভাগই অধিক। খাজানাগুলি মারা গেলে বিষয় রক্ষা কবিবার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। লাটের খাজনা যদি সাহেবের হস্তগত হয় তবে বিপদের একশেষ দেখিতেছি। কোথা হইতে আবার টাকা সংগ্রহ করিব। কাজেই একেবারে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। সর্বস্ব যাইবে। ঈশ্বর আছেন!

ভৈরববাবু এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় দুইজন বাহক বড় বড় দুইটি ঝাঁকা-পূর্ণ, নূতন হাঁড়ি মাথায় করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে উপস্থিত, ভৈরববাবু তাহাদিগকে দেখিয়াই—উঠিলেন, এবং কার্য্যকাবক মহাশয়কে বলিলেন রাত্রিও অধিক হইয়াছে। খাজানা পাঠানোর সমুদায় বন্দোবস্ত কাল করিব। আপনি বিশ-পঁচিশজন ভাল ভাল লোকের জোগাড় করিয়া রাখিবেন। এই কথা বলিয়াই বাবু বাহকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ

খাজানার চালান

রাত্র প্রভাত হইবার বেশি বিলম্ব নাই। চোকগেল পাখি জগতের পাপ-তাপ সহিতে না পারিয়া ‘চোক গেল চোক গেল’ করিয়া রব করিতেছে। কেনীব গোয়েন্দা ছদ্মবেশে তখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইতেছে। গোয়েন্দা একজন ফকির একজন বৈরাগী যেখানে যাহার সহিত কেনিব শত্রুতা-বিবাদ সেইখানেই গোয়েন্দা, সেইখানেই গুপ্ত-সন্ধানী। সেইখানেই তাহাদের গমন। ফকিরকেও লোকে ভক্তি করে, বৈরাগীকেও শ্রদ্ধা করে, ভিক্ষাও দেয়। ফকির, বৈষ্ণবের প্রতি কাহারও কোনপ্রকারের সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ গ্রাম্য-জমিদার—তায় আবার বহুকালের কথা। সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ। দেউড়িতে নেগাহবান থাকিলেও প্রবেশ-প্রস্থানে তত মনযোগ নাই। বেশি কড়াকড়ি,

আটাআটি নিয়মও নাই। অনায়াসেই বাহির আঙ্গিনায়, পূজার প্রাঙ্গণে—ইচ্ছা করিলে অন্তরথণ্ডেও ফকির, বৈষ্ণব যাইতে পারে। কোন বাধা নাই।

গোয়েন্দা যে সংবাদ পায়, স্বেযোগ মত অমুচর, মহচর, 'সঙ্গীলোক' দ্বারা সমুদায় খবর কুঠিতে পাঠায়। এখন ভৈরববাবুর বাড়িতে বৈরাগী বাবাজির আগমন। চারদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান লইতেছেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকদিন বৈরাগীঠাকুর বাবুর বাড়িতে যাইয়া ভিক্ষা আনিয়াছেন। স্বেযোগ আর সময় পাইলে অন্তর মহলে গিয়াও দুই একটি গান শুনাইয়া পাড়ার ছেলেমেয়ে একত্র করিয়া ভিক্ষা করেন। আজ বৈরাগী শেষ নিশিতে উঠিয়া তিলক-চন্দন ফোঁটা কাটিয়াছেন, গায়ে হরিনামের মার্কা মারিয়াছেন। করতাল বাজাইয়া হরিনাম কবিত্তে কবিত্তে ভৈরববাবুর বৈঠকখানাব সম্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার কর্তব্য-কার্য্য করিতেছেন

দেখিলেন যে বাবু অন্তরমহল হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সাত আটজন ভারী ঝাঁক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইল। ঝাঁকের দুইদিকে তোড়া বোঝাই। দেখিতে অল্প, কিন্তু খুব ভারী। ঝাঁক বাহকের ঘাড়ে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। দেউড়ির পরেই সদর দরজায় আসিলে আটজন দেশওয়ালী ঢাল-তরবারি বান্ধা, গোঁপে তা দেওয়া বড় বড় পাগড়ি মাথায় বান্ধা—ভারীদিগকে মাঝে কবিত্তা ছাতি ফুলাইয়া আগেপিছে চলিল। বাড়ির বাহির হইলেই ভৈরববাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। বৈরাগীও প্রভাতী গাইতে গাইতে অল্প আব এক বাড়িতে চলিয়া গেল।

স্বর্ঘ্যোদয় হইতে হইতে দেশওয়ালীবা ভাবীসহ গ্রামের বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বৈরাগীও অল্প আর একপথ দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। দেশওয়ালীরা সকলেই বৈরাগীকে চিনিত। মনিব বাড়িতে প্রায়ই দেখিয়াছে। বিশেষ আসিবার সময়েও প্রভাতে প্রভাতী গাইতে শুনিয়াছে।

রাম সিং জিজ্ঞাসা করিল—“ঠাকুর! এদিকে কোথায় যাওয়া হইবে?”

বৈরাগী হাঁটিতে হাঁটিতে—উত্তর করিতে কবিত্তে চলিল—“বাবাজি! একবার ঝিনদর দিকে ভিক্ষায় যাইব ইচ্ছা আছে।”

রাম সিং বলিল—“আচ্ছা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। এ-পথে একটু ঘুরা হইবে, তা হ'ক, একসঙ্গে সকলেই কথায়-বার্তায় যাইব।”

বৈরাগী বলিল—“বাবা! আমি ভিখারী, একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে

যুগিয়া বেড়াই। তোমরা বাবা বড়লোকের চাকর, তোমাদের সুখে যাওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি যে কতদিনে যাইব তাহারও ঠিক নাই। ভগবান যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথেই যাইব।

রাম সিং বলিল—“আচ্ছা ঠাকুর! আজিকার দিনতো একত্রে যাই।” নানাকথায় এবং কথার উদ্ভব-প্রত্যুদ্ভব, অপব কথা, উড়তি কথা, বাজে আলাপ করিতে কবিত্তে সকলেই যাইতে লাগিল। সকলেই একদম খুব হাঁটিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে বোদ্রের উত্তাপে গলদঘন্থ হইয়া বাস্তার পাশেব একটি বটগাছ তলায় সকলেই দাঁড়াইলেন। হাঁফ ছাড়িলেন। ভাবগণ ভাব নামাইয়া গামছার বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কেহ আবশ্যকীয় কার্য করিতে গেল। রাম সিং প্রভৃতি নেগাহবান মাটিতে বসিয়া কাঁধেব ঝোলান বাটুয়া বাহিব করিয়া খর্সান তামাকে চুন মিশাইয়া হাতের তালুতে আঙ্গুলি-দ্বাৰা টিপিতে লাগিল। কেহ গাঁজাব ভাঁটা বাহিব কবিয়া কাটাছেড়ায় মন দিল, বৈবাগী ভিক্ষার ঝুলি নামাইয়া ‘গৌব-নি তাই হবি বোল’ শব্দে শ্রাস্তি দূব কবিল।

রাম সিং বলিল—“বাবাজি অরিতানন্দ সেবা হবে কি?”

বৈবাগী বলিল “না বাবা! আমি ও সকল আনন্দে আনন্দিত নই। পেটের ভাত জোটাইতে পারি না, তার উপব আবাব আনন্দ কববো!”

“আচ্ছা বাবা! আনন্দ নাই কললে, একটি গান কর শুনি। বেশ ছায়ায় বসিয়াছি। বড় জোরে এই তিনক্ৰোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, বড়ই মেহনত হইয়াছে। বাবাজি! একটি গান গাও শুনে মনটা স্থির কবি।”

রাম সিং প্রভৃতি খুব দম কবিয়া অরিতানন্দের সেবা করিল। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দুই একবাব কলিকা ফেরা-ঘোরার পরেই পুনরায় রাম সিং বৈবাগীকে গান করিবার অমুমতি করিলে, বৈবাগী ঝোলা হইতে খনজনী বাহিব করিয়া চাটি দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম সিং না বলিলেও বৈবাগী বাধ্য হইয়া গান ধরিত। স্বযোগ পাইতে ছিল না বলিয়া ক্ষান্ত ছিল।

বৈবাগী খুব বডম্বরে গাইতে লাগিল—

“ওবে কললি কি বিশাখা, একবার এনে দেখা,

মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বাকা।

আমরা তো জানিনা তোরাই তো জানালি,
এমন সরল প্রেমে কেন গরল মাখালি”—ইত্যাদি—

রাস্তার উভয়-পার্শ্বস্থ গ্রামেই বৈরাগীর গলার আওয়াজ প্রবেশ করিল। ছোটবড় ছেলেমেয়ে কেহ অর্দ্ধবসন, কেহ শূণ্য-বসনে আসিয়া গাছতলায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দশ বারজন লাল পাগড়িওয়ালা ঢাল-তরবার বাস্কা সেপাই দেখিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। একেবাবে গা-ঘেঁষা হইয়া নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। একটি গান শেষ হইতে না হইতেই রাম সিং, পাঁড়ে পুনঃ অন্তরোধ করিল, বাবাজি! দোসরা আর একটি গান হউক। খুব ভাল গান।

বৈরাগীর অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে গান এখনও তাহা সফল হয় নাই। মহাবাস্ত হইয়া চতুর্দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে গ্রামের অনেকে বটতলায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিল। বৈরাগীও চারিদিকে তাকাইয়া গান গাইতেছেন। তিনি যে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে মুখ দেখিতেছেন না। কাজে কাজে গানও থামিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ঐ জনতার মধ্যে মনোমত রূপ দেখিলেন। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তাড়া-তাড়ি সে গানটি সাবিয়া নূতন-তালে আব একটি নূতন গান ধরিলেন—

গান

“তোমরা যাও সবাই এখন ঘরে ফিরে রে!

আমি যাই বে, ওরে এসেছি এই ভবে একা, একা যেতে হল রে।”

—কেহই ফিরিয়া গেল না। একমনে বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। তবে একজন ফকির ঐ গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, সে তখনই চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইল না। ত্রস্তপদে জনতা ভেদ করিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে নামিয়া গ্রাম ধরিল। বৈরাগী দুই তিনবাব গানটি আওড়াইয়া যখন দেখিল ফকির সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হইল—গানভঙ্গ দিয়া খনজননী কোলায় বন্ধ করিলেন।

রাম সিং সঙ্গীদিগকে—বাহকদিগকে বলিতে লাগিল—“চল ভাই চল খুব ঠাণ্ডা হুয়া, আবার চল, দেখি কত দূর যাইতে পারি।” ভাবীরা ভার ঘাড়ে বুলাইল। দেশওয়ালীরাও পূর্বমত ভারীদিগের অগ্র-পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বৈরাগী বাবাজিও জোরে জোরে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

আশ্চর্য ডাকাতি

পাংশা গ্রাম হইতে যশোহর জেলা অনূন ৩৫ ক্রোশ ব্যবধান। পাংশা হইতে যে সময়ই কেন বওনা হউক না যশোহর যাইতে তাহাকে পথে একরাত্রি প্রবাস থাকিতেই হইবে। ভৈরববাবুর আর একটি কাছারি পাংশা হইতে চোদ্দ-পনেরো ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাম সিং, পাঁড়ে প্রভৃতি টাকা লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইল। কাছারির কার্য্যকাবক ভৈরববাবুর উপদেশপূর্ণ পত্র পূর্বেই পাইয়া-ছিলেন। কেনী টাকা লুটিয়া লইবে তাহাও পত্রে লিখা ছিল। কর্মচারী টাকার তোড়াগুলি স্বহস্তে অতি সাবধানে কাছারি-গৃহের মধ্যস্থ বড় একটি সিন্দুকে বাখিয়া তালাচাবি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। টাকার শব্দ না হয় বলিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সিন্দুকে তোড়া বোঝাই করিলেন। এবং সকলকে বলিলেন, একরাত্রি কষ্টে-স্বপ্নে সকলকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। সাবধানের মার নাই, অসাবধানে শতবিঘ্ন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তোমরা সকলে সকালে আহাবাদিব জোগাড় করিয়া আহার শেষ করিয়া আইস। কাছারির নেগাহবানগণকেও নায়েব মহাশয় বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র আহাব করিয়া আসিবে। আজ রাত্রি বড় ভয়ানক বাত্মি। বড় সাবধানে—বড় সতর্কে থাকিতে হইবে। আর অতিরিক্ত যে কয়েকজন লোককে রাখা হইয়াছে তাহাও মায় হাতিয়ার, সড়কি, লাঠি, স্কলফী লইয়া সমস্ত বাত্মি বাঁধাকোমরে থাকিয়া পাহারা দিবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে জাগিয়া থাকিব। এই সকল বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া নায়েব মহাশয় দেশও-য়ালী, বরকন্দাজদিগের আহারের জোগাড় করিয়া দিলেন। রাম সিংএর অল্পগ্রহে বৈরাগীঠাকুরও চাউল, দাউল, তরকারী ইত্যাদি আহাৰ্য্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই আহারের সুব্যবস্থা নায়েব মহাশয় করিয়া দিলেন। বৈরাগী আহার-অন্তে নায়েব মহাশয়ের নিকট আসিয়া পরিচিত হইলেন। নায়েব মহাশয় স্বয়ং টাকার সিন্দুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া ছঁকা হাতে করিয়া বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বৈরাগী ঠাকুরকে সিন্দুকের নিকট বসাইয়া ধর্ম কাহিনী শ্রবণ করিতে মন দিলেন। ধর্ম কথার পর হরি গুণগান শ্রবণে নায়েব মহাশয়ের নিতান্তই ইচ্ছা হইল। বৈরাগীকে বলিলেন, বাবাজি! আমি রাম সিংএর নিকট গুনিয়াছি আপনার

শ্রামা বিষয় সংকীর্ণনে বেশ ক্ষমতা আছে। যদি সত্য হয় তবে শুধু শুধু বসিয়া রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা আমোদে থাকা মন্দ কথা নয়। ঈশ্বরের নামও হইবে, পাহারার কার্যও চলিবে।

বৈরাগী বলিলেন—“বাবাজি! কথাটা ভালই শুনালেন কিন্তু, বলি কি রাত্রি জাগরণটা বড় ভয়ানক কথা। আর এই সকল সিপাই-বাবাজিরা সারাদিন ইঁটিয়া যে পবিত্রম করিয়া আসিয়াছে এখন কি আর জাগরণেব সময়? যেই বিছানায় পড়িবে অমনি ঘুমাইবে।”

নায়েব মহাশয় বালিশে ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছেন আর বাবাজিব সহিত আলাপ করিতেছেন। নায়েব মহাশয়ের অন্তরোধ বাবাজি ঠেলিতে পারিলেন না। খনজনৌ বাহিব করিয়া আরম্ভ করিলেন। খনজনৌর চাটায় শব্দ অনেকদূর যাইয়া ফকিবেব কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রেব শব্দ দিন অপেক্ষা বহুদূরে যাইতে লাগিল। বৈরাগী অনেকক্ষণ খনজনৌ বাজাইয়া গান আবিস্ত করিল।

গান

“আয় মা সাধন-সমরে।

দেখবো মা হাবে, কি পুত্র হাবে ॥

অশ্বারোহণ করিয়ে কালীসাধন রথে, তপ-জপ দুটো অশ্বযুতে তাতে,

দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসেছি ধরে ॥

মা দেখবো তোমার বনে, শঙ্কা কি মরণে,

ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন—

তাতে রসনা ঝঙ্কাবে, কালী নাম হুঙ্কারে,

কার সাধ্য আমার বলে রণ ॥

বাবে বাবে বল তুমি দৈত্যজয়ী, এই আমার বাণ, এস ব্রহ্মময়ী,

ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,

জিনবো তোমারে ॥”

গানটি শেষ হইলেই বাবাজি তামাক ইচ্ছা করিয়া নায়েব মহাশয়ের হস্তে কলিকা দিলেন। রাম সিং প্রভৃতির শরীরের বেদনা তাড়াইতে কবে গাঁজায় দম দিয়া জাগিতে জাগিতে ঘোর-নিদ্রায় নাক ডাকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সন্ধ্যার লাঠিখানি বগলে করিয়া “একটু কাৎ হই” বলিয়া নিদ্রায় অভিভূত

হইল। জাগরণের মধ্যে কেবল নায়েব মহাশয় আর বৈরাগী বাবাজি। বৈরাগীর মনেও নানা কথা, নায়েব মহাশয়ের মনেও নানা কথা—এবারকার পূজাব খবচটা উপরি-টাকাষ কবিবেন মনে করেছিলেন। প্রজাবা বাদী হওয়ায় তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাদী প্রজাগণকে কি কি কৌশলে জয় করিবেন সেও এক প্রধান চিন্তা। সে জমাখবচটা কাছাবিতে দাখিল কবিয়াছেন তাহার সমুদায় খবচ মছুরা পাইবেন কিনা, সেও এক প্রধান চিন্তা। তাব নেযা খবচ এক-ভাগ, আর তিনভাগই মিথ্যা। অনেক ফর্দে ঠিক নামাইতে বেটিক কবিয়াছেন। কোন স্থানে শুণ্ড বেশী কবিয়া দিয়া নামাইয়া বাখিয়াছেন। কিছু কিছু বাজেয়াপ্ত হইলেও আসলে মার নাই। সদবের আমলাগণকেও বীতিমত রূপচাঁদ সহায়ে সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছেন। সময় সময় পাঁঠা, ঘুত ইত্যাদি দিয়াও তাঁহাদের মন যোগাইয়াছেন। বাবুর চক্ষে পড়িলে ধরা পড়িবেন এইটি মহা চিন্তা। তাহারপর কেনীসাহেব যে কাছারি লুট কবিয়া খাজানা লুটিয়ে লইয়া যাইবে সে চিন্তাটাই বেশী চিন্তা। লুটিবে কথায় চিন্তিত হন নাই। লুটিলেও ভাল না লুটিলেও ভাল। যদি লুটই হয়, তবে লুটের বাহানায় কিছু কিছু সবাইয়া আত্ম-সাৎ করিবেন। কোন কোন জিনিস এবং নগদ তহবিলের সমুদায় সরাইবেন কি কিছু রাখিবেন ও কাগজপত্রগুলো একেবারে পোড়াইয়া ফেলিবেন কি জলে ডুবাইবেন, তাহাও স্থির কবিতে পারেন নাই। লুট হইলেই ভাল। আরও কিছু লাভ না হয়, মোকদ্দমা খরচে বেশ একহাত মারিতে পাবিবেন।

পুনরায় বৈরাগী বাবাজিকে বলিলেন বাবাজি। গানটি বড চমৎকার। আর একবার গানটি হক। গানটি বড মিষ্ট।

যত রাত শেষ হইতেছে ততই বৈরাগীৰ চিন্তা বাড়িতেছে। সহযোগী-কটিক (ফকির) কুঠিতে গিয়া টাকা রওয়ানা সংবাদ সময়মত সাহেবকে দিতে পারিয়াছে কি না? এ কথাও তাঁহার চিন্তার এককথা। পুনর্বার খনজনীতে যা দিয়া “আয় মা সাধন সমরে” বলিয়া প্রথম ধূয়া ধরিতেই ‘হো হো’ শব্দে লাঠিয়ালেরা মশাল জালিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারিঘরে আসিয়াই নায়েব মহাশয়কে চক্ষের পলকে বাঁধিয়া ফেলিল।

বৈরাগী বাবাজি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল যে ঐ সিন্দুক। সঙ্কেত করিবা মাত্র কুঠারাঘাতে সিন্দুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সিন্দুকস্থ টাকার তোড়া

লাঠিয়ালেরা বাহির করিয়া সজ্জি বাহকগণের মাথায় দিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছাবিঘরের বাহির হইয়া পঞ্চাশজন সর্দাব সঙ্গে দিয়া টাকা কুঠিতে পাঠাইয়া দিল। অবশিষ্ট দুইশত লাঠিয়াল কাছাবির অলু অলু ঘরের জিনিস পত্র লুটপাট কবিয়া লইতে লাগিল। বাম সিং প্রভৃতি সর্দাবদিগকে লাঠিব আঘাত, সড়কির গুতায় জাগাইয়া তুলিল। সকলেই নিদ্রাব ক্রোড়ে অচেতন। গুতা খাইয়া খতমত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কিছু কবিতে পারিল না। বাবাজি ঘরের সকল জিনিস জোবে জোবে বাহিব কবিয়া আনিয়া লাঠিয়ালদিগেব সম্মুখে বাখিতে লাগিল। কাছাবি লুট কবিয়া লাঠিয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া কাছাবিব সম্মুখ-সম্মাখ মশাল জালিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল। কাছাবির কোন লাঠিয়াল আব অগ্রসব হইল না। কে কোথায় পলাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। সাহেবেব লাঠিয়ালেবা অনেক ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং গালিগালাজ দিয়া মশাল জালিতে জালিতে চলিয়া গেল। শেষে বাম সিং, হুজ্জান সিং, বেতবন হইতে বাহির হইয়া “ক্যা ভয়া ক্যা ভয়া” কবিয়া নায়েব মহাশয়ের বন্ধনদশা মোচন করিল। আর আব সকলে যাহাবা পলাইয়াছিল, কেহ লাঠি, কেহ সড়কি-হস্তে আসিয়া মহা-ধুমধাম আরম্ভ কবিয়া দিল। “কোথা গেল, সাহেবেব লাঠিয়ালরা কই? এক চোটে ফয়েব কবিব। কই কোথা গেল” বলিয়া আপন আপন মর্দমৌ দেখাইতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়েব মুখে কথাটি নাই। তাঁহাব নিজের বাক্স, পেটরা, থালা, ঝটা বাটা যাহা ছিল সকলি গিয়াছে। দেখিলেন বৈরাগীব ঘোলা, খনজনী সকলি পড়িয়া আছে। নানা প্রকাব মতলব, পবামর্শ আটিতে আটিতে পূর্বদিক ফর্সা হইয়া প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। ভৈববাবুব কাছাবি লুট এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

টাকা নয়—খাপরা

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সাহেবেব লাঠিয়ালেবা যে পথেই চলিল, সূর্য্যদেব সকলকেই দেখাইলেন যে, ভৈববাবুব কাছাবি লুট করিয়া চোদ্দ তোড়া টাকা লইয়া চোদ্দ জন মুটিয়া এবং ঢাল-সড়কি কোমর বান্ধা লাঠিয়ালেরা ব্রহ্মপদে মার মার কাটকাট শব্দে পথ জাঁকাইয়া চলিয়াছে। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে যে, ভৈবব-

বাবুর সর্বনাশ হইল লাটের খাজনা লুট! আর সর্বনাশের বাকি কি? হঠাৎ এত টাকা এই কদিনের মধ্যে কোথা হইতে জোটাইয়া বিষয় রক্ষা করিষেন! লাটের দিন কি ভয়ানক দিন। বাজকর আদায়ের কড়া এমনি নিয়ম, যে সূর্যঅস্ত হইলেই দফা রফা, কার্য শেষ। জমিদারী নিলাম—নিলাম তো সত্য-সত্যই নিলাম। আর দেয় কে, আর পায় কে? কিস্তিমত টাকা দাখিল না হইলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।—হাজাব হউক বেলাতী বুদ্ধি, সে বুদ্ধির কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধি কোনই কাজের নহে। ধন্য কেনী! কি কৌশলে কি সন্ধানে টাকাগুলি হস্তগত করিল। এমন কৌশলে ধন্য! ধন্য তোমার সাহস।

কেনী শোক, তাপ, বিবহ, বিচ্ছেদ নানা প্রকার মনকষ্ট ভোগ করিয়া শেষ-কালে বাঙ্গালীর উপর চটিয়া গিয়াছেন। হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। বাঙ্গালী নামেই জলিয়া ওঠেন। চক্ষের শূল মনে কবেন। লাঠিয়ালদিগকে ভাল না বাসিয়া পারেন না বলিয়া মুখে ভালবাসা জ্ঞান। কার্যেও দেখান যে, তোমরাই আমাব সকল। বাঙ্গালীর কথায়-কার্যে আর তাঁহাব বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসতরুর মূলে তাহাবই ভালবাসা জকি—বিষবারি সিঞ্চন করিয়া বিষময় ফল ফলাইয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত চটা। কেনীব অদৃষ্ট-চক্রের গতি ক্রমেই উদ্ভেদ! যে কার্যে হাত দিতেছেন তাহাতেই প্রতুল হইতেছে। নীল, বেশমে বিস্তর আয় হইতেছে। জমিদারীতেও বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিন দিন উন্নতি—দিন দিন মজুদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। চারিদিক হইতে টাকা আসিতে থাকে তখন চারিদিক কেন, দশদিক হইতে বিশপ্রকারে টাকা আসিতে থাকে।

সন্ধ্যা নিকট। কেনী ফুলবাগানে মেমসাহেবের সঙ্গে বাগানের শোভা, কালীগঙ্গার শোভা, সাংকালীন সেই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন আর উভয়ে—হাত ধরাধরি করিয়া পরচক্ষে প্রণয়ভাব গাঢ়রূপে দেখাইয়া মুহুমন্দভাবে মনের আনন্দে পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় ফকির গোয়েন্দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া—সেলাম বাজাইয়া বলিল—“হজুর! বকশিশ চাই।”

সাহেব বলিলেন—“বকশিশ পরে দিব, খবর কি?”

“হজুর! বকশিশের ছকুম হউক, কাজ ফতে হইয়াছে। বাবুর ভুল ভাঙ্গিয়াছি। বাঙ্গালা-রাজ্যে এমন কোন লোক নাই যে, হজুরকে ঠকায়। মামলা,

মোকদ্দমা, লাঠিবাজী, আর একটিতেও হজুরকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। বাবুর কাছারিতে চোদ্দ তোড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের লাঠিঘাল সর্দারের নিকট বাবুর লোকজন মাথা তুলিয়া একটি কথা বলিতেও সাহসী হইল না। কে কোথায় পালাইল তাহাব খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। ফকিরের কথা শেষ হইতে না হইতে লাঠিঘালগণ শোবগোল কবিতা করিতে পায়তাবা করিয়া লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে চোদ্দ তোড়া টাকাসহ সেনাম বাজাইয়া বকশিশের প্রার্থনায় সাহেবের সম্মুখে কান্নাব বান্ধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব পাঁচশত টাকা বকশিশের হুকুম দিলেন। আরও বলিলেন “দেখ ভৈরববাবু বড় চতুৰ। ও সকল তোড়া-গুলি এখনি জ্বলাইয়া ফেলিতে হইবে। টাকা আমাব সম্মুখে ঢালিয়া তোড়া-গুলি জ্বলাইয়া ফেল। আব এ টাকা খাজাঞ্চীখানায় লইয়া দেও।” আদেশ মাত্র তখনি রামইয়াদ পাঁড়ে গায়েব বড় চাদব মাটিতে বিছাইয়া টাকার তোড়া একে একে নামাইয়া মুখ খুলিতে লাগিল। সহজে খুলিতে পারিল না। বড়ই কৌশলে বাঁধা এবং লাবাতা দিয়া মুখ ঝাঁট। তোড়ার মুখের দড়ি কাটিয়া সাহেবেব সম্মুখে ঢালিল। সাহেব দেখিয়া অবাক। তাড়াতাড়ি অন্য একটি তোড়ার মুখ কাটিয়া খোলা হইল, তাহাতেও অবাক ! ক্রমে চোদ্দটি তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালা হইল। কাহাবও মুখে কথা নাই। চতুরের চাতুরী—আশ্চর্য্য বাটপাড়ি। একটি তোড়াতেও টাকা নাই। সমুদায় খাপরা।—আর একদলা করিয়া সীসা। ভৈরববাবু চাতুরীতে কেনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি ভিন্ন মুখে কাহারও কোন কথা নাই। লাঠিঘালদিগের উৎসাহ—বকশিশ সকলি খাপরায় পবিণত হইল। কেনী বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভৈরববাবু বড় ঠকাইয়াছে। বাঙ্গালীর মাথায় এত বুদ্ধি, ইহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাহেব মাথা হেঁট করিয়া এক দুই পায়ে প্রিয়তমার হাত ধবিয়া কামবাষ ঢুকিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ছালাগুলি নদীতে ফেলিয়া দেও। রামইয়াদ পাঁড়ের চাদর পাতাই সার হইল। খাপরা সমেত তোড়া চোদ্দটা কালীগঙ্গায় বিসর্জন কবা হইল। তিন-দিবসেব মধ্যে সাহেব ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

ভৈরববাবু ছাড়িবার লোক নহেন। ইংরেজ দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র নহেন। রীতিমত রাজদ্বারে কাছারি লুটের নালিশ উপস্থিত করিয়া দিলেন।

প্রমাণের অভাব হইল না। কাছারি লুট, চোদ্দ তোড়া টাকা লুট—এ-কথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল। কেনীব পক্ষীস কয়েকজন লোকের বিশেষ শাস্তি হইল। কিন্তু ভৈরববাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। চোদ্দ হাজার টাকার দাবীতে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া মায়-খরচা-সমুদায় দাবী ডিক্রি করিলেন।

উনত্রিংশ তরঙ্গ

বান্দালীর হৃদয়

কিছুদিন পবে যশোহরে সদরআলাব এজলাসে ভৈরববাবুর সহিত কেনীর দেখা হয়। যদিও, কেনীও বড়লোক। বিস্তর টাকা। কিন্তু খাপরার পবিতর্কে—চোদ্দ হাজার টাকা নগদ দিতে কাহার না কষ্ট বোধহয়? কেনীব ইচ্ছা যে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। খরচাটা লইয়া বাবু দাবিব টাকা ছাড়িয়া দেন—এই কেনীব আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু কোনমুখে একথা বলিবেন। হাকিমের সম্মুখে, এজলাসের মধ্যে কেনী ভৈরববাবুকে দেখিয়া বলিলেন।

“তুমি বাবু বড় জুয়াচোব। খাপবা দিয়া তোড়া পুবিয়া চোদ্দ হাজার টাকার দাবী করিয়া ডিক্রি করিয়াছ।”

“ভৈরববাবু বলিলেন—“আমি জুয়াচোর, তুমি গরুচোব।” কথা দুইটি পথিকের কল্পনা প্রসূত নহে। হাকিমের সম্মুখে ভৈরববাবু ও কেনীব কথাপ্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সাধারণের মুখে চলিয়া আসিতেছে। ভৈরববাবু কেনীব শুধু গরুচোর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আবও বলিলেন—“দেখ। তুমি আমাদের দেশের রাজা! দেশের লোকে তোমাকে ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, রাজার তুল্য মানা করে। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু টাকা উপার্জন করিবে, এইতো তোমার ইচ্ছা! তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি আমাদের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছ। যাহা যাহা করিয়াছ, এদেশের লোকে তাহা কখনই করিতে পারে না। দয়া, মায়া, ধর্ম, এবং হৃদয় হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে। তুমি দেশের গরুচুরি করিয়া কৃষি-প্রজার সর্বনাশ করিয়াছ। তোমার নিকটস্থ জমিদার, তালুকদারের যথাসর্বস্ব লইয়াও তোমার উদর পরিপূরণ হয় নাই। এখন দুর্বস্থিত তালুকদার, জমিদারের সর্বস্ব লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবে ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা। তুমি এদেশে

আমি কত পাপের কাণ্ড কবিতা, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? কত সত্যের সত্যনাশ, কত শত প্রজার যথাসর্বস্ব হরণ, ঘব জালানী, দিনেরাত্রে ডাকাইতি, নিরপরাধে দণ্ড, এসকল তোমার অঙ্গের ভূষণ। সকল ধম্মে যে কাণ্ড পাপ বলিয়া নিদ্রিষ্ট রহিয়াছে, তাহাও একটুকু তুমি নাকি রাখ নাই। তুমি ইংরেজ জাতির পাপ-কণ্টক। তোমার মত ইংরেজকে শতধিক! আমি খোলা-খাপরায় তোডাবন্দী কবিতা টাকা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে বাংলাদেশে লোক নাই, বাঙ্গালার মানুষ নাই। এ রত্নগর্ভা ভারতভূমির বঙ্গ খণ্ড কেন? যে খণ্ডে যাইয়া সন্মান করিবে তোমার পক্ষে কাল ভৈরবস্বরূপ—শত শত ভৈরব—দেখিতে পাইবে। রাজশবীৰ, রাজমন, রাজচরিত্র, রাজনীতিজ্ঞ, রাজবুদ্ধি, রাজচক্ষু, রাজ-বিবেচনা সংযুক্ত দেহেবই যে অভাব আছে—তাহাও মনে কবিও না। আব সকল মস্তকই যে বিকৃত তাহাও নহে। অনেক মস্তকেই প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর মস্তক-সদৃশ-মজ্জা আছে। মহাবীর, মহাবলশালী যোদ্ধার হাথ বাহুবলও আছে? সাহস আছে, হৃদয় আছে—ধবিতে গেলে কি না আছে? তবে সময় মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আজ তোমার নামে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। ভয়ে গভিনীর গর্ভ পর্যন্ত পাত হইয়া যাইতেছে। খুঁজিলে তোমার মত নামজাদা লোকই যে এই পবায়ীন বাজো না পাওয়া যায় তাহাও নহে। সময় মন্দ, কপাল মন্দ, তাতেই এই দশা।

কেনী বলিলেন—বাবু! “তুমি আমাকে বড় ঠকাইয়াছ।”

বাবু বলিলেন—“আমি তোমাকে ঠকাই নাই। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলে, আমিও তোমাকে পরীক্ষা কবিলাম। এবং দেখাইলাম ভাল-ভাতের গুণ কি? বাঙ্গালীর মাথায় আছে কি? আমি টাকার প্রত্যাশী নহি। অধর্ম করিয়া টাকা লইয়া আমার কয়দিন যাইবে। তুমি আমার কাছারি লুট কবিতা যথার্থ। আমি যদি ঐ কাছারির পথে সত্য-সত্যই খাজানার টাকা পাঠাইতাম তাহা হইলে তুমি কি করিতে? আমারই টাকা দিয়া আমারই বিষয় খরিদ করিতে—এইতো তোমার মনের কথা।”

কেনী বলিলেন—বাবু! আমি তোমার নিকট ঠকিয়াছি।

ভৈরববাবু বলিলেন—বেশ তুমি ইংরেজ, তোমার মাতা কোথায় না আছে? আমি বাঙ্গালী, আমার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলে, আমি টাকা পাইলাম।

দেখ ! বাঙ্গালীর-হৃদয়ে সাহস আছে কি না । দেখ ! ভৈরবের হৃদয় আছে কি না । এই বলিয়া পকেট হইতে ডিক্রিথ ও বাহির করিয়া স্বহস্তে ছিঁড়িয়া কেনীর হস্তে দিয়া বলিলেন—“যাও ! তোমায় ভিক্ষা দিলাম । চোদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি হইতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম ।” কেনী মহালজ্জিত ভাবে বিশেষ নম্র ও ভক্ত-তার সহিত ভৈরববাবুর হস্ত ধরিয়া কাছাবিগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—বাবু ! আমি জানিলাম তুমি যথার্থ বাবু । আমি আব কখনও তোমাব সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কবিব না । তোমার সহিত আর আমার কোনদিন কোন কারণে বিবাদ হইবে না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ।”

পরস্পর করমর্দন করিয়া বিদায় হইলেন । সকলে ভৈরববাবুর সাহস, উদারতা দেখিয়া অবাক হইল । কেনী সেই হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভৈরববাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখিয়াছিলেন । প্রতিজ্ঞা বক্ষা করিয়াছিলেন ।

ত্রিংশ তবঙ্গ

সংসার

পাঠক ! মীরসাহেবকে অনেকদিন হইল গোবীনদীর গর্ভে সাঁওতার ঘাট হইতে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়াছি । আজিও ভাসিলেন, কালিও ভাসিলেন বলিয়া বিদায় করিয়াছি । তিনি সময়মতো সিরাজগঞ্জ যাইয়া ভগ্নীর-বাটীতে গিয়াছেন । বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন । এদিকে সা গোলাম “অছিযতনামা” আপন মনমত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন । আব আর যাহা অবশিষ্ট ছিল, যে যে দলিল পরিবর্তন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল, স্ত্রযোগ পাইয়া সমুদায় দলিল পরিবর্তন করিয়াছেন । সেরেস্টার অগ্রাণু কাগজপত্র যাহার যেখানে দোষ ছিল, সমুদায় সারিয়াছেন । প্রধান প্রধান জালসাজদিগের আশ্রয়ে, অর্থের সাহায্যে এ সকল সাংঘাতিক ঘটনা-ঘটাইয়া, আটঘাট বান্ধিয়া দলিল দস্তাবেজ দুরন্ত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন । চাকর-চাকরাণীরা অনেকদিন হইতেই তাঁহার বাধা হইয়াছে । কাহাকে কৌশলে, কাহাকে অর্থ, কাহাকে তোষামোদে—যাহাকে যাহা দিয়া বাধা করিতে হয়, দিয়া আপন মনমত সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন । ঘরাও-বিবাদে প্রতিবেশি এবং দেশের লোকের বড়ই আনন্দ । লক্ষ্মীশ্রী যাহার চক্ষে সহ হয় না, নির্বিবাদে কোন পরিবার একত্র একজোটে থাকা যে নরাদম দেখিতে পারে না, আপন স্বার্থের জন্ত সা গোলামের সঙ্গে যোগ দিয়াছে । যে

পিশাচ ঘরাও-বিবাদ বাধাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জন করিয়া আদর বাড়ায়, সকল লোকেই সা গোলামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। যাহারা মীরসাহেবের নিকট কখনই স্থান পায় নাই তাহারাই এক্ষণে সা গোলামের পরামর্শদাতা। যে নীচ প্রকৃতির লোকেরা সাঁওতাব বাটির চতুঃসীমায় আসিতে থরহরি কম্পে কাঁপিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সা গোলামের প্রধান সাহেব। যাহাদের কোন স্বার্থ নাই, তাহারিও খোসগল্লের একঅঙ্গ মনে কবিয়া সময় সময় আসিতেছেন, যাইতেছেন। ঐ সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কাহার সর্বনাশ, কাহার পৌষমাস। কেউ ধনেপ্রাণে বিষয়-সম্পত্তি-হারা হইয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছে। কেহ ঐ ঘটনা লইয়া কত কথায় কত আমোদ মনে কবিয়া আমোদে মাতিয়াছে। কেহ “মামার জয়” মতে মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ সা গোলামের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে মোখিক মীরসাহেবের স্বপক্ষ হইয়া দুটি কথা বলিয়া অপর পক্ষের উত্তবেই হাব মানিয়া চূপ করিয়া বসিয়া সা গোলামের মনের মধ্যে যাইতে ঘুরিতেছে। সা গোলাম নিজেই নাচিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাহাবপর তোষামোদে কুকুরের পদ-সেবার আনন্দে মাতিয়া সকল কথা ভুলিয়া ঘরভাঙ্গা লোকেব কথায় কান দিয়া, আরও নাচিয়া উঠিয়াছেন। একথা ভাবিতেছেন না যে জগৎ কয়দিনের! মিথ্যা-প্রবঞ্চনা করিয়া একজনকে ঠকাইলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই একদিন না একদিন ফলিবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবেই হইবে। সে পাপভোগ একদিন ভুগিতেই হইবে। একপ্রকার গুপ্ত-ডাকাতি করিয়া মীরসাহেবকে পথের ভিখারী কবিতে বসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা অপার! যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাঁহাব জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় করিয়া দিবেন। কথা চিরকাল থাকিবে। জগৎ যতদিন কথাও ততদিন! হায়রে সংসার!

দেবীপ্রসাদের মন্তনায় জামাইবাবু সকল কার্য্য দৃঢ়রূপে পাকা করিয়া বাখিতেছেন। শেষদিনের কথা এখন কিছুতেই মনে স্থান পাইতেছেন না। রে মানুষ! রে সংসার! বে বিষয়! রে জমিদারী! রে লোভ! রে জামাঠ! তোর অসাব্য কিছুই নাই।

মীরসাহেব ভগ্নীর-বাটিতে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার বিষয়াদির স্মৃৎসনা করিয়া বাটি আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহার মধ্যে দুই-তিন খানি মাত্র পজ

জামাইকে লিখিয়াছেন—একখানিরও উত্তর পান নাই। উড়-উড়ভাবে কয়েকটি কথা তাঁহার কানে গিয়াছে—কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘরাও-বিবাদ বাধাইয়া দিতে দেশের কতকগুলি লোক বড়ই পটু। এই যুক্তিতেই—মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ হয় নাই। কার্য্য শেষ করিয়া বাটি আসাই মনস্ত করিলেন। ভগ্নীব নিকট সমুদায় ব্যক্ত কবিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাটি আসাই স্থির করিলেন। নৌকার জোগাড় কবিয়া মীবসাহেব সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে বওয়ানা হইলেন।

স্না গোলাম শৌলি পর্য্যন্ত লোক বাখিয়াছেন। সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া মীবসাহেবের গুপ্তসন্ধান গোপনে লইয়া স্না গোলামকে বলিতেছে। সংবাদ আসিল, মীবসাহেব বাটি অভিমুখে যাত্রা কবিয়াছেন। তিন চার দিবস পবেই দ্বিতীয় সন্ধানী আসিয়া বলিল, মীবসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বোধহয় দুইতিন-দিন পাবনায় বিলম্ব হইবে। সেখানে অনেক আলাপী লোক আছে। জেলায় বহুতর লোক। নানা দেশ-বিদেশের লোকে পরিপূর্ণ। বিশেষ মুন্সী নাদিব-হোসেন, পাবনা জেলার নাজিবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। দুই তিন দিবস পাবনায় না থাকিয়া আসিতে পারিবেন না।

স্না গোলাম এদিকে ভালবকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মীরসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। একথা গ্রামের লোক, চতুঃপাশ্বস্ত গ্রামের লোক, সকলেই শুনিয়াছে। বাটি আসিলে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটবে তাহাও সকলে পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছে। অনেকেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আছে। কিভাবে তিনি পৈতৃক বসতবাড়ি, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাড়িত হন, সকলেরই তাহা দেখিবাব ইচ্ছা। এক দুই কবিয়া তিনদিন কাটিয়া গেল। পাবনাতেও জামাই-বাবুর সম্মুখে মীরসাহেব অনেক কথা অনেকের মুখেই—তাঁহার পূর্ব্ব শোনাকথার জায়—শুনিলেন। মনে কিছু সন্দেহ হইল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যংশ না থাকিলে এত দূর ছড়াইবে কেন? সাধারণে শুনিবে কেন? সে কথা লইয়া আন্দোলনই বা হয় কেন? অবশ্যই কিছু হইয়াছে। অবশ্যই কোন কথা নূতন উঠিয়াছে। অবশ্যই কিছু না কিছু হইয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পদ্মা পার হইলেন। নৌকা গোবীশ্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাঝিরা জোরে দাঁড় টানিতেছে। সন্ধানী লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ দিতেছে যে, এই পর্য্যন্ত আসিলেন—অমুক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলেন।

মীরসাহেব লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছাড়িয়া সাঁওতাল ঘাটের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন যে, বহু-সংখ্যক লোক ঘাটে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবিলেন যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে নিশ্চয়ই সা গোলাম লোকজন সহকারে আমার অভ্যর্থনার জন্ত ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা বত নিকটে আসিতে লাগিল মীরসাহেব ততই আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিলেন। দেখিলেন সা গোলাম আছে, দেবীপ্রসাদ আছে, আরও অনেক লোক আছে। কিন্তু দৃশ্য ভিন্ন, এ দণ্ডায়মানের অর্থ ভিন্ন—ভাব ভিন্ন। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরবার, বাঁধাকোমর, রুদ্রভাব—রোষের লক্ষণ। সকলেই দণ্ডায়মান। ডাঙ্গার নিকটে নৌকা ভিড়িতেই উচ্চস্ববে একজন বলিয়া উঠিল “যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, যদি মান রাখিতে চাও তবে এঘাটে নৌকা-ভিড়াইও না। ভাসিয়া আসিতেছ, ভাসিয়াই চলিয়া যাও। এ-ঘাটে কোন প্রয়োজন নাই। নৌকা লাগাইবার কোন অধিকার নাই।”

শ্রোতস্বতী গোবীরশ্রোতে নৌকা টানিয়া ধরিয়া নৌকার বেগবন্ধা করিতে বা ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুখের কথায় কেমন করিয়া কুল না ধরিয়ে কি প্রকারে অন্তদিকে যাইবে অথবা ফিরাইবে? শ্রোত ছাড়াইয়া মন্দশ্রোতে নৌকা পড়িতেই দাঁড়িবা দাঁড় ছাড়িয়া লগী ধবিল। তখন দেবীপ্রসাদ পুনরায় বলিতে লাগিল—“এখানে নৌকা ভিড়াইতে পারিবেন না, কেন অপ্রস্তুত হইতেছেন।”

পাঠক! যে জামাই শতহস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শৃঙ্গুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ-আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শৃঙ্গুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারি হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উন্টাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্ধুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাইবাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীরসাহেবকে মান্য করে? সর্দার, লাঠিয়াল, এবং অন্ত অন্ত আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীরসাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না।

মীরসাহেব বুঝিলেন যে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। দুধে গোঁ-চনা মিশিয়াছে। দেবীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নৌকা ভিড়াইবে না কেন?”

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“নৌকা লাগাইয়া কি হইবে? নৌকা লাগাইতে আমরা দিব না। আপনি দেখিতেছেন না?”

“কই আমি তো কিছুই দেখিতেছি না! তোমরা কি আমাকে আগু বাড়াইয়া লইতে আইস নাই?” তখন জামাইবাবু মুখে কথা ফুটিল।

স্না গোলাম কর্কণভাবে বলিলেন,—“না, না, খাতির-তওয়াজা করিয়া লইতে আসি নাই। একেবাবে দূর কবিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি। এ মাটি তোমার নয়, এ-ঘাট তোমার নয়, এ জমিদারী তোমার নয়, এ-বাড়িও তোমার নয়। বড় মীরসাহেব অভাবে সকলি তাঁহার কণ্ঠ্য—তোমার ইহাতে কোন স্বত্ত্ব নাই!”

মীরসাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাপু! তুমি স্থখে থাক! আমি চলিলাম।

জলের উপর থাকিয়াও জামাইয়ের কথায় মীরসাহেব যেন দশহাত মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। কোনদিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বলিলেন না। গোবীন্দ্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। সাঁওতাল ঘাট ছাড়াইয়া ক্রমে চাপড়াগ্রামের সীমা ধরিল। তখন মীরসাহেব বলিলেন—“ওরে কোথায় যাই?”

নৌকা লাগাইতে অল্পমতি করিলেন—আর বলিলেন, ‘এপারেই থাকিব না। পাড়ি দিয়া ওপারে যাও। মাঝিরাও নৌকার মুখ ফিরাইয়া দাঁড় ধরিল। অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই নৌকা অপরপারে গিয়া চবে ঠেকিল। মীরসাহেব পৈতৃক-বাটি, জমিদারী ও জিনিসপত্র ইত্যাদি সমুদায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আজ সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন। তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার-চাঁদ জামাই তরবারি হস্তে আজ গৌরী-গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া স্থস্থির হইলেন। হাসিমুখে দলবলসহ বাটি আসিলেন আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু চিন্তার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইল। অল্প অল্প সকলেই আজিকার এই ঘটনায় মহা-দুঃখিত হইলেন। মীরসাহেব কাহারও নিকট এ-দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সেই পূর্ব-সাহস, সেই পূর্ব-বল, সেই পূর্ব-আমোদ, পূর্ব-ভাব, সকলি সমভাবে রহিয়া গেল। তিনি প্রায় ছমাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থান বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতাল অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতন-নোসাকে বিবাহ করিলেন। আবার সংসারী হইলেন।

একত্রিংশ তরঙ্গ

দৌলতনেনসা

মাননীয় দৌলতনেনসা দেখিতে উজ্জল শ্রামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কণ, নাসিকা, ক্র, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা কবা পথিকের অসাধ্য। অপূর্ণের সহিত তুলনা কবিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান বর্ণা মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাঠিলাম না। হয় তো এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিকে পাগল মনে করিতে পারেন। কি কবিব! পথিকেব চক্ষে যদি জগতের কোন বর্ণাকেই দৌলতনেনসার সহিত তুলনা কবিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি কবিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকেব চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জলিয়া-পুড়িয়া যদি এই তবঙ্গ পাঠ না কবেন, আক্ষেপ নাই। কাবণ জগৎ পবান, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান বর্ণা আসিয়া বিভূষণভাবে দাঁড়াইলেন। ইহাদের মধ্যে বাজকন্ঠা, মহামানীয় বংশের অতি-পবিত্রা, সদ-চরিত্রা, দেবীসদৃশা, বর্ণাকুলের শিরোমণি মহোদয়গণও বহিয়াছেন। মহামতি লিখকগণ-হস্তে যিনি, যে অবস্থায় যে প্রকাব কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহাও অনেক বহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত বর্ণীগণ মধ্যে—অনেকেই পবিত্রা, অনেকেই স্বর্ণীয়া বর্ণা-সদৃশা। অনেকেই রূপেগুণে ভুবন-বিখ্যাত। কিন্তু সর্ব-বিষয়ে সর্বোচ্চিনী স্তন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সেকথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতনেনসার রূপই যেন জগতের আরাধ্যা, পথিক-চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহানিন্দুক, মহাপাপী, বলিয়া নানাপ্রকার ভৎসনা করিতে পারেন—করুন, পথিক তাহা সহ করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যাহার যেরূপ মনের গতি এবং মাধার ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের জী, ইহারা মহাপবিত্রা এবং পূণ্যবতী? দৌলতনেনসা

তঁাহাদের কিস্করীর কিস্করী ! মুসলমান জগৎ-চক্ষে তঁাহাদের দাসীর দাসী । কিন্তু সপত্নী বাদে, হিংসার আগ্নে তিনি মনে মনে জলিয়া-পুড়িয়া থাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই । আকার-প্রকারে, হাবভাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই । তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব । আর একটি কথা—

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামাতা হাসেন-হোসেনের জননীবিবি যিনি ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠা । সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয়দাত্রী । তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ—মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন । সে মহাযাতনাসম্বৃত্ত মহাবিশ সে পবিত্র শবীবোও প্রবেশ কবিয়াছিল । পয়গম্বরের দুহিতা, এমামেব জননী, মহাবীরেব অঙ্ক-লক্ষী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই । অনেক সময় বিবি হুজুর নামে জনিষা উঠিতেন ।

পথিকেব পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তেব জগৎ শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই ! সে মিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের জগৎ স্বামীর মন হইতে সবিয়া যান নাই । ইহা কি কুলদ্বীর গোববের কথা নহে ? —উদাসীন পথিকের কি গোববের কথা নহে ?

বিবি আয়েষাসিদ্দিকা হজরাত মহম্মদেব প্রিয়তমা স্ত্রী । শান্তে বলে হজরাত নূরনবী মহম্মদ, আয়েষাসিদ্দিকাব বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন । জীবনের শেষসমায় ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল কবিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন । সে সময় আয়েষাসিদ্দিকার বয়স সবে আঠার বৎসব ছিল । এত অল্পবয়সে পতি-পরায়ণা, পতিগত-প্রাণা ছিলেন । বদরল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় কিবিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছুদিনেব জগৎ সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্ৰিয়পাত্রী হইতে হইয়াছিল ।

রমণী-প্রধানা বিবি খাদিজা প্রভু মহম্মদেব প্রধানা স্ত্রী । কয়েক স্বামীব পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদেব কার্যো ও বিশ্বাস-গুণে বয়সের ন্যূনাধিকা থাকা সত্ত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । সে সময় প্রভুর বয়স পঁচিশ বৎসর । তখনও ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব-খণ্ডে পরিচিত হন নাই ।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ-প্রাপ্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া, জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন । ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে ।

অন্তরূপ চিত্র দেখুন। আফ্রিকাখণ্ডে নীলনদ-তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজিজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী-মহোদয় সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম “জুলেখা”। তিনিও ধর্মের মাধ্যম কুঠার মারিয়া পবিত্র-প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, —রূপে মোহিত হইয়া, বমণীকূলে কলঙ্করেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে, কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে “হফতম খানা” (সপ্ততল বাসর) নির্মাণ করিয়া নিজ-মূর্তিসহ মানসাক্ষিত নাগরে প্রেম-ভাবপূর্ণ, কুরুচি-সম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। মহাধর্মী মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার বক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি কিবাইতে সাধ্য কাব? সে চিত্রে সে মন ভুলিল না। জুলেখা মিথ্যাভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহাবত্ন ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতেও ত্রুটি করেন নাই। স্তবধা পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভাবতরমণী “নূরজাহান” শেষে রাজবাণী। প্রথমে শের আফগানের মন-মোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি। অন্যায়সে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজবাণী হইয়া আবও যশস্বিনী হইলেন। অকাতবে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন? রাজদৌরাত্ম্য-ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিতে কি সে-সময় কোন উপায় ছিল না? যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক—সীমন্তিনীর রূপগুণের প্রশংসা সহস্রমুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্তর্য্যাক্ষে ফিরাইল।

তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কিম যে-চক্ষে আয়েষার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে “পজিসনে” তিলোত্তমার “ফটো” তুলিয়াছেন। যে তুলিতে কুন্দ-নন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে রূচি ও প্রবৃত্তিতে কৃ-স্বভাব-সম্পন্ন—মালিনীর মুখে বিচার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতনেনেসার রূপগুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষকথা দৌল-তনেনেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্রপদই পথিকের মুক্তিপদ, পূজনীয় পদ। স্বর্গ হইতেও গরিয়সী। ইহা

অপেক্ষা পথিক আর কি বর্ণনা করিবে। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইবে? কাজেই নীরব। কাজেই সেকালের কথা, একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুভন।

মীরসাহেব পৈতৃক-বসতবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছে। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতনেনসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে রাখিয়াছেন। পিতাব সঞ্চিত সমুদায় অর্থ স্বামী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী পদসেবায় সর্বদা-বত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোনরূপ কষ্টের কাবণ না হয় তদপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতনেনসাবের পিতা বঙ্গপুর জেলায় মীরমুন্সীব কার্য করিতেন। কথায় কথায় টাকা আসিত। তাঁহার বংশের প্রদীপ, উজ্জল-বহু, মহামূল্য-মনি যাহা বল, সকলই ঐ একমাত্র কণ্ঠা। স্মরণ্য কন্ঠার আদরে জামাই সর্বসর্ব্ব হইয়া উঠিলেন। বিবাহের দিন বৎসব পব মুন্সী জিনাতুল্যা পবলোক গমন করিলে সংসাবের সমুদায় ভাব মীরসাহেবের শিরেই পড়িল। ভাগী নাই, অংশী নাই, অন্ন দাবী নাই, কোন বিষয়ে অভাব নাই। পাঠক! দয়াময় জগদীশ মীবসাহেবকে বাহ্যিকস্থে একপ্রকার সে-সময় ভালই রাখিয়াছিলেন। সর্বদা হাসি-খুসী, রঙ্গ-তামাসাতেই। সংসাবষাত্রা নির্বাহ কবিতো লাগিলেন। বসিরুদ্ধীন আবার আসিয়া জুটিয়াছে। গান, বাজনা, বগড, আমোদ, বেদম চলিতে লাগিল।

দৌলতনেনসা নিজগৃহে শবন করিয়া আছেন। বাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীবসাহেব আমোদ-আহ্লাদেই আছেন। দৌলতনেনসাবের কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামাকণ্ঠে মধুবক্ষনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুবেব ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতোছে। ষত রাত্রিই হউক স্বামীব সহিত দেখা হইলে, সেই বিগুহ্ণভাব, সেই বিগুহ্ণ-প্রেমভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি-কথা।

পাড়া-প্রতিবেশীরা সময় সময় অনেক অনেক কথা বলিত। তোমাবই বাড়ি, তোমারই ঘর, তোমাবই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি একঘরের একটি মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্বদা রঙ্গ-রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীরসাহেবের এ-নিতান্তই

অন্ধ্য। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড়ই পস্তাইবে।

দৌলতননেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ি-ঘর, টাকা, কাহার? বল তো বোন! আপন জীবনই যখন আপনাব নয়, এ-জগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তাবপবে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন, এত টাকা তাঁহাব ছিল। না ছিল কি? সন্তান-সন্ততি, পরিবার সকলই ছিল। সংসাবে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটিক্রমে তাঁহাব ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোনদিন কোন কথা মুখে আনেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে একরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বোন! তাঁহাব মনে দুঃখ কত? ও গান-বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুতাবের কাবণ নাই। আব কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আব ইহাই ঈশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা কবি যে তিনি স্থখে থাকুন। তাঁহার অসীম-চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক, তাঁহার মনেব দুঃখ ক্রমে উপশম হউক। তিনি যাহাতে স্থখে থাকেন সেই আমার স্বথ। প্রতিবেশীবা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া বহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়াই চলিয়া যাইত।

দ্বাত্রিংশ তবঙ্গ

অপূর্ব দৃশ্য

জগৎ অসীম নহে। সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে, তাহাব সীমাপরিমাণ, শেষ যাহাই কেন বল, না অবশ্যই আছে। স্থখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, উন্নতি, অবনতি সকলই ঐ সীমারেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। সুস্থ-তাই পীড়াব পূর্ব্ব-লক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটি কথার মধ্যে, আদি, মধ্য, অন্তসীমা সকলই রহিয়াছে! আবার দেখুন, উদয়ই অস্তের কারণ! বজ্রনৌ প্রভাতের আদি-লক্ষণ! প্রভাত আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। স্বতরাং উন্নতির শেষসীমাই অবনতির সূত্রপাত। সীমাবেধা-স্পর্শ করিলেই পরিবর্তন। কেনীয়া দৌরাঅো অগ্নি রহিয়া রহিয়া জলিয়া একেবারে সীমারেখা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব-রূপে আয়তাদীন নহে। স্ব-ভাবেব অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার,

মধ্যশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কি করে কোথায় গেলে বক্ষা পায়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্তপ্রকাব দাঁড়াইয়াছে।

অতীতকালে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায়, এবং “পেটরিয়টের” সেই জলন্ত ভাবপূর্ণ বাক-বিত্ত প্রায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু, দীনবন্ধুব মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকের হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারত-বন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতীসাজে সাজাইতে গিয়া কাবাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজাব টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ-সহকায়ে দান করিয়া তবজমা-কাবককে খালাস কবিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ-জ্যোতি-সহকারে, পূর্ণ-কলেবরে, পূর্ণচন্দ্র-রূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্ন্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্যন্ত টলিয়াছে। মহামতি লাটবাহাদুর প্রজার দূরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত নীলকরের দোবাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্ত “সোনাগুখী” আশ্রয়ে মকস্বে বাহির হইয়াছেন।

বর্ষাকাল। কালীগঙ্গা জলে পবিপূর্ণ। “সোনাগুখী” নদীয়া অঞ্চল ঘুবিয়া, কুমারনদ হইয়া কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। কালীগঙ্গাব আজ অপার-আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয়তরী বঙ্গে করিয়া প্রজার দুঃবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘব মধুয়ার কুঠি পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক! যখন সৌভাগ্য গগনে স্তবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আজ প্রজাব ভাগ্যে তাহাই ঘটয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে এই জাহাজে লাটসাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা লাটসাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গাধীপ স্বয়ং মকস্বে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলও তাহাই।

কালীগঙ্গার দুইধারে সহস্রাধিক প্রজা স্তিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্রমুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্মাবতার! আমরা

মারা গেলাম। আমরা একেবারে সাবা হইলাম। আপনি রাজা, আমরা প্রজা, আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমরা ধনেপ্রাণে সাবা হইয়াছি। আমাদেরকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার। আমরা ধনেপ্রাণে একেবারে সাবা হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যান। যমের হাত হইতে আমাদেরকে উদ্ধার করিয়া যান। “শ্যামচাঁদ” আঘাতে পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে একবার পবিত্রচক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশের রাজা! আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার! আমাদের দুঃখের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহাব কর্ণেই বা যাইবে? ইঞ্জিনের স্বাভাবিক বিকট-শব্দে প্রজাব আর্ন্তনাদ লাটমহামতিব কর্ণে উঠিবে কেন? বোধহয় তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, গ্রামালোক স্টিমার কখনও দেখে নাই, তাহাই ছুটাছুটি করিয়া শোরগোল করিয়া আমাদের সহিত দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়িতেছে। ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমেই কান্নার-বোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। স্টিমার উজ্জানমুখে যাইতেছে। স্রোতবেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীরে চলিয়াছে। কালীগঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। একপারের কথা অপরপারের লোকে বিনামনযোগে বুঝিতে পারে। স্টিমারের সেই কর্ণভেদী ধব-ধব-ঘস-ঘস শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়-বিদ্যাক আর্ন্তনাদ গ্রান্টমহামতিব কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্য হইলেন। যেমনই মনযোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাত। উভয়কূলের বহুসংখ্যক প্রজাব আর্ন্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্থ করিলেন সে জেলায় যাইয়া ইহাব ব্যবস্থা করিবেন। প্রজাব দুঃখ নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতির মনেরভাব প্রজাব জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাসমূলক একটি কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমাদের এই কান্নায় লাটমহাশয়ের স্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন, আমরা মনের দ্বাব খুলিয়া দেখাইব। দুঃখের কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। স্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য! “নীলকরের দোরাআ আঙুনে আর কতকাল জলিব। রাজগোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার! তত্রাচ নীল আর বুনিব না।” এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদীকূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে ষ্টিমার দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়ী নাই, জীবনের আশা নাই,

কোনরূপ স্থখের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাখ্যে মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ-সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে কাঁপ দিয়া পড়িল, নদীশ্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতি লাটবাহাদুর মহা-বাতিবাস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালিবোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ কবিলেন। যাহাবা সস্তরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমাবের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া ছুববস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় প্রজা ষ্টিমারের চতুঃস্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালিবোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কান্না কান্দিতে লাগিল। প্রজাব ছুববস্থার কথা শুনিয়া লাটবাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। দশ-বাব জন প্রজাকে ষ্টিমারে লইয়া অপব অপব সকলকে আশ্বাস বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—‘তোমাদের যাহার যে নালিশ থাকে, আগামী পবন্ত শনিবাব পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুঠিয়ালকে ভয় করিও না। এ-দেশে তাহাবাও যেমন প্রজা, তোমরাও সেইরূপ প্রজা।’ এই বলিয়া ষ্টিমাব ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই সোনামুখী গোবীর অগাধ জলে আসিয়া গড়িল। দেখিতে দেখিতে গোবী পাব হইয়া পদ্মাব শ্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

ত্রয়োত্রিংশ তবঙ্গ

সূত্রপাত

নীল—বিদ্রোহের সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান-আহার কবিয়া—ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধপোড়া, ভাতেভাত যাহা জুটিল আহাব করিয়া গ্রামেব মাথালপ্রজা ছাতি-লাঠি, গামছা লইয়া লাটদরবারে যাত্রা কবিল। নীলকরের দৌরাখ্য আগুনে যাহারা পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছিল, তাহাবাই জিলায় চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে, পাড়ে, সিং মোতাইন কবিয়া বাখিষাছেন। তাঁহার এলাকার যে প্রজা পাবনায় যাইবে তাহার পিঠের চামড়া থাকিবার তো কথাই নাই। তাহার পর অল্প ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্তবতাটার মাটি আর চোখে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী-পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

একথা কুঠিয়াল পক্ষেব মুখে জাবী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ করিল না। বাতাসে কথা আসিল বাতাসেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই উৎসাহ, সেই আনন্দ। কাব কথা কে শোনে? কে আজ সেকথা গ্রাহ কবে, আমীন, তাগাদগীব, পাইক, ববকন্দাজের ভকুমের চোটেই আগুন জলিয়াছে, আজ খোদকেনীর ভকুম শুভে শুভে উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ,—অন্য কানে বাহির! ভকুম অভুলেব ভয়ে প্রজাব হৃদয় থরহবি কম্পে আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর কবিয়া সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া জিলায় চলিল। কি আশ্চর্য্য! খোদখমের ভকুম আজ শুভে শুভে উড়িয়া গেল।

হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষবিস্তার কবিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহাবও কোন কথা কানে কবিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেশ্বরের মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজাব চিব-পবিশুস্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশাবারিব সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধা বাধা দেয়? কাব সাধা সে মাত ওয়াদিগের গতি, ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কাব সাধা তাহাদেব সম্মুখে ঐ কথা মুখে কবিয়া দাঁড়ায়? পথ-ঘাট ভবিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজাব সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন, জানি না। তাঁহার কর্ণে এইমাত্র উঠিল যে—“অমুক-অমুক গ্রামেব প্রজারা ভকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনায যাইবে।”

আব কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি ভকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতিঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের গায় বাছা বাছা সর্দার, লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী, দেশ-ওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে কবিয়া মনিবেব নিকট বাহাদুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজাদমনে চক্ষুবাস্তা করিয়া চলিলেন। চলিলেন—না ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজার চক্ষে পড়িল, তাহাদেব চক্ষের চাউনি দেখিয়াই তাহাদেব শরীর গবম হইয়া গেল। চক্ষের কথা তো আপেক্ষিক নহা হইয়াছে। কাবণ যাহা কখনো দেখেন নাই, কানে শোনে নাই, তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ কবিতাই একজন শোর করিয়া বলিয়া উঠিল—“ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?”—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সে তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহু-লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—“ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আব এক-পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবো। কাল লাটসাহেবেব মুখে গুলিয়াছি, কুঠেলসাহেববা আমাদের রাজা নয়, হর্ত্তাকর্ত্তার মালিকও নয়। ওবে! আমবা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব। এতদিন যা-যা কবেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝোছি। আর হবে না—এখন খুব বুঝেছি, আমবাও প্রজা তোমরাও প্রজা। আমরাও যা তোমরাও তাই। ভাল চাস ফিরে যা—আব আগে বাড়িস না। আমবা যথার্থ বাজাব কাছে যাচ্ছি। তোদের ও-ভেল—রাজার কথা কে শোনে রে?”

কুঠিব চাকর! কমপাত্র নহে সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ে তালু হইতে মাথা পর্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া থাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও কবিল না, চিন্তা কবিবার সময়ও পাইল না। হঠাৎ একরূপ কেন হইল? একরূপ পরিবর্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে তাবাও কঠিন কথা। চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠিব চাকর, পূর্ণমাত্রায় সর্বদাই রাগেচড়া। ঐ সকল মর্মভেদী কথায় বেগে ভূত হইলেন। স্ব-স্ব পদ-মর্যাদা, কুঠির ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সহ কবেছি, সাহেবের শ্রামটাদের যা আজ পর্যন্ত পিঠে বিরাজ করছে। উঠতে কানমলা, বসতে কানমলা, লাথি, কিল, চড়চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়েমানুষ ধবে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশী কথা বলছে, কালও এই কালীগঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণবাড়ি দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এতবড় কথা, কি কাণ্ড! এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিতভাবে তেড়িমেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—

মার! দের! মার! দের! একমুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের পঞ্চাশ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট পীট প্রায় পাঁচশত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা—বেশীর

ভাগ প্রজার মনেব অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি ? কর খুন ! মার ! দেয় ! ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠি—

যাহা ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ বলিতেছি পথিকের মনে বড়ই কষ্টবোধ হইল ! চক্ষে জল আসিল ! পাঠক ! যথার্থ বলিতেছি মনে সেই একপ্রকার ভাবেব উদয় হইল । যে, হা ! কাল কি আজ কি ভগবান ! তোমাব যে অপার মহিমা, তোমার যে অপার লীলা ! তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকাব এই ঘটনা । নীলকব এবং প্রজার ঘটনা । সাধারণ চোখে দেখিতে গেলে কিছুই নহে । হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে পারে । কিন্তু স্থিরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনার ভগবানেব একটি মহৎ-মহিমার স-প্রমাণ হইল ।

পাঠক ! অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায় । কেনীর কাব্য-কারক, লাঠিয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটি গান পথিকের মনে পড়িল । গানটি শুদ্ধ—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন.—বিস্তারিত বর্ণনায় আর শক্তি হইল না গানেই বুঝিবেন । শুদ্ধ—

গান

দেখ ভাই জলেব বৃদ-বৃদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা ।

আজি কেউ বাদশা হয়ে দোস্তল'য়ে রংমহলে কবছে খেলা—

কাল আবার সব হারিয়ে ফকির হয়ে সার করেছে পাছেরতলা

আজি যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মাবছে জুতা এড়িতোলা—

কাল আবার কপনীর পরে টুকনীর করে, কান্ধে ঝোলে ভিক্ষাবঝোলা ॥

আজি যেখানে শহর কতই নহব বসিয়াছে বাজারমেলা—

কাল আবার তথা নদী নিরবধি করছে তরঙ্গ খেলা ॥

পাঠক ! কুটির লোক প্রজাশাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কুটির নিকটবর্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরি লইতে আসিয়াছিল—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল, সেই গ্রামেই ঐ এক কথা । একরূপ অভ্যর্থনা । একরূপ ভাব । শেষফল সকল স্থানেই সমান । গ্রাম বিশেষ, কিছু ইতর বিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে । কোন-দলই দল বাধিয়া আর কুঠিমুখ হইতে পারিল না । নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে স্ববিধা-স্বযোগ পাইল, গ্রাম লইয়া কুঠিমুখে ছুটিল ।

ছুটিল কি ? পালাইল । কাহাকে বাধা হইয়া ঘোড়াটি ছাড়িয়া যাইতে হইল । কেহ কেহ পবিদেয় বসন ফেলিয়া বাধা হইয়া দিগম্বরবেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল । ঢাল, তরবার, লাঠি, ঠেঙ্গা কালীগঙ্গার স্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবাব ঐখানেই ডুবিয়া পড়িল । জলে ফেলিল কে ? অমোঘঅস্ত্র সকল আজ জলে বিসর্জন করিল কে ? সকলি সেই দয়াময়ের মহিমা । কুঠির লোক প্রাণ লইয়া পার । কেনীব অস্ত্র প্রজা হস্তে আজ প্রথম জলে ভাসিল, এই প্রথম জলে ডুবিল । যাহারা দব্বারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধাবিহ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাটদরবারে চলিল । পূর্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহাবাও অনেকে তাহাদেব সঙ্গি হইল । কি জানি আবার কোন দুস্মন কোন পথে কি ঘটনা ঘটায় । হিন্দু-মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সাব বাঁধিয়া পথে বাহিব হইল । কালীগঙ্গায় গৌরীগর্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি বাস্তায়, পদব্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন । সকলের মুখেই আনন্দের আভা । সকলেই যেন কি একটা মহৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে আশয়েই মহাখুশী । সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত । সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে । অবিচাবে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল । দৈববলে বলীয়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে ! পদ্মা-গৌবী-সংযোগস্থল বড়ই ভয়ানক । পদ্মা পাড়ি না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই ! নৌকাতে পদ্মাপার হইতে হয় । স্থখ-পথে বান্দারাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচাদিয়াডেব ঘাটে পাটনীর নৌকায় খেয়াপার হইতে হয় । পাঠক ! চলুন আমবাও পদ্মাপাবে যাই ।

চতুর্ত্রিংশ তরঙ্গ

দরবার

আজ শনিবার । বঙ্গেশ্বর প্রকাশ্য দরবারে প্রজার দুর্বস্থা শুনিবেন । প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবেন । এই ঘোষণা । জিলাময় লোক । মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, ইছামতী:নদীর পূর্ব-পশ্চিম, উভয়তীরে, দালানে, কোঠায়, ঘরে, বোটে, বজরায়, নানাবিধ স্থানে লোক আর ধরে না । লাট দেখিতে, দরবার দেখিতে, মনের বেদনা জানাইতে নীলকরের দৌরাঙ্গা বিষয় বঙ্গেশ্বরের গোচর করিতে

হিন্দু, মুসলমান, কৃষকশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, তালুকদার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত। নীলকর পক্ষীয়, নীলকর সংশ্রবী, হিঁতৈবী, ভালবাসার লোকও যে ঐ সকল দলের মধ্যে কেহ কেহ না আছে একপাও নহে। তাহারা নানাবেশে, নানাভাবে দলমধ্যে গোপনে, প্রকাশে বেড়াইতেছে—সন্ধান লইতেছে। উপস্থিত লোকসমুদ্র মধ্যে কুঠিয়াল-পক্ষীয় লোক বিন্দু-সদৃশ। হঠাৎ কাহারও নজরে পড়িতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সে দুস্মন চেহারা যেন মার্কামারা। মুখের দিক নজর পড়িতেই যেন মুখভাবেই স-প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরাই কুঠিয়াল-পক্ষীয়। আমরাই নীলকরের গুপ্তচর ও সন্ধানী। বড় বড় জমিদার বড় বড় বজরায়, বড় বড় নিশান উড়াইয়া, ঘাট-অঘাট আলো করিয়া ইছামতীব বক্ষে ভাসিতেছেন। বায়ু প্রতিঘাতে জল নাচিতেছে। বোট-বজরাও নাচিতেছে। অনেকেই নানাদোলায় ভুলিতেছেন। কে কোন পক্ষে থাকিবেন, প্রজাব হইয়া দুইটি কথা বলিবেন কি নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিবেন। লাটসাহেব আজ আছেন কালই চলিয়া যাইবেন, শেষে—ধরিবে কে? কুঠিব নায়েব, পেস্কার দেওয়ানজীবাবুকে কত ডালা, কত ফলফুল, কত চব্বা-চম্ভ-লেহ-পেয় দিয়া একটু অল্পগ্রহ পাইয়াছেন। লোকে বলে ভালবাসা হইয়াছেন। তাহার পরেও কত ঝড়ির, কত তৈল উপহার দিয়াছেন। কত আলাপী লোকের নিকট হইতে গ্রিসীয়ান মিলিপার কেহ ঠনঠনের জোগাড় করিয়া আমলাদিগের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। তাহাতেই রক্ষা! তাহাতেই আজ বজবার মাঙ্গলে বড় বড় নিশান। কুঠিয়াল-দিগকে দিয়েথুয়ে যা আছে তাহাতেই কষ্টেমেটে কোন গতিকে মানসম্মত বজায় রাখিয়া এতদিন কাটাইয়াছেন। মনের কথা মনেই আছে। মুখ ফুটে প্রকাশ করা জমিদারশ্রেণীর বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছে। পরিণাম ফল প্রতি তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রজার দিকে থাকিলেই বা কি হয়। নীলকরের পক্ষে তো যে প্রকারেই হউক, প্রকাশেই হউক, মানসম্মত বজায় রাখিতে গোপ-নেই হউক, একভাবে আছেনই। আর প্রজার পক্ষে যে না আছেন তাহাও নহে। গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়াছেন। আজ পর্যন্ত, কোন পক্ষের নিকটেই মনেমুখে, পরিচিত হন নাই যে তিনি কাহার? রামের, না রাবণের? নীলকরের না প্রজার—বড়ই কঠিন সমস্যা উপস্থিত! আর পা দিয়ে

সাপ খেলান চলিল না। দুইমন যোগাইয়া নিরাপদে থাকা আর ভাগ্যে ঘটিল না। মহা-সঙ্কটকাল উপস্থিত! এই শ্রেণীমধ্যে মীরসাহেবও আছেন, সা গোলামও আছেন। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র নৌকার। কে কোন পক্ষে আছেন তাহ! এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা একপ্রকার জানা কথা। মীর-সাহেব যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সা গোলাম তাহার বিপরীত দিকে—বিপক্ষে নিশ্চয়ই থাকিবেন। মনে স্তব্ধ কাহারও নাই। অন্য অন্য জমিদারগণেরও ঐ কথা! মনে নানাকথা। স্বার্থ, লোভ, স্বদেশ, প্রজা, নীলকব গুদাম, শামচাঁদ, নীলহুউজ, নীলের নৌকা, গুণ টানা ইত্যাদি। অন্য দিকে লাটদরবার! যা থাকে কপালে ইত্যাদি নানা কথায় নানা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত। মনে-স্তব্ধ কাহারও নাই। প্রজার মনেও স্তব্ধ নাই, নীলকরের মনেও স্তব্ধ নাই।

সোনামুখী ইছামতীগর্ভে নানাসাজে সজ্জিত হইয়া উচ্চ-মাস্তুলে ব্রিটিশ নিশান সদর্পে উডাইয়া—শ্রীশ্রীমতী মহাশয়ী জয়! ঘোষণা, ইছামতীর শ্রোতের সহিত একত্র মিশিয়া করিতেছে।

বর্ষাকাল। শহরের প্রায় তিনদিকে ইছামতী পবিথাকপেঠ স্বাভাবিক বক্রগতিতে পদ্মায় মিশিয়াছে। পবিসব বেশী নহে। এপাব-ওপাব, কথা। যাওয়া-আসা করিতে পারে। কালগতিকে জলস্থল প্রায় সমান হইয়াছে। নদী কিনারের দালান, কোঠা, বড়াস্তা, বড় বড় গাছ, তাহারপরেই বোট, বজরা, ডিঙ্গি-নৌকা, জল, মাস্তুলে নিশান। একটু দূরেই সোনামুখীর সেই মহামাস্তুলের মস্ত-কোপবী বাজনিশান অতি গম্ভীরভাবে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন চিহ্ন বায়ুকে দেখাইয়া সর্বত্র ঐ আগমন সংবাদ প্রচার জ্ঞাত নম্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, শ্রোতসহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইছামতীর পশ্চিমতীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারিবান্দিয়া, দাঁড়াইয়া, জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়ানৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মফস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারে সাজ-সজ্জা, বাহার, জাঁকজমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আসন। তিনখানি বড়চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে একখানি গদীবসান ভাল চেয়ার। তহুপরি জুড়াও চাঁদওয়া। জিলায় হাকিমান, থানাদার, জামাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার

সকলেই হাজির। দুইপ্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্দিগণ্য-সম্ভাস্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দিক হইতে সাধারণ প্রজার চরিত্র-বোল এবং আল্লা-ধ্বনিতে জনস্থল কাঁপিতে লাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণসহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। জনস্থল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে ‘চুপ চুপ’ কথা উঠিয়া অতিঅল্প সময় ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নীরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণের মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি বলিবার থাকে তাহা বল”—মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতিকম হইলেও দশহাজার মুখে একযোগে বলিয়া উঠিল—

“দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমিতে জবরাণে নীল-বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।”

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষ সমুদায় পারিষদ স্বয়ং বঙ্গাধীপ, স্থানীয় হাকিমান প্রভৃতি প্রজার প্রার্থনাপত্র হাতে লইয়া লাটসাহেবের দক্ষিণ-বামে রাখিতে লাগিলেন। পাঠক! একেবারে উপকথা মনে করিবেন না। এত প্রার্থনাপত্র দাখিল হইল যে লাটবাহাদুরের দুই পার্শ্বে দুইটি কাগজের স্তূপ খাড়া হইল। একটি মানুষ সেই স্তূপের পার্শ্বে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তথাচ ইতি নাই, ক্রমেই হাতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রজার আর্তনাদ। নীলকরের দৌরাত্ম্য কথা, অত্যাচারের কথা লাটবাহাদুরের কানে আসিতেছে। মুখে যে কথা প্রার্থনাপত্রেও সেই কথা। তবে বিস্তারিতরূপে লিখা। কিন্তু মূল একই। প্রজার মনের জ্বালা, প্রার্থনাপত্রের চুষকভাব বুঝিতে লাটবাহাদুর কেন, দরবারস্থ যাবতীয় লোকেরই বুঝিতে বাকি রহিল না। নীলকরের অত্যাচার যে প্রজাগণের অসহনীয় তাহাও

বেশ বোকা গেল। নীলকর পক্ষীয় লোকের এবং দারোগা, জমাদার ও স্থানীয় হাকিমান, জমিদার সকলের সম্মুখে প্রজাগণ কাতরস্বরে দুঃখের অবস্থা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল। মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। হাকিমান লজ্জিত, দারোগা, জমাদারের মাথা হেঁট, নীলকবের মুখে চুনকালি, প্রজার চক্ষে জল। আর বুঝিতে বাকি কি? সকলেই বুঝিলেন, হাকিমান বুঝিলেন, বঙ্গাধীপও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন যে যথার্থই নীলকবগণ অত্যাচারী। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত উতলা, এত উত্তেজিত, এত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ মিষ্টি কথায় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করা কর্তব্য।

বঙ্গাধীপের আদেশে আমাদের পূর্ব পরিচিত পারিষদমহোদয় উচ্চস্বরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন—

“প্রজাগণ! তোমরা স্থির হও, এত উতলা হইও না। স্থির হইয়া শুন! গোল করিলে তোমাদের কার্যোই বিঘ্ন ঘটবে। স্থির হইয়া কথা শুন।”

প্রজাগণ। তোমরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা। তোমাদের প্রতি সবলেরা কোনপ্রকার অত্যাচার না করে, চোরডাকাতে তোমাদের টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া না লয়। জমিদার, নীলকর তোমাদিগকে অত্যাচারে কোনপ্রকারে কষ্ট না দেয়, জোর জবরাণ না করিতে পারে তাহার জন্তই অর্থাৎ তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্তই স্থানে স্থানে থানা, মহকুমা, জিলা বসান হইয়াছে। তোমরা সর্বপ্রকারে সুখে থাক ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। নীলকবের অত্যাচারে তোমরা যে কষ্টে আছ তাহা বেশ বোকা গিয়াছে।

প্রজাগণ মধ্য হইতে একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল—“দোহাই ধর্মাবতার! আমরা একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের জাত, কুল, মান, প্রাণ সকলি গিয়াছে। পেটে ভাত নাই। তাহার উপর আমীন, খানাসীর বেতের ঘা, কপালগুণে কোন কোন দিন শামচাঁদের সঙ্গেও আলাপ। দেখুন! পেটের, পিঠের অবস্থা দেখুন! আর কি বলব।”

পারিষদমহোদয় বলিলেন—আর দেখাইতে হইবে না। তোমাদের দুর্দশার বিষয় সকলেই ভালমত বুঝিয়াছেন। শুন—স্থির হইয়া কথা শুন। যাতে তোমাদের ভাল হইবে, তোমরা সুখে থাকিবে তাহাই শুন।

তোমরা জমিদারকে দস্তুরমত জমির খাজানা বিনাওজরে দিবে। নীলকর

কি জমিদার তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে প্রথম খানায় জানাইবে। পরে তাহারা যাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ মাজিষ্টারসাহেবের নিকট জানাইতে বলিলে তাঁহার নিকট জানাইবে। তিনি তোমাদের নালিশ শুনিবেন—তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা যাহাতে স্থখে থাক তাহার উপায় করিবেন। তোমরা ইচ্ছাপূর্বক যদি নীলের আবাদ না কর তবে তোমাদিগকে জোর করিয়া কেহই নীল বুনিয় করাইতে পারিবে না। যে জোর জবরাণ করিবে সেই শাস্তি পাইবে। বড়, ছোট, গরিব, ধনী, কৃষিপ্ৰজা, জমিদার কি নীলকর বলিয়া বিচারে কোন তব বিশেষ নাই। বিচারাদালতে সকলেই সমান। এমন বিচারে আর তোমাদের ভয়েব কাবণ কি? মন্দ কাজ করিলে তোমরাও যেমন শাস্তি পাইবে, নীলকর সাহেবও তেমনি শাস্তি পাইবেন। যে অপরাধে তোমরা ফাটক খাটিবে, সেই অপরাধে নীলকর সাহেবও জেলে যাইবেন। বিচারাদালতে কোন প্রভেদ নাই। কোনরূপ খাতির নাই। কাহারও ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজই করাইতে পাবে না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা নীল-বুনিয় তাহার মজুরী লও। ইচ্ছা না হয় নীল-বুনিও না, মজুরী পাইবে না।

শতমুখে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমরা মজুরি চাই না। ভিক্ষা কবিয়া খাইব তবু নীলের বীজ আব হাতে করিব না। মজুরী আমাদের মাথায়। আমরা কিছুতেই আব নীল বুনিব না।

পারিষদ সাহেব : “শুন! আবও শুন” সে তোমাদের ইচ্ছা। অনিচ্ছায় তোমাদিগের দ্বারা কেহই কিছু করাইতে পারিবে না। আর তোমাদের এই সকল দরখাস্তের বিচার কলিকাতায় গিয়া হইবে। তোমরা ইহার খবর সত্বরেই জিলার হাকিমান সাহেবগণের মুখে শুনিতে পাইবে। আর তোমাদিগকে আভাষ বলিতেছি, শালঘর মধুয়ার কুঠির নিকটে শীঘ্রই এক নূতন মহকুমা খোলা হইবে। পদ্মাপারের প্রজাকে পদ্মাপাব হইয়া আর পাবনায় আসিতে হইবে না।

প্রজাগণ অন্তরেব অন্তঃস্থান হইতে মহারাণীর জয়! জয় মা ভারতেশ্বরী জয়! ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই হাত তুলিয়া লাট-বাহাদুরকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এত দুঃখের পর, এত যন্ত্রনা এত ক্লেশের পর প্রধান রাজপুরুষের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে-বিহ্বল প্রায় হইল। দারোগা, জমিদার, প্রহরী, সাদী কেহই আর সে গোলযোগ নিবারণ

করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ জয় ঘোষণা, পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ—
 হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আশীর্বাদ। অতি কম হইলেও কুড়ি হাজার কণ্ঠ
 হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—সেপাই, সান্ধী, গ্রহরী,
 দারোগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জ্ঞাত চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না।
 জবরানে কেহ নীল-বুনানি করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার
 আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না। দুহাত তুলিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে আশীর্বাদ
 করিতে লাগিল। সে জয়ঘোষণা—সে আশীর্বাদে বাধা দেয় কার সাধ্য! ঘোর
 উন্মত্ত। কে কাহার কথা শুনে, কে আজ কাহাকে মান্য করে! কাব কথায়, কার
 নিবারণে সে মত্ততা হইতে ক্ষান্ত হয়? মনে অণু কোন কথা নাই, ভবিষ্যত ভাব-
 নার দিকে কাহারও মন নাই, গ্রামে ফিরিয়া গেলে নীলকরের হাতে জাতি, মান,
 প্রাণ বজায় থাকিবে কিনা? যেটুকু আছে—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা থাকিবে
 কিনা? বাড়ি গিয়া স্ত্রী-পরিবাব, সম্মানসম্মতি, ভাই, বন্ধু, পরিজনদের মুখ দেখিতে
 পাইবে কিনা? আজিকার এ ঘটনাব পরিণাম ফল কি? ইহার সীমা কোথায়?
 সে সকল কথার দিকে কাহারও মন নাই। জয়রবে উন্মত্ত। আশীর্বাদ করিতে
 করিতে কণ্ঠ শুষ্ক। স্থানীয় হাকিমান, শাস্তিবক্ষক মহোদয়গণ, এই উত্তপ্ত স্বর্ণ-
 মাখা, রাজবচনাবলী তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে কি-না? তাঁহারা
 রক্ষা করিবেন কি-না? রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? নিরীহ প্রজার প্রাণ,
 নীলকর ব্রাহ্মণের বিষময় বিশালদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? অসীম
 সুখসাগরে ভাসিয়া আবার বিবাদতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া একেবারে ডুবিতে হইবে
 কি-না? ক্রমে নবজীবন স্থায়িত্ব হইবে কি-না? হইবার আশা আছে কি-না? সে
 বিষয় কাহারও মনে নাই। আনন্দে বিস্তার, জয়রবে বিহ্বল, জয়রবে মত্ত, ক্লার
 কথা কে শুনে? সুত্তরাং সভা ভঙ্গ—বঙ্গেশ্বর পার্শ্বদসহ সোনামুখীতে উঠিলেন।
 স্থানীয় জমিদার, নীলকর, মহাজন, সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আহ্বান হইল। ক্রমে
 সকলেই সোনামুখীতে যাইয়া লাটবাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া সেলাম
 বাক্সাইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

চলুন আমরা প্রজাগণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাপার হই। আর তাহারাজ আজ যে
 মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া চলিল; চলুন! তাহাদের মনের ভাবটা ভাল করিয়া

শুনিয়া নই। বড়কঠিন স্থানে আসা হইয়াছে। মানবজীবনে—নবজীবন। বড়ই কঠিন ব্যাপার। কি যে ঘটবে, প্রজার ভাগ্যে কি ঘটবে, তাহা সেই অন্তঃকামী গগনবানই জানেন।

বঙ্গেশ্বর অল্পই পাবনা ছাড়িবেন। পাবনার বর্তমান-শ্রী সোনামুখীর ধূম উদগীরণ সহিত একেবারে বিলী হইয়া যাইবে। আর কেন? আগমনে যোগ আনন্দকর—বিদায়ে যোগ বড়ই দুঃখকর—চলুন! আর এখানে থাকা নয়।

পঞ্চত্রিংশ তবঙ্গ

মানবের কথা

পাঠক! আমিও বলিতেছি মনের কথা—আপনারাও শুনিতেছেন উদাসীন পথিকের মনের কথা। এখন প্রাণ ভবিয়া একবার প্রজার কথা শুনুন। একয়েকদিন তাহারা কি বুঝিল, কি পাইল, ঐ শুনুন অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। অধমও সঙ্গেই আছে।

প্রথম প্রজা : ভালই হল! পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পেলুম। বাঁচা গেল। কুঠির নিকটেই মহকুমা হবে। হাকিম থাকবে। যখন যাহা হবে তখনি হাকিমকে জানাইতে পারিব। প্রাণটি হাতে করে পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে তো বাঁচা যাবে।

দ্বিতীয় প্রজা : হলে তো ভালই হয়! ভায়া! না হলে আর বিশ্বাস নাই।

প্রথম : ভায়া! তা কি আর না হয়ে যায়? একি তোমার আমার কথা না—বড়লোকের কথা? ভায়া! এ সাহেব-স্ববোর কথা। এ-কথার মার নাই।

দ্বিতীয় : তাতো বটে। তোমার আমার কথাটা যেন ভাল করে না বুঝেই বল্লেন যে বুঝেছি। আর ভায়া! কষ্টের জীবনে, অনাটনের সংসারে, স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ কত্বাদ্বায়ে এবং অম্লচিন্তায় আমাদের কথা ঠিক থাকে না। থাকিতে পারে না, আমরাও কথা ঠিক রাখিতে পারি না—তা ঠিক। কিন্তু বড়লোকের কথাটা কি রকম?

প্রথম : ভায়া! হে! রকম আর কিছু নয়। বড়লোকের সকলই বড়, দান বড়, রূপণতা বড়, মান বড়, অপমান বড়, গলাও বড়, কথাও বড়। যেখানে বড় কথা, সেইখানেই গোলার কথা। ওকথাও বড়লোকেরই কথা। কিন্তু সে মুখ

ভিন্ন—সে কথাও ভিন্ন। সে কথার মূল্য অনেক। ভায়া! ঈংরেজের যে কথা সেই কাজ।

দ্বিতীয় : আচ্ছা! আর একটা কথা। আমরা এতদিন না বুঝে কত বোঝাই যে মাথাষ বয়েছি, কত ভূতেরই যে বেগাব খেটেছি, কতজনেরই যে বিনামা সোজা করেছি। না বুঝে কাব না পায় ধরেছি। কত কষ্টই ভোগ করেছি। তার আব ইতি নাই।

প্রথম : ভায়া! যা হবার হয়েছে। এখন দেখে শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, এটুকু যেন শক্ত হয়েছে। আর এ-কয়েকদিনে দেখলেম অনেক গুনলেমও অনেক। ধাঁধা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া! বাজার ভাবই ভিন্ন। দেখলে না লাটসাহেবের কাছে জজ, মাজিস্টার যেন কিছুই নহে। চুপ চাপ কথাটি মুখে নাই। মাছটি পর্যন্ত নড়ে না। সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে, ভয়ে ভয়ে তাকায, ভয়ে ভয়ে কথা কয়। নীলকর সাহেবরা কে কোথায় পড়ে রইল, ভায়া! দেখেছ তো? লাটসাহেব তাহাদিগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলে না। খাতির তওয়াজার নামও করলে না। যেমন আমরা তেমন তাহারা। মফস্বলে দারোগা, জমাদারদের লাফানি ঝাপানি দেখে কে? বাপবে। বরকন্দাজের তেড়িমেরী কথাই বা কত! আজ কেমন ছরস্তু? লাটসাহেবের কাছে কেমন সোজা যোড়হাত—এক হাত দু-হাত নয়, ভায়া! একেবারে পঞ্চাশ হাত তফাৎ! খাড়া পাহারা। বাপবে বাপ! বড় বড় হাকিম, বড় বড় জ্যাস্ত-দায। আজ লাটের সম্মুখে যেন বিডাল। চুঁ শব্দটি মুখে নাই।

দ্বিতীয় : ভায়া! সত্যি সত্যি কি আর নীল হবে না?

প্রথম : ভায়া! শুনলে কি নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনি তবে হবে। নীলকর সাহেবরা জবরান করে আর বুনিতে পারিবেন না। আমাদের ধানের জমিতে আর জবরানে মার্ক। দিয়া নীলজমির সামিল করিতে পারিবে না। যে জবরাণ করতে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সে কি যে সে মুখের কথা নিশ্চয় যেন, যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

দ্বিতীয় : জেলে তো যাবে। ধরে নিয়ে গিয়ে যদি আগেই কাজ ঠাণ্ডা করে দিলে তখন জেলে গেলেই কি, আর ফাঁসিতে ঝুলালেই আমাদের লাভ কি? আমরা তো সারা হলেম!

প্রথম : নাহে—না ! ঈশ্বর আছেন । আর সারা হতে হবে না । আমরা তো আর স্ব-ইচ্ছায় নীল বুনিব না । আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরানে নীল-বোনে । সকলে একজোটে থাকলে আর ভয় কি ভায়া ? যে ব্যাটা আমাদের জমিতে নীল-বুনতে কি চাষ দিতে আসবে ; সে বেটার মাথা আগে ভাঙ্গবো । প্রাণ দিব তবু নীল-বুনিব না । নীল-বুনিতে জমিও দিব না । চল ! শীঘ্র শীঘ্র চল ! পদ্মা পাড়ি দিয়া ওপারে যেতে পারলে বাঁচি । লাটসাহেবের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক । আব যেন আমাদের পদ্মা পারে না আসিতে হয় ।

নানপথে, নানাকথা তুলিয়া প্রজাগণ হাসিখুশীতে যাইতেছে । কেহ নীল-করেব পিতৃমাতৃ শ্রদ্ধ করিতেছে । কেহ মাজায় কাপড় বান্দিয়া বাহাদুরি জানাইয়া “নীল আর হবে না নীল আর হবে না” এই কথা চিৎকার করিয়া কহিতে কহিতে যাইতেছে । কথায় কথায় লাটসাহেবের খোসনাম গান গাইতেছে । সোনামুখীরই বা কত স্মৃতি কহিতেছে ।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

বৈঠক

প্রজাগণ মনের আনন্দে হাসিখুশী করিতে করিতে গ্রামে আসিল । যাহারা বাড়িতে ছিল তাহারা এই সুখবর শুনিয়া মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার হইল । দুই হাত তুলিয়া লাটবাহাদুরের দীর্ঘজীবন ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল । শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল । মেয়েমহলেও হলস্থল পড়িয়া গেল । উলুউলু ধ্বনিতে গ্রাম, পল্লী, পাড়া জাগিয়া উঠিল । “নীল আর হইবে না” এই কথা শুনিতাই বৃদ্ধা, যুবতী, এমনকি বালিকার প্রাণ পর্য্যন্ত আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলিয়া পড়িল । আমীন, তাগাদগীব, পাইক-প্যাদার ভয়, স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে অনেক তফাৎ হইল । কেনীর নামে প্রাণ কাঁপিত—শবীর রোমাঞ্চিত হইত, আজ যেন আর সেরূপ হইল না । কুটির নামে মুখ, বুক ওকাইয়া হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত, প্রাণ ধরফড় করিত, তাহাও যেন আর হইল না । লাটবাহাদুরের হুকুম, নীল আর হইবে না । মুখে মুখে কথা সংক্ষেপ—ক্রমেই সংক্ষেপ—শেষে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে লাটবাহাদুরের হুকুম, “নীল আর হবে না” ।

নূতন কথা, নূতন ঘটনা, মানুষের মুখে নূতন নূতন খুব চর্চা হয়। বিশেষ মহাস্বার্থের আভাস থাকিলে দিনরাত্রে সহস্রবার মুখে আঙড়াইনেও মনে স্তম্ভ জন্মে না। প্রজামহলে দিব্যরাত্রি ঐ কথা। কুঠির কথা—কেনীর কথা, সর্দার, লাঠিয়ালের কথা, আমীন, তাপাদগীরের কথা,—জুলুম, বন্দিয়তের কথা সর্বদা তোলিশাড় হইতে লাগিল। কিন্তু আগে যেমন নামেই আতঙ্ক নামেই হৃৎকম্প, নামেই অজ্ঞান, তাহা এখন আর এখন নাই। সকলে একজোটে, এক পরামর্শ থাকিলে একা কেনী কি করিবে? নীলকর আমাদের রাজা নহে। তাহারাও প্রজা, আমরাও প্রজা,—রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? এই কথা কয়েকটি প্রজার অন্তরের অন্তঃস্থান প্রবেশ করাতেই ভাবের ভিন্ন, সাহসের সঞ্চার, সুদিনের লক্ষণ—তাহাতেই পথিক বলিতেছে প্রজার নবজীবন লাভ। অথবা চিরবন্দীর—হঠাৎ মুক্তিলাভ।

কয়েকদিন এইরূপ মনের আনন্দেই কাটিয়া গেল। গ্রামের মাখাল মাখাল, পরামাণিক (প্রধান) দুই-চারজন একত্র হইয়া মাঝে মাঝে অতি চুপে চুপে পরামর্শ করে। কি পরামর্শ তাহারাই জানে। একদিন শুনা গেল যে একজন কাড়াদার গ্রামে গ্রামে কাড়া মাণিয়া উচ্চস্ববে বলিষ্ঠা কাইতেছে, ‘ভাই সকল! কাল বেলা দুই প্রহরের সময় সা গোলাম সাহেবের বাটিতে এই অঞ্চলের সমুদায় প্রজার এক বৈঠক হইবে। এইদেশ হইতে যাতে নীল একেবারে উঠিয়া যায় সেইজন্য বৈঠক হইবে। সকলেই বৈঠকে যাইও। দেশের ভালর জন্তই বৈঠক, সকলেরই যাওয়া করকার।’

দশজনে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যে লাভ আছে, তাহা প্রজাগণ তখন বেশ বুঝিয়াছিল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে, ছেলের-বুড়োর, হিন্দু-মুসলমানে একত্রে সা গোলামের বাড়িতে উপস্থিত হইল, দেশহিতকর বৈঠকে যোগ দিল। চারদিক হইতে প্রজাগণ আসিতে আরম্ভ করিল। উপরে আঙ্গিনাঝোড়া সামিয়ানার নিচে নতরনজীর বিছানা। অতিঅল্প সময় মধ্যে বৈঠকপ্রাঙ্গণ পুরিয়া আঙ্গিনার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে সামিয়ানার বাহিরে উলঙ্গ শিরে মনের আনন্দে দাঁড়াইয়া গেল। বধাকালের সেই উজ্জ্বল সূর্য্যতাপ, দ্রক্ষ্য নাই, অনায়াসে সহিয়া বৈঠকে যোগ দিল। এবং মনসংযোগে কথাসকল স্তম্ভিতে লাগিল।

বৈঠকের প্রধানকর্তা দুইটি জমিদার। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। বলা বাহুল্য মুসলমানটি সা গোলাম। হিন্দু জমিদারটির এই সঙ্কল্প পরিচয় যে ভিত্তি

দেশের মধ্যে সর্বসাধারণের নিকট মহামাননীয় । সকলেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে ।

সেই সর্বজনপূজিত মহামহিম মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া মুহূর্ত্তে অতিমিষ্ট-ভাবে বলিতে লাগিলেন :

“সত্য হিন্দু-মুসলমান মহোদয়গণ । নীলকরেব অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি । জমিদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণী, ধর্মযাজক, গুরুদেব, গোসাঁই, পীর, ফকির, এমন কি মুটেমজুর পর্য্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির । তাহা কাহারও অবিদিত নাই । এই উপস্থিত বৈঠকে অল্পমান পাঁচহাজার লোক উপস্থিত আছেন । বোধহয় এই পাঁচহাজার লোকের মনেই কেনীর অত্যাচার-কাহিনী সর্বদা জাগ্রতভাবে, জলন্ত আকারে গাঁথা রহিয়াছে । সেসকল কথা, সেসকল অত্যাচারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন । কে-না ভুগিতেছে, কে-না জলিতেছে, কে-না কেনীর অত্যাচার আগুনে পুড়িতেছে ? এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই । আমাদের মূর্খতাতেই আমরা বুদ্ধিতে পারি নাই যে, আমাদের প্রতিপালক এবং সর্ববক্ষক রাজা নীলকর নহে । নীলকর আমাদের হস্তাকর্ত্তা বিধাতা নহে । ভ্রমেই আমাদের সর্বনাশ ঘটয়াছে । ভ্রমেই আমাদের এতো কষ্ট উপভোগ কবাইয়াছে । পাবনার দরবারে আমরা বেশ বুদ্ধিতে পারিয়াছি যে আমাদের বাজার দয়ার পাব নাই । গুণেব সীমা নাই । নীলকরই হউন, আর বিলাতবাসী অন্য কেহই হউন, অত্যাচারী হইলে, আমাদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার করিলে, রাজহস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই । রাজ-বিচার হইতে কিছুতেই অত্যাচারীর অব্যাহতি নাই । রাজচক্ষে তাহারা এবং আমরা উভয়েই সমান । এই কথার প্রমাণও ঐ দরবারেই পাওয়া গিয়াছে । এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? কেনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ? সে কি সহজে ছাড়িবে ? সে নর-ব্যাঘ্র এতদিন যে বসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, উদর পরিপোষণ করিয়াছে, তাহার স্বাদ কি সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইবে, না ভুলিতে পারিবে ? তাহার অনায়াস লাভের আশা হইতে সে কি সহজেই হস্ত সঙ্কোচিত করিবে, না মন ফিরাইবে ? কখনই নহে । অতি কম হইলেও বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা আয়ের পথ সে কি লুপ্তিা ভিড়িয়া না দেখিয়া অমনি বন্ধ করিবে ? কখনই নহে । পূর্ব হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যিক, পূর্ব হইতেই রক্ষার পথ পরি-

স্বার করিয়া রাখা কর্তব্য। ভাইসকল। মনযোগ করিয়া শুনিতে থাক! লাট-সাহেব বাহাদুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের করা কর্তব্য ও সকলেরই তাহা শিরোধার্য। কেনী জবরান করিয়া নীল-বুনানি করিতে পারিবে না—রাজার আজ্ঞা, কিন্তু ভাবি অত্যাচার নিবারণের কোন নির্দিষ্ট উপায় রাজ-আজ্ঞায় নাই। ঘটনা হইলে, প্রমাণ গ্রহণ—পরে বিচার। আমরা নীল বুনিতে, কি নীলজমির চাষ করিতে, অথবা নীলকরের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিব না। সেও ছাড়িবে না। কেনী যথাসাধ্য বলপ্রকাশে আমাদের নির্যাতন করিয়া তাহার জেদ বজায় রাখিতে, প্রচলিত প্রথা রক্ষা করিতে, নীলের আয় হইতে বঞ্চিত না হইতে, তাহার গোচরনির্মিত শ্রামচাঁদ সকলের মাথার উপর ঘুরাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। জোর-জবরদস্তি, মার-ধর, লুটপাট এখন যাহা আছে, তাহার চেয়ে দশগুণ বেশী করিবে। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মিথ্যা প্রমাণ জোটাইয়া ফাঁটকে আটক করিবার জন্তও বিশেষ যত্ন করিবে। যাতে হয়, যে উপায়ে আমরা তাহার পদানত হই, তাহা কবিত্তে আর এদিক-ওদিক তাকাইবে না। ধস-অধস, গায়-অন্ডায় এ-সকলের প্রতি লক্ষ্য থাকিবার তো কথাই নাই। আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব না। তবে এ অবস্থায় কি কবা কর্তব্য? পশুবাও নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ—রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা নিজেকে নিজে রক্ষা কবা দূরের কথা, একদল, একজাতি, একগ্রাম, একদেশ একত্র হইলেও রক্ষা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব, দেশেব হাকিমের নিকট জানাইব—‘রক্ষা কব’ বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।”

“নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কেনীর দুর্দান্ত প্রবলপ্রতাপ এবং বিষম আক্রমণ হইতে নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কিন্তু সকলে একজোট, একমন, একমত হইয়া থাকিলে বোধহয় কোন কোন বিষয় রক্ষা করিতে পারিব। যাহা না পারিব, পারিলাম না দেখিলাম—নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলাম না, শেষ পক্ষে সর্বরক্ষক হর্তাকর্তা বিচারকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, রাজ-সংশ্রবী যাহাকে যেখানে পাইব, রক্ষা হেতু সবিনয়ে প্রার্থনা করিব।”

“আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—কুড়ি পঁচিশ জন কৃষ্টির সর্দার লাঠিয়াল

গ্রামের কোন প্রজাকে ধরিয়া লইতে আসিল। সে কুড়ি পঁচিশ জন সর্দারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একা একজনের সাধা নহে। আত্মীয়স্বজন, ভাই-বেরাদর কতই আছে যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া সে দুর্বল ডাকাতদিগের হস্ত হইতে বাড়ির কর্তাকে রক্ষা করে। পাড়া প্রতিবেশী, আবশ্যক বোধ করিলে—গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে, কথার কথা—রামনাথ মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু রামনাথ একা কিছুই করিতে পারে না। খুব বিবেচনা কর, দেখ, নীলকব কসাইয়ের হস্ত হইতে বাঙলার গরুগুলা রক্ষা করিতে হইলে একা একজনে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পাবিবে না। তাহাতেই বলিতেছি আমবা নিজেবা নিজেকে রক্ষা করিতে অক্ষম। কাজেই সকলকে, সকলের আপদবিপদে সাহায্য করা কর্তব্য। এক-জনের প্রতি নীলবানবে লজ্জা পোড়াইবাব উপক্রম করিলে—আর কিছু নয় শুধু থুথু দিয়া সে আগুন নিবাইয়া দেওয়া সকলেব উচিত। যে বিপদই কেন হউক না, একের মাথায় ষোল আনা ভর পড়িলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মাজা দমিয়া যাইবে, হয়ত একেবারে মারা হইতে পারে। আব সেই বিপদভার আমরা সকলে যদি তিল তিল করিয়া বাঁটিয়া লই তাহা হইলে কি হয়? তাইসকল! বল দেখি তাহাতে কি আমরা মারা পড়ি? আমাদের কিছুই হয় না। বিপদ বলিয়া একটি কথা ঘূর্ণাক্ষরেও মনে ধাবণা হয় না। শত্রুর মুখেও ছাই পড়ে। কারণ যত বিপদ চাপাইবে ঈশ্বর ইচ্ছায় তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। কোন পরমানুর সঙ্গে মিশিয়া কোথায় সংযোগ হইবে, তাহার সন্ধানই থাকিবে না। পরাস্তই বলক্ষয়। এইরূপ ক্রমে বলক্ষয় হইলে কেনই কয়দিন নীলকার্য্য চালাইবে, কয়দিন শালঘর মধুয়ায় বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে? লজ্জায়, অপমানে, দায়ে শেষে আমাদের সহিত আপস-মীমাংসা করিয়া যাহাতে উভয়কুল রক্ষা পায় তাহার কোন উপায় অবশ্যই করিবে, আমরাও তাহাতে সম্মত হইব। আমি এক্ষণে আমার মনের কথা বলিতেছি যে, ঐ উচ্চ বেদীর উপরে পৃথক পৃথক স্থানে তামা, তুলসী, এবং কোরাণ রাখা হইয়াছে, যাহাতে যাহাব ভক্তি তিনি আপন আপন বিশ্বাস ও ধর্ম্মতঃ ঐ সকল পবিত্র জিনিসকে সরলচিত্তে মহাপবিত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অকপটচিত্তে একথা বলুন যে, আমরা আপদে বিপদে সকলকে সাহায্য করিব। একের বিপদ অণ্ডে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া সাহায্য করিয়া লইব। নিজ বিপদ জ্ঞানে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব। অপারগ হইলে সকলে একত্রে রাজদ্বারে প্রার্থনা করিব।”

মুহুর্ত পরে বৈঠকের প্রায় বার আনা কণ্ঠ হইতে “হরিকোল” “হরিকোল” ধ্বনি উঠিত হইয়া বায়ুবিমান এবং সামান্য আবরণ চন্দ্রাতাপ ভেদ করিয়া অনন্ত ক্ষেত্রে অনন্তনামের সহিত মিশাইয়া গেল। মিশাইতে মিশাইতে অবশিষ্ট কণ্ঠ হইতে “আল্লাহ আল্লাহ” রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সে রবের প্রতিধ্বনি সহস্র চপলায় চালিত হইতে হইতে স্থিরবায়ু ভেদ করিয়া—ঈশ্বরের আসন স্থান “তাহ-তাস্ সারা” চিন্তার অগম্যস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ঈশ্বরে সাক্ষি করিয়া, পবিত্র জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া মনের বেগে অনেকেই স্পষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল। সকলের মনেই নতুনভাব, এ যে কি ভাব তাহা সেই অনন্ত ভাবময়-ভূত-তাবন ভিন্ন মহাতাবুক ও ভবভাবনা সংযুক্ত সহস্র সহস্র মহানুভবেরও বুঝিবার সাধ্য হইল না। সকলে পরস্পর বুক বুক মিশাইয়া আলিঙ্গন আরম্ভ করিল। সে পবিত্র ভাবময় আলিঙ্গন, ভাবের মনমত তুলি ধরিয়া যথা যথা আকিয়া দেখাইতে পশ্চিক অক্ষম। তবে সে সময়ের হাবভাবে যে ভাবটুকু সামান্যভাবে অল্পভব হইয়াছে, আকারে, ইচ্ছিতে, আভাষে, আলিঙ্গনের ভাবাভাবে বোঝা গেল যে সকলেই সকলকে কি যেন দিল। সকলেই যেন তাহা মনের আনন্দে গ্রহণ করিল। অথচ কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইল না। দাতা গ্রহীতায় সমান আনন্দ, সমান ভাব, সমান প্রণয়। প্রতিদানের যথার্থ প্রমাণই মন খুলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন। বুক বুক মিশাইয়া পরস্পরের মিলন। সে অপূর্ব পবিত্র ভাব চন্দ্রা-তপতলে কতক্ষণ বিরাজ করিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত, দগ্ধিভূত হৃদয় শীতল কবিত্তে চন্দ্রাতপ বাহিরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে সা গোলাম ধীর এবং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রতি গ্রামেই এই বৈঠকের একটি শাখা বৈঠক হউক। শাখাবৈঠকে গ্রামের হিত-অহিত, ভাল-মন্দ বিষয় প্রতি সন্ধ্যায় আলোচিত হউক। কোন কথার মীমাংসা আবশ্যক হইলে সেই স্থানেই উপস্থিত বৈঠকে মীমাংসা হউক। এক বৈঠকে না মিটে পরদিন বৈঠকে আবার সে বিষয়ে আলোচনা হউক। তাহাতেও যদি মীমাংসা না হয়, সন্দেহ থাকে, আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সময় গ্রামে গ্রামে বৈঠকের প্রধানের মধ্যে যিনি আসিয়া যোগ দেবেন, শাখা বৈঠকে মীমাংসা না হওয়া প্রস্তাব সদরবৈঠকে তিনিই মীমাংসার জন্ত প্রস্তাব করিবেন। সকলের বিবেচনায় যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই বলবত থাকিবে।

কেনার টাকা কম নাই। দশ বৎসর প্রজার সহিত লাড়িলেও সে পিছু

পাও হইবে না। টাকাই অভাবে বিবাদের ক্ষান্ত হইবে না। নৌজের কারবার সহজে ছাড়িয়া দিবে না। আমাদের দশজনের কাজ—সে দশজনও দল জায়গায়। সময় আসন্ন টাকার দরকার হইবে। উপস্থিত সময়ে দশজনকে এক করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে করিতে তদরিব বিলম্বহেতু কার্যে বহু বিঘ্ন যে না হইতে পারে এমন কথা নহে। টাকার অনাটনে ভাল কার্য না হয়, তাহাও নহে। বাঘের সঙ্গে ছাগলের বিবাদ। নানা প্রকার বলের আবশ্যক। রক্ষা পাওয়াই কঠিন! তাহাতে টাকা অভাবে মায়া গেলে বড়ই বিষম কথা। তাহাতেই আমি বলি—গ্রামে গ্রামে যে শাখাবৈঠক হইবে, সেই বৈঠকের প্রতি টাকা সংগ্রহ করার ভাব দেওয়া আবশ্যক। সপ্তাহ অন্তে তহবিলের অধিক পরিমাণ টাকা সদরবৈঠকের তহবিলে দাখিল করিতে হইবে। ধানায়, মহকুমায়, জিলায় আমাদের পক্ষের ভাল লোক, বিশেষ জিলায়, মহকুমায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান উকিল-মোক্তার রাখিতে হইবে। কেনী সহজে কখনই ছাড়িবে না। নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়ত মকদ্দমা সাজাইয়া আগাদিগকে কাটকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল লোক না রাখিলে, ভাল বুদ্ধি, ভাল পবামর্শ, ভাল উপদেশ না পাইলে রক্ষা পাওয়া তার হইবে।

আপন আপন গ্রামে আপন আপন বাড়ি, আপন আপন পরিবার রক্ষা করিতে সর্বদা সকলে প্রস্তুত থাকিবে। কোন সময়, কোন পথে, কোন স্থযোগে কেনী কাহার কপালে কি ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশের লোক যাহারা কেনীর পক্ষে থাকিবে, কেনীর সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে অচুনয়-বিনয় যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে শাখাবৈঠকের অধীন এক একটি ডঙ্কা থাকিবে। সকলের মত হইলে ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিতে হইলে ডঙ্কাধ্বনি করিতে হইবে। যিনি যে অবস্থায় থাকিবেন, তাহাকে সেই অবস্থায় ডঙ্কাধ্বনি-স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে।

যে উপায়ে হউক, শত্রুকে জয় করাই আমার মত। যাহাতে শত্রুর ক্ষতি হয় সে পথ অগ্রে অন্বেষণ করাই আমার ইচ্ছা। তাহাতেই বলিতেছি, কেনীর নিজ আবাদে কি প্রজার আবাদে যে গ্রামে বস নীল আছে, তাহা সমুদায়

কাটিয়া পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাউক। আমরাই বুনিয়াছি, আমরাই কাটিব, আমরাই জলে ভাসাইব। এতদিন আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়াছি। কেনীর চক্ষের জল পড়িবে কি না জানি না। পাকা-নীল জলে ভাসাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা গাত্রে জ্বালাটুকু একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রায় দশহাজার মুখে উচ্চারিত হইল, “ভাল কথা বেশ বলিয়াছেন, গায়ে জ্বালা একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রজাগণ তখনি উঠিল। ছাতি, লাঠি, গামছা লইয়া একে বলিতে দশজনে খাড়া হইল। দলে দলে সভাস্থল হইতে বাহির হইতে লাগিল—সভা ভঙ্গ হইল।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

বিপরীত যুদ্ধ

মরণকালে বিপরীত যুদ্ধ। কেনীর স্বথস্বার্থ অবসান হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তাব সৌভাগ্য-শশীল চতুর্দশীভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিপদে, কৃষ্ণপক্ষেব প্রতিপদের ভোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিপরীত বুদ্ধিতে বিপরীত বুঝিয়া মহা-বিপদে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সায়ংকাল। কুঠিব সম্মুখস্থ কালীগঙ্গা তীব্রত ফুলবাগান মধ্যে কেনী, গঙ্গা সম্মুখে করিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। হরনাথ, শঙ্কু এবং অণ্ড অণ্ড প্রধান আমলা, নীলকুঠির প্রধান প্রধান দেওয়ান, প্রধান প্রধান আমীন, প্রধান প্রধান খালাসী, তাগাদগীব সকলেই উপস্থিত। এখন কি হইবে? কি উপায়ে নীলকার্য চলিবে, কুঠি চলিবে—কি শুধু জমিদারিই চলিবে, তাহারই যত্ন। পাবনাব ঘটনা, জোট তাহার পব সাঁওতার বৈঠক। সকল সময়েই তাঁহারা সাবধান থাকিয়া সন্ধান লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বোধহয় কিছু বাড়া-ইয়াই মনিবসাহেবেব নিকট দেশের অবস্থা, প্রজাব ভাব জানাইয়াছেন। পাবনা গমনে প্রজাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যাহা ঘটয়াছিল, কার্যাকারকগণ তাহার অনেকংশ গোপন করিলেও কেনীর কানে সম্পূর্ণ যাইতে বাকি ছিল না। গুপ্ত সন্ধানীরা সমুদায় কথা গোপনে কেনীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

কেনী বলিতে লাগিলেন—প্রজা ইচ্ছা করিয়া নীল-বুনানি না করিলে জব-রানে বুনাইতে পারিবে না। এ কথায় আর নূতন কি আছে। কোন নীল-কর প্রজার দ্বারা নীল-বুনানি করে! দাদন লইয়া চুক্তিপত্র দিয়া প্রজা নীল-বুনিতে

বাধা, নীলকরও আপন মাল বুঝিয়া লইতে বাধা। এই কথা লইয়া প্রথমতঃ কিছু গোলযোগ হইবে বুঝিতেছি। বিচার আদালতে যখন আমরা প্রজাদত্ত-চুক্তিপত্র দাখিল করিব, তখন আর ওকথা থাকিবে না। তোমরা আগেই সাবধান হইবে। যখন সে চুক্তিপত্রের দরকার হয়, তাহা যেন পাওয়া যায়। তবে প্রজারা যে জোট-বদ্ধ হইয়াছে। আমি বাঙ্গালাদেশে অনেক দিন কাটাইলাম, বাঙ্গালার খবর জানিতে আমার বাকি নাই। তোমাদের কথা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা, তোমাদের দশ জনের এক হওয়া আমি সকলি জানি। আপন দেশের প্রতি তোমাদের যত মায়া, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সকলে এক পরামর্শ, এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করার ক্ষমতা তোমাদের যত আছে তাহা কেনীর জানিতে বাকি নাই। দিন দুই হৈ হৈ! তাহাব পর যে সেই। হয়ত দুহাত নীচেই নামিতে হইবে। ও সকল জোট ও সকল বৈঠক অনেক দেখিয়াছি—আমার কিছুই হইবে না। তাহাদের কিছু না হইলেও মাঝখানে কতকগুলি লোকের এই স্মরণে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। তোমরা দেখ। ঐ সকল টাকাকড়ি লইয়াই উহাদের আপসে আপসে ঝগড়া, মারামারি নিশ্চয়ই হইবে। শেষ ফল আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। গায়ে পড়িয়া এক দল আমার আশ্রয় লইবে। দাদনব টাকা না লইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিবে।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমরা নিজেরা নিজকে যতদিন বিশ্বাস না করিবে ততদিন তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না। তোমরা কার্য্যের শেষ চিন্তা করিতে অবসর পাও না। পরিণাম ফলের দিকে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই নাবালক! সকল কাজেই বাস্তবতা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধবিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লক্ষ্যেবাস্থ্যে খুব মজবুত। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া নীল উঠাইয়া দেয়, আমার দুঃখ নাই। এদেশে ইংরেজদিগেরই যে নীলকুঠি আছে, দেশীয় লোকের নাই ইহাও নহে! আমার নীল যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে রতন-বাবুর কুঠিও মারা যাইবে। ঠাকুরবাবুর কুঠিই কি থাকিবে? মৌবমহাম্মদ আলীর কুঠিই কি চলিবে? এই প্রকার যত বাঙালী জমিদারের কুঠি, যেখানে যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। আমার জমিদারি কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ও সকল কথা কিছুই নহে। তোমরা সাবেক-বদন্তর কার্য্য চালাইতে থাক। এবারে

যে পরিমাণ নীলের এটিমিট পাইয়াছি তাহাতে গত সন অপেক্ষা তিনগুণ পরিমাণ বেশী নীল এই কুঠিতেই পাওয়া যাইবে। অল্প অল্প কুঠির খবর এ-পর্যন্ত পাই নাই। এবারে বেশী পরিমাণ জমিতে নীল-বুনানি করা আমার ইচ্ছা।

কোন আমলা কেনীর কথার প্রতিবাদে কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না।

হরনাথ মুহু মুহু স্বরে বলিতে লাগিল হুজুর! প্রজায় যদি আমাদের নীল-জমি আবাদ না করে তাহা হইলে নিজে-আবাদে কুঠির নির্দিষ্ট জমি আবাদ কবাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

কেনী রক্তাখি তিনবার হরনাথের দিকে ঘুবাইয়া বলিতে লাগিলেন—
কোন প্রজায় নীল বুনবে না? নীল না বুনিয়া আমার এলাকায় বাস করিবে?
একটু সামলাইয়া কেনী মনে মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ রাগ—একটু সামলাইয়া বলিলেন—

“আজ্ঞা—প্রজারা আমার নীল বুনবে না, আমিও তাহাদের সাহায্য লইব না। অথচ নীলের আবাদ বেশী করিয়া কবিব। আমার দেশ, তোমাব মত নয়। এক প্রকার মূর্খের দেশ নয়। বিনা গরুতে আমাব দেশে জমি আবাদ হয়। তুমি দেখ আমি বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিয়া জমি আবাদ কবিব। আর কি চাও।”

হরনাথ মুহু মুহু হাসিয়া নতশিরে বলিলেন “তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা কি।”

কেনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন চিন্তার মধ্যে একটি কথাই বেশী চিন্তার—আমি দেখিতেছি সেইটিই শক্ত কথা—কুঠির নিকট মহকুমা হওয়া না হওয়ার পক্ষে যতদূর পারি চেষ্টা করিব। পারিব এমন ভরসা নাই। এই বলিয়া ক্রমে নদীতীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমলাগণও মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুহুমুদ গতিতে কালীগঙ্গার দিকে চলিলেন। জলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল—গঙ্গাপ্রান্তে ভাসিয়া যাইতেছে। কেনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—নিরব! স্থির দৃষ্টিতে চক্ষু জলপ্রান্তে—আমলাগণ মহাব্যস্ত। ব্যস্ততার সহিত কথা, কি সর্কনাশ! একি কাণ্ড! এত নীল কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল? কে ডাঙ্গাইল? এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণনা করিয়া গেবে আর গণনায় ফলাইল না। নদীর জল ঢাকিল খণ্ড খণ্ড নীলক্ষেত

সকল যেন জলে ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কতক্ষণ হইতে ভাসিয়া যাইতেছে? কে জানে গৌরাঙ্গলে ভাসিতেছে কি না? পদ্মার খরতর স্রোতে পদ্মার প্রশস্ত চব্বের অপরিপাক নীল, পৰ্ব্বতাকাশে ভাসিয়া যাইতেছে কি না তাহা কে জানে? কুঠিময় সোঁর পড়িয়া গেল যে, নীল ভাসিয়া যাইতেছে। কতলোক বড় বড় বাঁশ, বড় বড় লগি হাতে করিয়া বিনা উদ্দেশ্যে নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশ ফেলিল, লগি জলে ভাসাইল, ভাসমান নীল বোঝা আটকাইবার জ্ঞান নানা প্রকার চেষ্টা করিল, একটিও আটকাইতে পারিল না। কেন আটকায়? দুই এক বোঝা আটকাইলে কি হইবে? আর সমুদায় আটকাইয়া কি বা হইবে? ইহাতে কোন রূপ সাব অংশ নাই, সমুদায় জলে ধুইয়া গিয়াছে। বিশেষ এত নীল একদিনে জাঁতদিয়া মাল বাহিব করিবার সাধ্যও কাহার নাই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি নৌকা দেখা দিল। স্রোতগতিতে নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। ডিহিব আমীন, তাগাদগীর, সাহেবের চাকরগণ চিংকার করিয়া বলিতেছে—ভজুব! সৰ্বনাশ হইয়াছে। পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিননদী হইয়া এই প্রকার নীল ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজাগণ রাতারাতি নীল কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। যাহা বাকি আছে, তাহাও আজ রাত্রে আর রাখিবে না আমাদিগকে শাসাইয়া, ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, “কুঠিতে খবর দিতে যাইতেছ ফিরিয়া আসিয়া আর বাড়ি, ঘর, দোর, পরিবারের মুখ দেখিতে হইবে না। যাও জন্মের মত নীলের পাছে পাছে ভাসিয়া যাও।”

কেনী স্বচক্ষে নীলের এই দুঃবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রকাশে বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই। দশ বছর নীল না হইলে কি কেনী মারা যাইবে আর এই সকল নীল, যাহারা কাটিয়া গাঙ্গে ভাসাইয়াছে তাহারা কি অমনি কাটিয়া যাইবে? এখনই রওয়ানা হও। এক এক দলে পঞ্চাশ বাট জন লাঠিয়াল সর্দার লইয়া রওয়ানা হও। যে গ্রামে নীল আছে সে গ্রামের লোককে কিছু বলিও না। যে গ্রামে দেখিবে নীল নাই, সে গ্রাম আর রাখিবে না। বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া ঐ প্রকার জলে ভাসাইবে। আমি কাল এই সময় ঐ সকল প্রজার ভাঙ্গাঘর, কাটাগাছ, গরুবাছুর, এই জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে চাই। বত টাকা লাগে ব্যয় কর। লাঠিয়াল, সর্দার যে বত সংগ্রহ করিতে পার সংগ্রহ করিয়া আন। আর যাহারা এই সকল কার্যের গোড়া—

তাহাদিগকে ধর, তাহাদিগের বাড়িঘর আগুনে পোড়াও। আর ছেলেমেয়ে-বুড়ো-বুড়ী যাকে পাও ধরিয়া আমার গারদে পোড। পাবনায় মোক্তার নিকট চিঠি লিখিয়া দেও যে, ডিহিরআমীন, তাগাদগীর যাহার দ্বারা স্তবধা হয়, কৌজদারিতে নীলখুনি বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেয়। আসামী কবিত্তে কাহাকেও বাকি রাখিবে না। এদিকে তোমাদেব কার্য তোমরা কবিত্তে থাক। আব যত সম্বরে হয় নীলকাজ আরম্ভ করিয়া দেও। প্রতি কুটিতে ডবল—এনেডবল গুলি, চাকর রাখিয়া নীলকার্য আরম্ভ করিয়া দাও। খুব সাহসে, খুব বলবিক্রমে—নির্ভয়ে কার্য করিত্তে থাক। মীরসাহেবকে আনিবাব জন্ত এখনই লোক পাঠাও। চাবজন দেশওয়ালী যেন সঙ্গে যায়।”

কেনীব হুকুমে আমলাগণ মনে মনে বডই খুসী হইলেন। ডুহাতে পাকা লুটিবেন, লাঠিয়াল সর্দারের বেড়নে, অস্ত্রপ্রকার খৌসখুঁসি, মুসঘাসে খুব এক হাত মারিবেন, সকলের মনেই এই আশা। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। কেনী কিছুক্ষণ নদীতীরে দিবিয়া ঘুরিয়া তাওয়া খাইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যত্রে নিদ্রাদেবী তাহাব প্রতি স্প্রসন্ন হইয়াছিলেন কি না,—তিনিই জানেন

অষ্টত্রিংশ তবঙ্গ

ঘারর কথা

মীরসাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শস্ত্রবেব অতুল ঐশ্বর্যে মহাশ্বখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পব-মায়া ক্ষয় হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরেব অসন্তা দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ সর্বদা হাসিখুসী, বং তামাসা, গানবাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনি রহিয়াছে। মনে কি আছে ঐশ্বর জানেন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্বে ছিল, হাবভাব বোধহয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে, সাধারণ চক্ষে, দশ-বছর পূর্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্বে স্ত্রী, পুত্র বিয়োগেব পবে যে ভাব, জামাই কর্তৃক পৈত্রিকসম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্তমান সুখসময়েও সেই একই ভাব। মীরসাহেবের মনেরভাব সুখেদুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসিরআভা সর্বদা বিরাজ করিত। সাধারণলোক সেকথা লইয়াও কত সময় কত আন্দোলন করিয়াছে।

মীরসাহেব কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুদ্ধিবাব সাধ্য ছিল না। কাবণ গুণে-
দুঃখে সমান ভাব। অন্তবেব অন্তঃস্থানের ভাব অন্তঃসামী ভগবান ভিন্ন অণ্ডের
জানিবার সাধ্য ছিল না। বসন্তদিন সাঁওতা ছাড়িয়া মীরসাহেবেব শস্তবাড়ির
অতি নিকটেই সপরিবারে বাস করিতেছেন। পূর্বমত মীরসাহেবেব অন্তগ্রহ
দৃষ্টিতেই চিবআমোদেব সহিত সংসারযাত্রা নিশ্চিন্তভাবে নির্বাহ করিতেছেন।
খানসামা বিনোদ বিদ্রোণীদলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে।
কিন্তু পূর্বমত আদব, ভালবাসা প্রায় নাই। সা গোলাম এক্ষণ স্বয়ং মালিক।

মীরসাহেবও স্বয়ং মালিক। সুসাঁ জিনাতুল্লাব মৃত্যুর পব সমুদায় সম্পত্তি
দৌলতননেস। ও তাহার মাতায় বন্টিয়াছে বটে, কিন্তু মীরসাহেবই মালিক। মীর-
সাহেবেব হস্তেই সম্পত্তি। নামমাত্র তাহাদেব।

সা গোলাম এবং মীরসাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহি-
নীপাড়া এপাড়া এপাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখাশুনা হয় না। দৈবাহীন দেখা
হইলেও কথাবার্তা হয় না। উভয়ে চাকবে-চাকবে, প্রজাম-প্রজাম, অল্পগত
লোকজনেব সহিত অল্পগত লোকেব প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ, বচসা হইয়া থাকে।
কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোচেব হইয়া দাড়াই। আদালত পর্য্যন্ত থা-
ব হয়। উভয়পক্ষেব লোকেব, হুবিমানা ফটক হইতেছে, যাঁহিতেছে, মিটিতেছে,
আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীরসাহেবেব আশ্রয় গ্রহণ করিলে,
তাহার পরামর্শ মত চলিতে থাকিলে তহিববীত পক্ষ্য বাধা হইয়া সা গোলামের
আশ্রয় লইতেছে। সা গোলামও যত্নপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলাবাহিনা এখন
মীরসাহেব কেনীষ পক্ষে। দেশেব লোকেব বিপক্ষে।

মনেব কথাব মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় একথা এতদিন
চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে, ঘবেব কথা পবেব কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের
ছিল না। এখন বাধা হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনাস্রোতে বাধা দিতে
কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্যেব আদিঅন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন।
কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কে? তাহা নির্ণয় কবা
কঠিন। সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনা
স্রোতঃ অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাওয়া কত জীবন ভাসাইয়া কোথা হইতে
কোথায় লইয়া বাইতেছে। কোন বিবাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও
আশঙ্কা হয়।

মীরসাহেব জ্ঞানবান। পারিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা, শরীরের রক্ত, কাহারও তরল নহে। কেহই পাতলা লোক নহেন! নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পবিপক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটি কাঁচা কার্য হইতেছে যে, তাহার আভাষে ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকেষ্ট সাহস হইতেছে না! সেই বামা-কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুর-ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলতনেনসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্ম্মগত আন্তরিকতা ও আভাষ। দৌলতনেনসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সম্মানসম্পত্তি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ার কথা। স্ত্রীধনে ধনবান, স্ত্রী কল্যাণে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্ত্রীধনে অধিকার। রূপসীব সহ হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামীস্বীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে স্থখী হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা কবিতাও কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। মীরসাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ন কবেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতনেনসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাহার মন, স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অস্ত্র চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্য-কারীরাও জুটিয়া গেল!

দৌলতনেনসা, রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাহার সেই পূর্ব্ণভাব, পূর্ব্ণকথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীরসাহেব দৌলতনেনসার বেক্রপ অকৃত্রিম প্রণয়ভাব বর্তমান তাহা ভঙ্গ করা সাধ্য কি—রূপসীর সাধ্য কি—সে দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু পরিমাণ অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতনেনসাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশাবৃক্ষে সফল ফলিবার কথকিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই! এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক, সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই, তখন ঐ লোভাপথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে আঁটিয়া আসরে নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে, অল্পগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্যে প্রবৃত্ত

হইয়াছে, ইহা মৌবসাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোনদিন কোন কারণে ওকথা ভাবিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। দৌলতনেনসাহেব জানিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামীর পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মৌবসাহেব মনের সঙ্গে ভালবাসিয়া, মনে মনে মহাসোভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম, মানুষের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয়ভাব—বিশুদ্ধ প্রেমভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেবই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে, না হইবে আশ্চর্য্য কি? তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্মভাবে আকুল নহে। মহাপাপে ভীত নহে—ইহকালই সাব। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মবিলেই কুরাইল। হিসাব-নিকাশের ধার কে ধারে। কেই বা অদেখা ঈশ্বাকে ভয় কবে। এই তো রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি।

বসীরুদ্দিন সহচরীর খুব অন্তর্গত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আচ্ছাবহ। অথচ তাহা বা দৌলতনেনসাহেব বেতনভোগী, দৌলতনেনসাহেব অন্তে প্রতিপালিত। বসীরুদ্দিনের অন্তের সংস্থানও দৌলতনেনসাহেব অর্থে—তবে মৌবসাহেবের হস্তে হইতেছে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতনেনসাহেব খাসদাসী, চারজন। তাহার একজনের নাম দুর্গতী, দুর্গতীর মাতার নাম সবজা। দুর্গতী, ভরণ, মুরণ, চম্পা, এই চারজন সর্ব্বদা পবিত্র পরিচ্ছন্নভাবে তাহার সম্মুখে থাকিত। ফায়কর-মাস ইত্যাদি কাষা করিত। দৌলতনেনসাহেব ইহাদিগকে অণু অণু দাসী অপেক্ষা ভালবাসিতেন। বিশ্বাসও করিতেন। ইহা বা চারজন বাড়ীর বাহির হইত না। সবজা বুদ্ধা, বাহিরে বাটির মধ্যে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সমানভাবে যাওয়া আসা করিত। সবজার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সবজার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে গোপনে কথাবার্তাও হইয়া থাকে। এই সবজাই সহচরীর সাহায্যকারিণী! উপস্থিত এই কথা যে—

টি. আই. কেনী. হস্তী পাঠাইয়া মৌবসাহেবকে কুঠিতে লইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ নীল কাটিয়া জলে ভাসাইয়াছে। নীল আর বুনিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সকল উপস্থিত ঘটনার সুপরামর্শ জগুই কেনী মৌবসাহেবকে লইয়া গিয়াছেন। মৌবসাহেব নীলকরের পক্ষ, সা গোলাম প্রজার পক্ষ।

মৌবসাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই আসিবার

কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতরূপে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল—প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীকুদ্দিন নিয়মিত চাকুরী বাজা-ইতে বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিল। মীরসাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কি করা? গানবাজনা কবিত্তে সাহস হইল না। উত্তরে তাসখেলা কবিত্তে বসিলেন। খেলার মধ্যে পান, তামাক, হাসিতামাসা, খোসগল্প চলিতে লাগিল। খেলাটা হইতেছে—বঙ্গমার—দুই জনে খেলা—সেকালে দুইজনে তাসের ঐ খেলাই সর্ব্বত্র চলিত। তিনজন হলে ঐ খেলাই তিনহাতে—চারজন জুটিলে বিবিধবা বেশী সখ হইলে পাঁচইয়াবে গোলামচোর—কিন্তু বিবিধরাটাই সে সময় জাঁকাল খেলা। রগডেবও বটে—তিনজনে অভাবপক্ষে দুইজনে বঙ্গমার—বসীকুদ্দিন হবতনের ঢেঁকা ফেলিয়া বলিলেন—“তোমার চিন্তা কি?”

রূপসী অতি নম্রভাবে হবতনের দুবি ফেলিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—“আমার চিন্তার কথা তুমি কি বুঝিবে, দুবেলা পেটপূজাতো এখানেই হয়। আবশ্যক হইলেই কিছু পাও। কাপড়চোপড়ের ভাবনাও বড় নাই! প্রায়ই ব্যারিংপোষ্টে কাটিয়া যায়। হাত বুলাইয়া যাহা বাহির কর, ঘরেরগিন্নির জ্ঞান যা কেনবার দরকার হয় তাই কেন, আর চাই কি? তোমার মত সুখী কে?”

বসীকুদ্দিন পীট উঠাইয়া হবতনের সাহেব ফেলিয়াই বলিলেন—“আচ্ছা এন্স দেখি!”

রূপসী হাতে হবতনের বিবি ব্যতীত আর হবতন ছিল না। বাধ্য হইয়া বিবিটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—“দেখ দেখি ঘাড়টি ধরিয়া বিবিটি আদায় করিলে, হিসাব থাকিলে এই রূপই হয়। হিসাবমত যদি সাহেব রোখকরে দাঁড়ায়, তবে সাধ্য কি বিবি না পড়িয়া যায়। বেহিসাবী হইলেই বিবি অচোর সহিত বাহির হইয়া যায়। তা গোলামেই কি, বদপাসের ছুরি তিরিই বা কি? সকল কাজেই হিসাব আছে—হিসাবের মার বড় শক্তমার”—

বসীকুদ্দিন তাড়াতাড়ি পীট উঠাইয়া হবতনের গোলাম ফেলিয়া বলিলেন—“এবার কি দেবে দেও দেখি।”

রূপসী গোলামপ্রতি নজর করিয়াই বলিলেন—

“এ গোলাম এখন সাহেবের বাবা—রক্তবক্ষিৎ—করি কি! আর দিবই বা

কি আছেই বা কি? সকলি তোমাদিগকে দিয়াছি। কিন্তু আমিই কিছু পাই নাই।”

“কি পাও মাই—সকলি তো পাইয়াছ আর চাই কি?

আর চাই কি—“তোমার কি চক্ষু নাই? আমার হাত একেবারে খালি। হাতে কি কিছু আছে যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। এবারে পারিব না। ফিরে বাঁটা যাক।”

তাস রাখিয়া দিলেন, হাতের কাগজ পিঠের কাগজ একত্র করিয়া মিশাইয়া দিলেন। খেলাভঙ্গ হইল। অন্য অন্য কথা চলিল।

মারসাহেবেব আজ এত বিলম্ব হইল কেন?

বসীকুদ্দিন বলিলেন—“সাহেবস্ববার স্বা. বড়মান্দার চালচলন স্বতন্ত্র কথা। আমাদের মত উঠ বসেই কাঁধে-বোচকা তাতো নয়? আবার আজকাল প্রজার যে জোট, চাঁদিকে গোলযোগ। সেই সকল কথাতেই বিলম্ব হয়েছে। হয়ত নাও আসিতে পাবেন”।

“না আসিতে পাবেন, না আসিবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। শুধু বসে থাকার তো মহাদার! তুমি একটি গান গাও আমি আস্তে আস্তে সঙ্গত করি।”

“বাবা সে আমার দ্বারা এখন হবে না। মারসাহেব না আসলে বৈঠক-খানায় গানবাজনা করে কার লাভ্য। এতেই সকলে চটা। বাড়িভাঙ্গ লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবিসাহেবের জন্তই রক্ষা। এমন মেয়ে হয় নাই। একালে কেউ এমন দেখে নাই। বাপরে বাপ! তাবই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, তার দেখি সে কেমন মেয়ে”?

“টিক বলেছ! এমন নিরাগী কখনও দেখি নাই। শুনিও নাই। আর স্বামীর প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা যে তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। এমন-তার কখনও দেখি নাই”।

“সে কি আর বলতে! আজ্ঞা তুমি বস, আমি বাড়ি হতে একবার ঘুরে আসি—”

রূপসী আর বাধা দিলেন না। তাহার ইচ্ছা যেন তিনি একা একাই বৈঠক-খানায় থাকেন। বসীকুদ্দিন চলিয়া গেলে, রূপসী তাসগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া গোছাইয়া রাখিলেন। পরিকার বিছানা। সে সময় কেরসিনতৈলের

ব্যবহার, ল্যাম্প ইত্যাদি বিলাতী আলোর চলন, বাঙ্গালীর ঘরে হয় নাই। সেজ, মোমবাতি, বৈঠকী নারিকেলতৈলের বাতিই চলতি। তাহাই বলিতেছে! বড় একটি বালিশ (গেদ্দা) ফরাসের উপর পড়িয়া আছে। রূপসী কতক্ষণ এদিকওদিক চাহিয়া বালিশে ঠেসদিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার শব্দ হইলেনই সেইদিকে লক্ষ্য করেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে থাকেন। ভাবে বোধ হইতেছে যেন কাহার প্রতীক্ষায় আছেন।

কথা মিথ্যা নহে—প্রতীক্ষায় আছেন। ঐ শুধুন মুখে কি বলিতেছেন। কখনকাল গম্ভীর ভাব, মধো মধো চকিত ভাব, কাহারও আগমন প্রতীক্ষা ভাব। কি বলিতেছেন শুধুন।

কৈ এতকথা—এতকিবে—এত মাথাছোঁয়া, কৈ সকলি গিছে? এমন নির্জন, এমন স্বযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আর কি করিব। এমন স্বযোগ সমবেও যখন আসিল না তখন আর কি করিব। সময়, স্বযোগ, অবসর, স্থান এই চারটিই জীবলোকের সর্বনাশের মূল! রক্ষার মূল। এই কথা কহিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পা ছড়াইয়া বালিশে একটু বেশী পরিমাণ ঠেসদিয়া বৈঠক-খানাঘরের, পাশের একটি দ্বারে এক ধ্যান একমনে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরেই তাহার ভাববদল হইল। আন্তরিক চিন্তারভারে মুখে যে মলিনতাটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ সরিয়া গেল। মন সুখী না হইলে চক্ষু হাসিবে কেন? মুখে হাসিরআভা দেখা দিবে কেন? পাংশুবর্ণ মুখে, রক্তেরআভা খেলা করিবে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। বোধ হয় আশাপূর্ণ। বাহার আসিবার কথা—বাহার জ্ঞান এতবাস্ত, এতচিন্তা, বোধহয় তাহারই আগমন? উঠিয়া বসিয়া হাত-তুলিয়া ইঙ্গিতে ডাকিতে লাগিলেন। সে যেন ঘরের মধ্যে আসিতেও নারাজ। তাহাতেই স্বর্ণরজতজড়িত দক্ষিণহস্ত উত্তোলন ও কব-সঞ্চালন—শেষে শয্যা-ত্যাগ। শয্যা ত্যাগ কবিয়া উঠিতেই—উঠিলেন না।

বালিশ ছাড়িয়া একটু আগে সরিয়া বসিলেন। কারণ যে ঘবে আসিতে নারাজ ছিল, সে রাজি হইয়া আসিতেছে। পার্শ্ববর্তীভাবে উপস্থিত। জীবমূর্ত্তি দুই-একপায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি বাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন! ফিরিয়া আসিতেই জীবমূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। জীব-মূর্ত্তিটি বাড়িরলোক, বয়সও বেশী—দৌলতননেনসার পরিচারিকা! দুর্গতীর মাতা,

নাম সবজা। মূল্যী জেনাতুল্লার খরিদা। সবজা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তরঅঞ্চলে দাসী বিকিকিনিতে দোষ ছিল না। বাড়িরদাসী মাঝেই ঐক্লপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তানসন্ততি হইয়াছে—সবজাব পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতনেনসার চাবিজন খাসপবিচারিকাব মধ্যে একজন দুর্গতী।:

সবজার বডই চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস। টাকাপয়সায় তত লোভ নাই। যতলোভ ইলিশমাছে। বাড়ি হইতেও পায়, সময় সময় নিজেও কিনে। আবার মেয়েকে দৌলতনেনসার রান্নাবান্নজনও চুরি করিতে সময় সময় বলে! দুর্গতী কিছুতেই স্বীকার হয় নাই। সেজন্য দুর্গতীর উপর ভারিচটা। সবজাব বয়সী আর চাব পাঁচ জন দাসী ঐ বাড়িতে আছে। তাহাদের পেটের কোনমেয়ে দৌলতনেনসার পবিচারিকাব মধ্যে নাই। সবজার কল্যা দুর্গতীই একজন খাস-বান্দী।—তাহাতে সবজার একটু আদবও আছে। মেয়েমহলে সকলে একটু ভয় করে।

ফবাসেব নিকট আনিয়াই রূপসীবলিলেন, ‘বস, এখানে বস’—

সবজা বলিল “—না, না আমি ওখানে বসিব না। আপনার পায়ে বরি, আমি ওখানে বসিব না।

“তাতে দোষ কি? আনি লো অ’ব তোমার বিবিনয়” যে একবিছানায় বসিলে দোষ আছে। আমি জানি মাতৃময় সকলেই সমান। সকলেই খোদাব তৈয়ারি।”

“তা হোক আপনি বসুন, আমি বসবো না। বেশীদেবীও করিতে পারিব না। সেদিন কিরেকরে মাথায় হাতদিয়ে বলে গিয়েছিলাম, তাহাতেই আসিয়াছি।”

“এসেছ ভালই করেছ। তোমাব কথা তুমি বেখেছ, আমার কথাও আমি রাখি। অঞ্চল হইতে খলিয়া পাঁচটি টাকা আন রূপার একছড়া গোট রূপসী সবজাব হাতে দিবে পুনবায় বলিলেন—আমার কবার আমি পূর্ণ করিলাম, এখন তোমার ধর্ম, রাখা না রাখা তোমাব ইচ্ছা।”

সবজার সঙ্গে আগেই গড়াপেটা পরামর্শ ছিল। সবজা টাকা পাঁচটা ও গলার স্কিজিরছড়া কাপড়ে বাঁধিয়া যাই বলিয়া বিদায় হইতেই, রূপসী সবজার হাত ধরিয়া বলিলেন—“তুমি যাহা যাহা চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তাহা দিয়াছি! আরও বলি—যদি পার, যে কাজের জন্ত দেওয়া, তা যদি করে উঠতে পার, তবে এর উপরে বকশিশ বলে অবশ্যই আরও কিছু আছে। কি কোশলে, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহা তো মনে আছে?”

“তা বেশ মনে আছে। শিকড়িটো একদিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। শুঁতো করতে আর বেশী মেহনত লাগবে না। দেখ ঐ শিকড়েবগুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পাববো না। আব যা দিবেছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাকতে পারবো না”।

“আচ্ছা, শিকড়টিতো শুঁড়ে কবে কোন খান্সামগ্রিব মধ্যে মিশিবে খাওয়াতে পাববে?”

‘হাঁ—তা পাববো। —আব যা বলিলে তা কিস্ত দিবে।’

“কি বলিলাম?”

“ঐ যে, বলিলে আরও কিছু”—

“তোমার মাথায় হাত দিগে বলিতেছি—যেদিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট চলিয়াছে, সেইদিন তোমাকে মনের মত খুসি করবো। বকশিশ তো ধবা রইল।”

“সে তুমি যা দেও—আমি একখানা তাল কাপড় চাই।”

“আচ্ছা—একখানি কেন, একজোড়া দিব।”

কথা হইতেছে, ইহাব মধ্যে বেহারাদিগের চললিবোল রূপসীর কাণে পড়িল। রূপসী তাতাতাড়ি উঠিয়া সবজাকে বলিল যে, “মীরসাহেব আদিতো—ছেন, তুমি যাও।”

সবজা উঠিতে পশিতে সাতপাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সবজার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বারবন্ধ করিয়া করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটি দ্বারে খাড়া হইয়া পালকি দেখিতে লাগিলেন।

বেহারার চলতিবোল বসীরুদ্দিনের কাণেও গিয়াছিল। বৈঠকখানার সম্মুখেই পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর দক্ষিণপারেই বসীরুদ্দিনের খুস্তরালয়। সেইখানেই অবস্থিতি! বসীরুদ্দিন তাতাতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

মীরসাহেবের পালকি রাস্তা ছাড়িয়া প্রবেশ দ্বার হইয়া বৈঠকখানার আঙ্গিনায় আসিল। মীরসাহেব পালকি হইতে নামিয়া বেহারাদিগকে বলিলেন যে, “আবার কাল একপ্রহর পর যাইতে হইবে।”

এই কথা কয়েকটি কহিয়াই বাটির মধ্যে চলিয়া গেলেন। বসীরুদ্দিন

আদাব বাজাটীয়া সম্মুখে খাড়া হইয়াছিলেন, কিন্তু মীৰসাহেবেৰ সহিত এটি কথাও হইল না। বৈঠকখানাৰ দ্বাৰ অক্টোব্ৰাটন ইটীয়া আলোৰ সাহায্যে—বাহা দেখাওঁতেছিল। তাহা মীৰসাহেবেৰ নজৰে না পড়িগাছিল তাহা নহে : কিন্তু তিনি বাট্টিৰ মধ্যোষ্ট চলিগা গেলেন, কিনিগাও তাকাইলেন না। ভাৰে বোধ হইল খুব জকবী কাজ। কাগজপত্ৰও কলকণ্ঠলি হানে—

বসীৰুদ্দিন মাণাবজাদৰ খলিয়া পুনৰায় জুড়াইতে জুড়াইতে বৈঠকখানাঘৰে আসিয়া কপসীকে বলিলেন—“এও মানে তো কিছু বুঝিতে পায়েম না। কাহারও সহিত কোন কথাবাৰ্ত্তা নাও অন্দৰে দাখিল”।

কপসী বলিলেন—‘তাট তো—এও মানে কি?’

“বোধ হয় শবীৰ অস্তথ, না হয় কুঠিৰ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রয়োজন।”

“শবীৰ অস্তথ! একথা ততে পাবে—কুঠি সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িৰ মধ্যো প্রয়োজন কি?”

“আছে—বিষয়াদি-সংক্রান্ত-কথা হলেই বাড়িৰ মধ্যোষ্ট দরকার। টাকাকড়িৰ আবশ্যক হইলেই বাড়িৰ মধ্যো দরকার। তবে আজিকার মত বিদায় হই। কাল শুনিতেই পাবিব। কতকগুলি কাগজ বখন হাতে দেখলেম, কোন লিখাপড়া করাৰ মতলব। ইহা ইহা মনে হয়েছে সাহেব কয়েকখানি গ্রাম ইজারা চাহিয়াছিল—কুঠিৰ নিকটের গ্রাম—বোধ হয় তাহাই হইবে। —তাতেই কি হইবে। —প্রজ্ঞাৰ যে জেট—সাহেবকে আসিতেই দিবে না। বাক সে সকল কথাৰ আমাৰ দরকার কি, চলেম।”

উনজিংশ তরঙ্গ

গোলাযোগ

কয়েকদিন পর্যান্ত কেনীৰ পাকানীল পদ্মা, পৌৰী, কালীগঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিবাৰাত্ৰি স্রোতে ভাসিয়া বাইতেছে। এক শালঘর মধুয়াতেই বে মীলআবাহ, নীলেকাবাবাহ তাহা নহে। বে কুঠিৰ অধীন মত নীল ক্ষেত ছিল, সমুদায় জলে ভাসিয়া বাইতেছে। বাহাৰা প্রজ্ঞা দমনে বাহিৰ হইয়াছিলেন, তাহাৰা গ্রামের ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী হইলেন না। বাহাৰা পাকানীল কাটিয়া জলে ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে ধৰিয়া কুঠিতে আনিবেন, সমুচিত শাস্তি দিবেন, মনিৰেৰ আদেশ মত কাৰ্য্য কৰিবেন আশা কৰিয়াই সেলাম ঠুকিয়া দলবলসহকাৰে

বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই গোলযোগ—কিছুই করিতে পারিলেন না। কুঠিতে যাইয়া সাহেবকে অবস্থা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। কারণ কুঠির দেওয়ান, আমীন, খালাসী, সর্দার, লাঠিয়াল, সকল দেশেরলোক, বাড়ি, ঘর, জমি কারবার সকলি দেশে। আত্মাশ্রয়, কুটুম্ব, সকলি ঐ অঞ্চলে। পুত্র লাঠিয়ালের চাকর, পিতা প্রজার পক্ষে; কনিষ্ঠ কেনী বৈতনভোগী, জ্যেষ্ঠ প্রজার দলে। ইহার পর প্রজার মৌখিক ঘোষণা—এই যে, “বে নীলকরের চাকুরী করিবে, যে ব্যক্তি নীলকরের সাহায্য করবে তাহাব ভালাই নাই।”

স্বার্থেব লোভে, অর্থলোভে যিনি প্রজার বিপক্ষে হস্ত প্রসাবন করিলেন, দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে অগ্নি সোজা হইয়া প্রজার দলে মিশিলেন। সাধা নাই যে নীলকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মানমর্যাদা বজায় রাখিয়া দেশে বাস করেন। যিনি কুঠি হইতে বাহির হইলেন, তাহাব আব প্রবেশের সাধা থাকিল না। সপ্তাহ মধ্যে সর্দার, নেগাহবান, আমীন, খালাসী গোমস্তা, প্রভৃতি কুঠি পবিত্যাগ করিল। নীলকরের সংশ্রব ত্যাগ করিল। দোবে, চোবে, সিং ব্যতীত বাঙ্গালী একটি প্রাণীও প্রকাশ্যভাবে নীলকরের চাকুরী করা দূরে থাকুক—বাধ্য হইয়া বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইল। দেওয়ান, মুজ্জদি বড় বড় আমলা মহাশয়েবা কিছুদিন নিমকের সত্তরক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। বাড়িব সংবাদ বড়ই শোচনীয়। দিনেদুপবে অত্যাচার, লুটপাট, পবিজনের তর্দশাব একশেষ, কারসাধ্য নীলকরের চাকুরী কবে? ক্রমে কুঠিতে লোকশূন্য হইয়া উঠিল। খানসামা বাবুচি পর্য্যন্ত কাষা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কষ্টেব একশেষ। পক্ষকাল অতীত হইতে না হইতে কেনীর সমুদায় জমিদারিতে, অজ্ঞাত কুঠিঘালের জমিদারিতে প্রজাবিরোধের আগুন সতেজে জলিয়া উঠিল। বড়ই গোলযোগ বাড়িল। কেনী তো ছাড়িবাব পাত্র নহেন—সহজে দমিবার লোক নহেন। তিনিও পুরাদমে বুদ্ধিবল, অর্থবল, প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্তানী চাকরের সংখ্যা বিশগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা হইতে খানসামা খিদমতগার, বাবুচি আনাইয়া নূতনভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোকানী, পসাবী একজোট, কুঠিরলোকের নিকট কেহ কোন জিনিস বিক্রি করিবে না। হাটেঘাটে, বাজারে কুঠিরলোক পাইলে বিশ্বস্ত কবিয়া ছাড়িয়া দিতে আবৃত্ত করিল। ক্রমে অশান্তির বাতাস বহিয়া দেশে হলুতুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। একজি মুরগীর জন্ত কেনী

লালাইত। খাণ্ডসামগ্রী জন্ম কেনী লালাইত। খাণ্ডসামগ্রী জন্ম রক্ষনশালা বন্ধ। টাকা থাকিলে কি হইবে? ক্রোডপতি হইলে কি হইবে? লোকের অভাব—খাণ্ডসামগ্রীর অভাব অতদিকে প্রাণের আশঙ্কা। চারিদিকেই শঙ্কা, মুহূর্তে মুহূর্তে অতঙ্ক ও ভয়! মহাবিপদ! যে কুঠিতে দিবারাত্র লোকজনের গতিবিধি, কাজ-কর্মের গোলযোগে সর্বদা গুলজার! সর্বদাই হৈ হৈ ব্যাপার, বৈ বৈ কাণ্ড, আজ সে কুঠিতে জনমানবশূন্য নিস্তর! অলক্ষ্যে বাতাস বহিগা চারিদিকেই যেন হাহাকার! আঙ্গিনা, বাস্তা ঘাট, ঘাসজঙ্গলে একাকার! কেনীর সংবাদ লইতে এক মীরসাহেব ভিন্ন লোক নাই। কিন্তু মীরসাহেবও সর্বদা শলঙ্কিত, সর্বদা ভীত। মাগালাম স্বযোগ পাইয়া আপন অভিষ্ট নানাপ্রকারে সিদ্ধ কবিত্তে মনস্থ করিয়াও, কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেছেন না। অনেকের অভিপ্রায় এই যে, মীরসাহেবকে কৌশলে আপন দলভুক্ত করা। একেবাবে নিমূলকরা কি কোন প্রকারে অত্যাচার করা, ইচ্ছা নহে। প্রকাশ্যভাবে কেনীর সহিত দেখাসাক্ষাত মীরসাহেবের আর সাধ্য নাই। প্রকাশ্য চিঠিপত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী দুই একটি লোককে ফকির সাজাইয়া ঝোলার মধ্যে চিঠি দিয়া নিশীথ সময়ে অতি সাবধানে খবর আনা-নেওয়া করেন। নিজের লোকজন দ্বারা খাণ্ডসামগ্রী ক্রয় করিয়া, অতি গোপনে শালঘর মধ্যায় অপথে পাঠাইয়া দেন। কেনীর খাণ্ডসামগ্রী সমুদায় কলিকাতা হইতে বিশেষ সাবধানে দোবে—চোবেদিগের সাহায্যে আসিতে আরম্ভ হইল। টাকার অসাধ্য কি আছে? অনেক তিন্নদেশীয় লোক ক্রমে কুঠিতে আমদানী হইতে লাগিল। আত্মরক্ষা ভিন্ন অত্ৰ কোন কার্য্যেই কেনী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপাততঃ আত্মরক্ষাই একমাত্র কার্য্য মনে করিয়া তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

মীরসাহেব যে কষ্টে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবারপরিজন প্রতিবিদ্রোহীদল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধান বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষ রূপে হইয়াছে এবং হইতেছে। মীরসাহেবের ধোপা, নাপিত, বেহারা সমুদায় বন্ধ হইয়াছে, চলাচল প্রতিবন্ধক হেতু নৌকাবন্ধ হইয়াছে। অনেক চাকর, চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কঠিন সময়ে দৌলতননেশা হঠাৎ পীড়িতা হইয়াছেন, কোন কথা নাই, বার্তা নাই, অনিয়ম নাই, হঠাৎ একদিন তাহার মুখে হৃদয়বিষাদ বোধ হইয়াছিল, তাহার পরদ্বিগ্ন হইতেই পেটেরপীড়া।

এদিকে কেনী অৰ্প বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়লোকের সাহায্যে আত্মরক্ষায় কৃতকাৰ্য্য হইয়া প্রজাবিদ্ৰোহী বিষয়ে ভারতমধীপ পর্য্যন্ত বোধহয় প্রজাপন করিয়াছেন। শাস্তি বক্ষার জন্য সৈন্তসামন্তসহ শাস্তিবক্ষক কমিশনারবাহাদুর, শালঘর, মধুয়ার কুঠিতে আসিয়া হাউনি করিয়াছেন। বাজার বন্ধ! প্রজারা নীল তো বুনিবেই না। খাজনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কথ্যই আছে যে—“যদি পাগ মংল, তো যায় রাজমংল।” নীলও বুনিবে না—খাজনাও দিবে না। অথচ নীলকরে আক্রমণ, নীলকরপক্ষীয় লোকের প্রতি অত্যাচার! ক্রমেই অশান্তি, ক্রমেই বিদ্ৰোহিতাব বৃদ্ধি! স্বতবাং বাজার শাস্তির আবশ্যক!

কমিশনারবাহাদুর খাজনা আদায় করিবেন। শাস্তিবক্ষ্য করিবেন, এই কথাই রটিয়া গেল। দেশেও শান্তির সুবাতান বহিতে আবশ্য হইল। অত্যাচার-অত্যাচার কমিতে লাগিল। কিন্তু প্রজাবিজ্ঞেয় যেমন হেমনি রহিয়া গেল। কুঠিরনামে আগুন, নীলের নামে মহাআগুন।

কেনীও মাথায় শক্তি ও কমনসে, হৃদয়ের বলও বাঙ্গালীর সমান নহে। সমুদ্রাব এলাকার প্রজা একজোড়। নীলের নাম তো শুনিতেই পাবে না। নেহ খাজনা দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য; তাহাও দেয় না। বলপ্রয়োগে খাজনা আদায়, প্রজা বশ করার ক্ষমতা একেবাবেই বহিত। বাধ্য হইয়া মজুদঅৰ্থে হাত পড়িয়াছে। নূতন নূতন নোক বাধিতে হইয়াছে। পুৰাতন চাকর ক্রমেই দিনেব মধ্যে দুইএকটি কবিতা দেখা দিতেছে। তাহাদের পূৰ্ব্বেই অনেক পবিমাণ কমিয়া গিয়াছে। একগ্রামে ডাক্তারনী হইলে শতশত গ্রামের লোক যে যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থায় একত্র চীৎকার কুঠির পক্ষীয় লোক, যাহা বা কথায় বাধ্য না হইত, জোর জবাবের বাধ্য করিয়া চাকরী ছাড়াইত, কুঠিরে যাওয়া আসা বন্ধ করিত। এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদ্রাব আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর। রাজশক্তিতে অত্যাচার অত্যাচারে বাধ্য। ইচ্ছা অল্পগামী অর্পালোভী দুই একজন ক্রমে পুনরায় কুঠিতে জুটিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন নাই, সে আমল নাই। এখন নিরীহ ভদ্রলোকের প্রতি অত্যাচার, জবাবান করার পক্ষেই আর ক্ষমতা নাই।

কেনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাহায্য লইবেন না। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য করাইবেন না। খাজনা আদায় ও নীলকার্য্যও ক্ষান্ত দিবেন না। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবার জন্য চেষ্টায় আছেন। নীলহউজে নীল-

মাড়াই করার জ্ঞান কলেব জোগাড় কবিত্তে ক্লান্তসংকল্প হইয়াছেন । প্রজাকে ডাকিবেন না, প্রজাব নাম শুনিতে আব ইচ্ছা কবেন না । বাজশক্তি দ্বারা খাজনা আদায় কবিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প ।

শবাসন হইতে শব কুটিয়া গেলে তাহা নিবাবন করা মানুষের দুঃসাধ্য ! ঘটনাস্রোত : একবার গহিয়া গেলে তাহা নিবাবন কবাও মানুষের অসাধ্য । এই সকল ঘটনার মধ্যে বাজান্দ বাজশক্তির বিস্তার কবিলেন । কুটিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইল । কুটিয়াব থানা গোবীন্দদেব উত্তরপার পুরাতন কুটিয়াতে ছিল, তাহা উঠিয়া মহকুমার নিকট আসিল । বেলপুসেব লাইন খলিবাব বন্দোবস্ত হইল । কেন্দ্র প্রজাব নিকট বাকি কব আদায় কবিত্তে তিনজন ডপুটিকালেক্টর নিযুক্ত হইয়া কুটিয়ায় আসিলেন । নূতনভাবে নূতনপ্রকারে নূতনকার্য যেন কুটিয়া অংশে নূতনরূপেই সৃষ্টি হইল ! মহকুমা সৃষ্টির পূর্বে নালখনি এবং বমস্বনাথ মোকদ্দমা দাবনাতে কেন্দ্র পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি প্রজা কাটকে আটক পড়িয়াছিল এবং সা গোলাম প্রভৃতি জোটেদ প্রদানগণের ছয় ছয় মাসের বিনাশ্রমে শাস্তি হইয়াছিল । কিন্তু আপীলে টিকিল না । সকলেই বেকসুর খালাস হইল ।

চতুঃশ তবঙ্গ

হৃদয়ে আঘাত

দৌলতননেশা সেইযে পীড়িত হইয়া শয্যা পড়িয়াছেন, আব আরোপ্য লাভ কবিত্তে পাবেন নাই । দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি । দিন দিন শবাব ক্ষিণ ও বলহীন হইয়া একেবারে শয্যা ধরা হইয়াছেন । নানাস্থান হইতে বৈজয়ন্তের চিকিৎসক আসিয়া কল ঔষধ, কত প্রকরণ, কত কি কবিত্তেছেন কিছুতেই পীড়ার শাস্তি হইতেছে না । তাহার মাতা অন্নজল পবিত্রাণ কবিয়া দিবাবাত্রি কণ্ঠ্য শুশ্রূষা মন দিয়াছেন । অবসরমতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবিত্তেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না । মুসলমানীধর্ম-মতে কত সিন্নি, কত খয়বাত, কত কোরবানী করিত্তেছেন, মানত করিত্তেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না । অনেকেই দৌলতননেশার জীবনে নিরাশ হইয়াছেন । একঘরের এক কণ্ঠা,—এক বংশের একটি মাত্র কণ্ঠা ! দৌলতননেশা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া, বৃদ্ধমাতার হৃদয়ে আঘাত কবিয়া,—স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া জনমের মতন চলিয়া যাইবেন, একথা

তাহার মনে একদিনেব জন্মে ও উঠে নাই। কিন্তু চক্ষের জলে সর্বদাই ভাসিতে-
ছেম। বাড়ির এমন একটি লোক নাই, পাড়ায় এমন একটি প্রাণী নাই, যে
দৌলতনেনেসাব এই হঠাৎ পীড়ায় দুঃখিত হয় নাই। সকলের মনেই এই
এই কথা যে হায়! কি হইল? একটি বংশ একেবারে লোপ হইল! মুন্সী জিন্না-
তুল্লাব ঐ এক কথা। ঐ এক কথাই মাতার সম্বল! হৃদয়েব সার, মহামূল্য রত্ন।
সে রত্ন হারাইলে কি আর কাখেবাখাতুন জীবিত থাকিবে? মীরসাহেব পুরুষ,
কিছুদিন ত্রাবিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে? কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ
নাই। ভালই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়!
ছোটতুটি ছেলেরই বা কি দশা হইবে। হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু
মায়ের সমান যত্ন, মাসের সমান ভালবাসা কি আর হয়?

বাড়ির চাকর-চাকরাণী সকলেই দিবাবাত্রি প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে।
সকলেই দুঃখিত। সকলেব চক্ষে জল! সবজীব চক্ষু ও জলশূন্য নহে। সামান্য
অর্থলোভে, সামান্য অলঙ্কার লোভে সে, যে কুকার করিয়াছে, দৌলতনেনেসাব
উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্ততাপ হইয়াছে। মনে মনে মহাযন্ত্রনা ভোগ
করিতেছে। রূপসী তাহাকে লোক দ্বারা আরও কয়েকবার ডাকিয়া পাঠাইয়া-
ছিল। সে আর যায় নাই। রূপসীর সঙ্গে আর দেখা করে নাই। সকলের কান্না,
সকলের দুঃখ একপ্রকার, সবজীব কান্না, সবজীব দুঃখ অগুপ্রকার! তাহার কর্তৃক
যে একটি সোনার প্রতিমা অসময়ে সংসারসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া বিসর্জন হইল
তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। সে বিষাক্ত ঔষধ দুখে মিশাইয়া না দিলে যে একরূপ
সাংঘাতিক পীড়ায় দৌলতনেনেসা আশঙ্কিত হইতেন না, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে।
এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আব রূপসীর নিকট যায় নাই। ছয়মাস যায়,
পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত ভ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি। কি ভয়ানক বিষয়!
উহ! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থানে পথ্যস্ত
আঘাত লাগে! হায়রে হিংসা! হায়রে আমোদ। নর্তকীসহ একত্রে আমোদ!
আজ দৌলতনেনেসার নাড়ি পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ
নিবান হইয়া মলিনবদনে বাহিরে আসিলেন। মীরসাহেব কবিরাজদিগের হাব-
স্তাব দেখিয়া অবস্থাবুঝিয়া শুনিয়া সজলনয়নে তীব্র পীড়িত শব্দ্যার এক পার্শ্বে গিয়া
বসিলেন। দেখিলেন সে অলস্ত জ্যোতিঃপূর্ণ স্নকোমল মুখমণ্ডলে পূর্বতাব পরিবর্তন

হইয়া, গতকল্য যাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্তারিতলোচনে খবরতর জ্যোতির অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতেছে। মধ্যম পুত্রের বয়স দশ এগার বৎসর, সেও যে কিছু না বুঝিতেছে তাহা নহে। মায়ের বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটিপুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসী-দিগের তত্ত্বাবধানে বহিয়াছে। কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শুনা যাইতেছে।

মীরসাহেব! অনেকক্ষণ সহধর্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।
কেমন বোধ হয়?

দৌলতননেসা কোন উত্তর কবিলেন না। দক্ষিণহস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে মাত্র তর্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুইহাতে ধরিয়া অশ্রুটস্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীরসাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরেব বাহির হইলেন। কোনদিন কোনলোকে যে চক্ষে কখনই কোন কারণে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীরসাহেবের চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা পতন দেখিল।

ফাখেরাখাতুন অল্প ঘরে মুক্তিকা শয্যায় অজ্ঞান। কখন সচেতন, কখন দৌড়িয়া কন্ঠার নিকটে আসিতেছেন। কখনও কন্ঠার পার্শ্বে কন্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরকে বলিতেছেন—হায়! তোমরা এঘর হইতে চলিয়া যাও। আমি মাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিব। দেখিব কে আমার মাকে কোথায় লইয়া যায়? আবার কোল ছাড়িয়া উঠিতেছেন। দৌহিত্রদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া হু হু শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে অচেতন হইতেছেন।

দৌলতননেসা মুখের বস্ত্র সরাইয়া ইজিতে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিলেন। দুই-হস্তে দুইপুত্রের মুখে, মাথায় হস্তদিয়া অশ্রুটস্বরে কয়েকটি কথা কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের মুখে চামুচে করিয়া সরবত দিতে লাগিলেন। দুই-একটোক গিলিয়া আর গলাধ হইল না! গণ্ড বাহিয়া সরবত পড়িতে

লাগিল। শ্বাসবৃদ্ধি হইল, চক্ষু বিবর্ণ হইল, তারার কালীমাবেথা ক্ষেথিতে দেখিতে সরিয়া গেল।

ঈশ্বরের নাম কবিত্তে লাগিলেন। দৌলতনেনেসা মৃত্যুরে ঈশ্বরের নাম করিত্তে করিত্তে পুত্রদ্বয়ের মস্তক বক্ষে ধারণ করিত্তা, জীবনের শেষ ভালবাসিয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণবায়ু কোন পথে কোথায় চলিয়া গেল কেহই কিছু জানিত্তে পারিল না। সকলেই দেখিল চক্ষেবপাতা বন্ধ হইয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাস আর নাই। ঠোঁট দুইখানি যে নড়িত্তেছিল, তাহাও আব নাই। দৌলতনেনেসা নাই—স্পন্দহীনদেহ শয্যা পড়িয়া আছে। ঘবেবলোক মাথা ভাঙ্গিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘবেব বাহিব হইলেন। বাড়িমব ক্রন্দনেব-রোল উঠিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সেখানেই গড়াগড়ি পাড়িয়া মাথায় শত কবাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

পুরজনেরা তখনি সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। মীরসাহেবেব অভিমতে তাঁহাব পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতনেনেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতাব বাড়িঘর, জমিদারি, সে সময় সকলি সা গোলামের। মীরসাহেবেব কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতনেনেসারের সমাধি সাঁওতায় হইতে সা গোলাম কোন আপত্তি কবিলেন না।

এতদিনেব পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবেন না—এইখানেই ইতি কবিল। তবে তাহার পরিণামফল, পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা বহিল।

এক চতুঃশ তরঙ্গ

রূপান্তর

এই পরিশূন্য বূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিণত হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে। যে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রবাদ, হয়ত সেই স্থান হইতে ভূধরের অতি উচ্চশিখর দেখা দিয়া জলধির জলরাশি সরাইয়া স্থিয়মস্তক উন্নত করিতে পারে। মহানগরী কলিকাতাও কালের করালগ্রাসে পড়িয়া মহাশয়মান ক্ষেত্ররূপে দেখা দিতে পারে। নিয়তির

অসাধ্য কিছুই নাই। পরিবর্তন, রূপান্তর, জগতে আশ্চর্য্য নহে। যে রাজ্যে কেনীর নামে দোহাই ফিরিয়াছে, বালকে মাঘেরক্রোড়ে আতঙ্কে কাঁপিয়াছে, মহা-শক্তিশালী লক্ষপতির হৃদয় কেনীর নামে দূর দূর করিয়া অস্তির হইয়াছে, গ্রামচাঁদের নামে মান্নবের হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কেনীব ভাব স্বতন্ত্র, সর্বোত্তমভাবে রূপান্তর।

বাজশক্তিতে দেশের শান্তিবায়ু বহিয়া প্রজা নীলকরকে রক্ষা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অত্যাচারের দায় হইতে সকলকেই উদ্ধার করিয়াছে। সকলেই এখন বিধিব অধীন। বাজবিধিব অন্তর্গত সীমাব অধীন। নিকটেই মহকুমা। শাসন, বক্ষণ, সমুদায় বাজহস্তে। প্রজাব পক্ষে থাকিলেও নীলকরের অত্যাচার নাই। নীলকরের পক্ষে গেলেও প্রজার অত্যাচার নাই। যাহার যে পক্ষ অবলম্বন শ্রেয় বোধ হইতেছে, প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, স্বস্বাব বোধ হইয়াছে, সে সেই পক্ষে যাইতেছে। মাঝে মাঝে পরিবর্তনও হইতেছে। প্রজায় নীল আর বুনিবে না, কেনীও নীলচাষ ছাড়িবে না। জমিদার—জমিব অভাব নাই। চাষকারকিদ্বেব জন্মই প্রজাব দরকার। বিলাত হইতে কলেবলাঙ্গল আনিবেন, ইনজিনে লাঙ্গল চলিবে। কলেই আবাদ, কলেই বুনাঁই, কলেই কর্তন। কলেই মাই, কলেই জাঁত ; দেশীয়লোকের আর সাহায্য লইবেন না। দেশীয়লোককে আর ডাকিবেন না। খাজনার জন্ম তাগাদা করিবেন না। দশ আইন করিয়া রাজসহায়ে খাজনা আদায় করিবেন, ইহাই সংকল্প। এই যুক্তি স্থির করিয়া, আপন কর্তব্যকার্য্যে মন দিয়াছেন। কিন্তু মজুত তহবিলে হাত পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্য। মজুত তহবিল হইতে অকাতরে ব্যয় করিয়া উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হইয়াছেন। নায়েব, মুচ্ছদি, দেওয়ান, সাহেবের পূর্ব আসথাস অনেকেই আবার আসিয়া জুটিয়াছেন। কিন্তু সকলেই রূপান্তর। পূর্বভাব কাহারও নাই। এখন প্রজা-শাসন আইনের মারপেঁচে বড় বড় মাথাল মাথাল প্রজার নামে সত্যমিথ্যা অনেক নালিশ রুজু করিয়াছেন। উকিল-মোক্তার খুব জুটিয়াছে। কথায় কথায় নালিশ, কথায় কথায় আরজি দাখিল হইতেছে। থানায় এজাহার পড়িতেছে, ম্যাজিষ্ট্রাতে দরখাস্ত দাখিল হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণই আসামী। মন্দ নয় এ দৃশ্য—মন্দ নয়। পাঠক ! মনের কথা যদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্যে চক্ষু শীতল না হউক আনন্দ জন্মিবে। কোথায় সর্দার লাঠিয়ালের

ষমষাতনা, আর কোথায় সমন ওয়ারেটে তলবের তাড়না। কোথায় নিজেই হুঁসা-কুঁসা—বিধাতা, রাখা, মারা আপনহাত, আর কোথায় করজোড়ে বিচারপ্রার্থী হইয়া, সেই অধীনস্থ প্রজার সহিত সমশ্রেণীভাবে বাঙ্গালী বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান। কুঠির সীমায় পা রাখিতে যাহাদের প্রাণ কাঁপিয়াছে, গ্রক্ষণ বাজ-বিচারগৃহে সেই শামচাঁদ আঘাতি প্রজাগণ উচিত কথা কহিতে একটুকুও ক্রটি করিতেছে না। তিনি জমিদার, তিনি নীলকর, তিনি ইংরেজ, একথা বলিয়া একটুকুও খাতির করিতেছে না। বিশ্বাসের পাত্র সকলেই সমান। যে কথায় সামান্য কুলীমজুবকে রাজসমক্ষে শপথ করিতে হয়, যে: টি. আই. কেনীকেও তাহাই করিতে হয়। রাজদ্বারে সকলেই সমান! আবার প্রজার ভাবটাও একবার ভাবিয়া দেখুন—দেখুন কি চমৎকাব দৃশ্য! কি চমৎকার পবিবর্তন!

বাকি খাজনার মোকদমা বাতীত, প্রজা শাসন, প্রজা সোজাকবার বাবদে যে সকল মোকদমা কেনীরপক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রায়ই ডিসমিস। বিচারভ্রমে, কি বিভ্রাট। যে যে মোকদমায় প্রজাগণ শাস্তি পাইল, আপীল-আদালতে পবিপক্ষ বিচাবকের নিরপেক্ষ বিচাবে নীলকরের চক্র ছাপা বহিল না। মোকদমাও টিকিল না। আসামীগণ বেকস্বর খালাস পাইতে লাগিল।

এদিকে কলেব লাঙ্গল বিলাত হইতে আসিয়া পড়িল। নীলমাই জগু নীলহুঁজেও বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীলজমি চাষ, নীলকর্তন, নীলমাই ইত্যাদি সমুদায় কলের কৌশলে, ইনজিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবে না। ইহাই কেনীর আন্তরিক সঙ্কল্প। করিলেনও তাহাই। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। নীলবিদ্রোহীর প্রধান পাণ্ডা সা গোলাম। কলের লাঙ্গল প্রথম চালাইবার দিন কেনী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা জান, :আমি এই লাঙ্গলের নাম সা গোলাম রাখিলাম। গায়ের জ্বালায়, মনের ক্ষোভে, যাহাই বলুন, কিন্তু কলের লাঙ্গলে ভালরূপ চাষ হইল না। সে লাঙ্গলে দুই এক বিঘা জমি চাষ করা যায় না। এক স্থানে এক শত দুই শত বিঘা সমতল এবং সমশ্রেণীর জমি হইলে চাষ হয় বটে, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমি কাটিয়া নীলবুনানির উপযুক্ত করিতে বড়ই নাজেহাল হইতে হইল। কলে টিল ভাঙ্গা হয় না, মই দেওয়া যায় না। মাত্র জমি কাটিয়া মাটি উন্টাইয়া দেয়। টিল ভাঙ্গিতে, মাটিবুনানির উপযুক্ত করিতে

দেশীয় লাক্সলেব বিশেষ আবশ্যক হইল। তখন বাধ্য হইয়া গরু, মহিষ, ক্রয় করিলেন। লাক্সল, জোয়াল, বিদে, কাস্তে, কোদালী চাষকার্যের যাবতীয় সরঞ্জাম কেনীকে প্রস্তুত করিতে হইল। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বুন, বাগদী আনা হইয়া মাসিক বেতন ধার্য্যে ঐ সকল কার্য্য কবিত্তে লাগিলেন।

গুদাম ঘবে এখন আর কয়েদী থাকে না, আমলাগণের বাসা হইয়াছে। মাঝ-ধর, ধর-পাকড—এসকল নামও আর শুনা যায় না। যাহা কিছু সকলি আদালতে। প্রজাকর্তৃক অন্ত্য-অত্যাচারের বিচারসমুদায়ই রাজদ্বারে। কিস্তি কিস্তি প্রজাব নামে খাজনার নালিশ। এক থানা, দুই থানা খাজনার দাবিতেও প্রজার নামে নালিশ হইয়াছে। অবশ্যই ডিক্রিও হইতেছে। কিন্তু খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে না। কেনীর ইচ্ছা যে, কিস্তি কিস্তি নালিশ করিয়া খরচা ইত্যাদিতে প্রজাকে নাজেহাল করা। পবে একত্রে ডিক্রি-জারির টাকা আদায় করিতে বসিবেন। প্রজা মোকদ্দমায় অথবা অর্থব্যয় করিয়া জেরবার হইবে। সেসময় আসল ডিক্রির টাকা দিতে অপাবগ হওয়াবই কথা। দায় ঠেকিয়া বিশেষ বাধ্য হইয়া তাহার আত্মগত্যা স্বীকার করিবে।

যেমন নূতন মহকুমার সৃষ্টি, তেমনি মোকদ্দমার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি। মহকুমায়, জিনায় কেনীর মোকদ্দমার অন্ত নাই। খরচেরও অন্ত নাই। কিন্তু আয়ের অঙ্ক একেবারেই শূন্য। ইতিপূর্বে নৌ-বীজসহিত ছোলা-বুনানি হইত, ছোলা উঠিয়া যাইত নৌ বাডিতে থাকিত। বৎসব সালের ঘোড়া, গরুর দানা সেই উপবিলাভেই চলিত, এফণ ঘোড়ার দানা, চাকরের মাহিয়ানা, মামলা-মোকদ্দমাব খরচ সমুদায় মজুদ তহবিল হইতে খরচ হইতে লাগিল। বিশেষ সত্য-মিথ্যা মোকদ্দমা মাজাইয়া উপস্থিত করিতে ত্রাণ ব্যয়ে কখনি পার পায় না। অনেক স্থানে অপব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। থানাদার, জমাদারকে বসে রাখিতে হইলেও ছালায় ছালায় টাকা ঢালিতে হয়। উপস্থিত পরিবর্তনে কেনীর অর্থের শ্রাঙ্ক হইতে লাগিল। কলকারখানায় জমিচাষ ইত্যাদি কার্য্যেও অনেক অর্থ জলে গিয়াছে, লাক্সল, গরু, মহিষ করিতেও দশ বার হাজাব নামিয়াছে, কিন্তু অত গরুর আহার কোথা হইতে জোগাইবেন। সহজ কথা নহে। ক্রমে অনাহারে অথবা গরুগুলি মারা পড়িতে আরম্ভ করিল। কেনীর রোক কিছুতেই পড়ে না। দশ গরু মারা পড়িল, বিশ গরু খরিদ হইয়া আসিল। দেশওয়ালী,

পাঁড়ে, দোবে অনেক বাথিতে হইয়াছে, আমলা, মোক্তার, উকীল, তদবিবকারক, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্ত চাকর, নানা স্থানে রাখিতে হইয়াছে। ক্ষেণীব সংসারে পূৰ্বাপেক্ষা নিয়মিত ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া দশ গুণেৰ উপর উঠিয়াছে। ইহার পর খাজানা-আদায় বন্ধ। নীলকার্যো লাভ কিছুই নাই। ব্যয়চতুর্গুণ। অধঃপতনের পূৰ্ব লক্ষণ।

দ্বাচতুঃশ তরঙ্গ

শেষ অঙ্ক

কাহাব কপালে কে খায়? ঈশ্বর ললাটফলকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সৰ্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে। বিশ্বাসীমাত্রেবই এই বিশ্বাস। কিন্তু এক দৌলতনেনেসাব অভাবে সে পুরী ক্রমে জনশূন্য হইয়া উঠিল। দাসদাসীগণ কিছুদিন থাকিয়া, আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল। খাওয়াপদ্য কষ্ট না হইলেও নানা কারণে বাড়ি ছাড়িতে বাধ্য হইল। কারণ কু-কথা কয়দিন গোপন থাকে, কানায়ুযায় কথাটা একপ্রকাব কাথেরাখাতুনের কানে গিয়া পড়িল যে, এইসকল দাসীবাঁদীই কৌশল করিয়া কি ঔষধ খাওয়াইয়া দৌলতনেনেসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কে সেই ঔষধ খাওয়াইয়াছে, কি স্বার্থে এমন নেমকহারামী করিয়াছে তাহাব কোন সন্ধান হইল না। কিন্তু কাথেরাখাতুনের অন্তর হইতে দাসদাসীগণ একেবারে সবিয়া গেল। মনিবেব আদর, যত্ন, ভালবাসা না পাইলে কয়দিন অধীনস্থ তাবেদাব টিকিতে পারে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, অথচ ক্রমে অনেকে যাইতে আরম্ভ করিল। সৰ্ব্বপ্রথম সবজা তাহার কন্যা দুৰ্গতিকে লইয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেখাদেখি পব পর অনেকেই যাইতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন না, বা বাথিতে যত্নও করিলেন না। যে চলিয়া গেল কোনদিন তাহার সন্ধানও লইলেন না। দৌলতনেনেসা চারটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পবিত্যাগ কবিয়াছেন। মীরসাহেবও স্ত্রীশূন্য ঋন্তুরালয়ে সৰ্বদা বাস করিতে আব ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পূৰ্বপুরুষের আদি-বসতিস্থান পদমদী গ্রামে বাসকবাই মনন করিলেন। পুত্রগণ ঋতামহীর নিকটেই থাকিবে। মাঝে মাঝে এখানেও আসিবেন, সে বাড়িতেও থাকিবেন। সংসারে সুখ নাই—জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাংসারিক কার্য্যও ইতি নাই। প্রধান শত্রু সা গোলাম। অধিকন্তু নীলকর পক্ষে থাকায় দেশের লোকের চক্ষেও

একপ্রকার চক্ষুশূল। মনও ভাল নহে। সাংসারিক কার্যেও একপ্রকার উদাসীন।

আব কিছুই ভাল বোধ হয় না, জীবনের অবশিষ্টকাল নির্বিশেষে ঈশ্বরের নাম কবিরেন স্থির কবিয়াই এ স্থান পরিত্যাগ কবিরেন মনে মনে স্থির কবিয়াছেন। সেও পূর্বপুরুষের বাড়ী। যৎকিঞ্চিৎ বিষয় আছে। কোন গোলযোগের মধ্যে না গিয়ে শুধু ঈশ্বরের নাম করিয়া জীবন কাটাতে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘর-সংসার এখন তাঁহার কিছুই নাই বলিলেও হয়। কিন্তু লাহিনীপাড়ায় শস্তবালয়ে থাকিলে সর্বদা শান্তভাবে ক্রন্দন শুনিয়া আবও মন চাঞ্চল্য হইবে, ঘর-সংসার নাই, অথচ কেনীব পক্ষ, প্রজাব বিপক্ষ থাকিয়া সংসারচক্রে ঘূর্ণিতে হইবে, এইসকল ভাবিয়া কিছুদিনের জন্য এস্থান পরিত্যাগ কবাই মনে মনে স্থির করিলেন। পুত্রগণের জন্মও কোন চিন্তা নাই, কাবণ কাথেরাখাতুন বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের কোন বিষয় তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। একখানি বস্ত্রের জন্মও চিন্তা করিতে হইবে না, তাহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সকল ভাবনা-চিন্তা-যাট গীবসাহেবের শস্তবালয় পরিত্যাগ কবিলেন। চিবসঙ্গী বসীকদিন সঙ্গেই চলিল। আব যাঁহা ইচ্ছা হইল, সেও গীবসাহেবের সঙ্গেই হইল। মনের কথায় উদাসীন পথিক গীবসাহেবের জীবনের শেষমুহুর্ত এইখানেই ইতি কবিল।

পাঠক! পথিকের মনের কথার আদি আছে, ইতি নাই। স্তবে স্তবে বিচ্ছেদ আছে কিন্তু কথার ইতি নাই। জীবন শেষ হইবে, জীবনলীলা সাক্ষ হইবে, কিন্তু কথা ফুরাইবে না। মনের কথা মনেই বহিয়া যাইবে। আক্ষেপ ভিন্ন এজীবনে আব আশা কি? জগতের কাণ্ডই এইপ্রকার। এক আসিতেছে আব যাউতেছে। পথিকের কথায় কতজনের সংযোগ হইল, কতজনের সংশ্রব ঘটিল, ঘটনাক্রমে কত-জনকে পরিত্যাগ কবিত হইল। স্তবের সীমা যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই সংশ্রব, সংযোগ কমিয়া আসিতেছে।

মা গোলামের কার্যে বাধা দিতে এখন আব কেহই রহিল না। মা গোলাম মনে মনে আব একপ্রকার চালে চলিতে এখন মহাবাস্ত হইয়াছেন। চিরশত্রু দেশ-ছাড়া হইয়াছে। গীবসাহেবের জীবনের লীলাখেলা এদেশ হইতে একপ্রকার জীবনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আর চিন্তার কি? চারিদিকেই মঙ্গল! প্রজার পক্ষে থাকিয়া আশার অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন। দেশের লোকে

সা গোলামের প্রশংসা শতমুখে করিতেছে। বুদ্ধিব্যবেচনায় দুশ বাহবা দিতেছে। কেনী আপন জেদ বজায় রাখিতে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যাহার ঘৃণাবোধ আছে, সে টাকার মায়া বোধে না। যে রোগী, সেও টাকার মায়া করে না। যে লাজুক সেও টাকা রাখিতে জানে না। সংসারে যে সত্যবাদী এবং পর-দুঃখে কাতর, তাহার হাতেও টাকা থাকিতে পারে না। কেনী সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়াল না হউক, রাগ আছে, ঘৃণাও আছে। লজ্জা যে একেবারেই নাই তাহাও নহে। কাজেই মজুত টাকা ক্রমেই হাতছাড়া হইতে লাগিল। আবার বাতাস উন্টা করিয়া বহাইবেন, আবার প্রজাকে শাসনদণ্ডে পেষণ করিবেন, এই দুশ্চিন্তাতেই সর্বদা অর্থের শ্রদ্ধা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। দিন দিন ভাণ্ডার খালি হইতেছে। কিছুদিন পরেই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, কেনী ঋণী। কলিকাতা কোম্পানীর হোসে অনেক টাকা ঋণী! প্রজার নামে খাজনার ডিক্রি হইয়াছে, আদায় নাই। নিজ আবাদে নীল-বুনানি হইতেছে, আয়ের নামও নাই, ব্যয়ের চতুর্থাংশের এ চাংশ ঘরে আসিতেছে না। মনিবের ঋণদায়ের কথা অধীন চাকরগণও জানিতে পাবিলেই স্বভাবত ভক্তির হাস হয়, বিশ্বাসেও বাধা জন্মে। মুখে প্রকাশ না হউক মনে মনে নানারূপ সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। অধীন বেতনভোগী আমলা সামান্য চাকর পর্যন্ত আপন আপন পাওনা কড়ায়ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। ঋণদায়, মহাদায়! যে সংসারে ঋণপাপ প্রবেশ করিয়াছে সে-সংসারের কল্যাণ আশা আর নাই। তবে পুণ্যের জোর বেশী থাকিলে পাপ কাটিয়া যাইয়া আবার ভাল সময়ের মুখ দেখা—সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘর-কন্না বিষয়-সম্পত্তির বিসর্জনেরই সুপ্রশস্ত পথ ঋণদায়। কেনীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। লাখে লাখে টাকা কোন পথে কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল, কেহ চক্ষেও দেখিল না। আসিবার সময় অনেকেই দেখে, কিন্তু যাইবার সময়, কোন পথে সরিয়া যায়, বহু অশ্বেষণেও সে পথের সন্ধান হয় না। অর্থ-চিন্তায় শায় মহাচিন্তা জগতে আর কিছুই নাই। অতিবিচক্ষণ পণ্ডিত সে চিন্তায় বিহ্বল—মহাজ্ঞানী হতজ্ঞান। মহাবলশালী মহাবীর ত্রিয়মাণ। বুদ্ধির বিপ্লব্য দেখিলে, আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ বুঝিলে সর্বদা অগ্রমনস্কের ভাব থাকিলে যাহা থাকিবার তাহাও থাকে না। কেহ রাখেও না। যে যে পথে সুবিধা পায় ছ'হাতে লুটতে থাকে। দায়ীকের হঠাৎ অধঃপতনের অর্থই অর্থচিন্তা ও দুশ্চিন্তা—

কেনী পীড়িত হইলেন। মলত্যাগদ্বারের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, পুরুষ-শরীরের কিঞ্চিৎ নিম্নে অতিকোমল স্থানে বৃহৎ একটি স্ফোটক হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। তিনি বাধ্য হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করিলেন। মিসেস কেনী কুঠিতেই বহিলেন। স্বামীর দুর্ব্বস্থা হইলে স্ত্রীর মনেও যে কিছু না হয় তাহা নহে। কেহ মনের কথা মনেই বাথে, কেহ উদাসীন পথিকের ত্রায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। খায় রে জগৎ। যদিচ কেনী ঋণী, কিন্তু তাহার স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি পূর্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, নাই কেবল টাকা। সোনারূপাব অলঙ্কার তাহার আলমারীপোরা। পাঠক! ভুলিয়াছেন? না মনে আছে? ঐসকল অলঙ্কার কি কেনী নিজে প্রস্তুত কবাইয়াছিলেন? তাহা নহে—মনে হয় কি? ঐসকল সেই অলঙ্কার নিবীহ কৃষক-প্রজার পরিবারের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার—মুটের মাল। মিসেস কেনী অনেক সরাইলেন। আমলাগণও হক না হক খবচ লিখিয়া আপন আপন জমাখরচ দুরন্ত করিলেন। সে সকল খাজানার ডিক্রি প্রজার বিকদ্ধে করিয়াছিলেন, প্রজার নিকট কিছু কিছু সেলামী লইয়া কতক চাপা দিলেন, কতক তামাদী কবিলেন, কতক বাড়ি চুরি, বাসা চুরিব ভান করিয়া, কেহ আচ্ছা একহাত মাবিয়া আপন জিনিসপত্র সরাইয়া বাসায় আঙুন জালিয়া দিলেন। ছারপোকা-মশার বংশ একেবারে শেষ হইল। আর যাহা পুড়িবাব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অর্দ্ধ-পোড়া কুড়ি পঁচিশ বস্তা বাকী খাজনার করমালা সাধাবণকে দেখাইয়া একবারেই শেষ করিয়া ফেলা হইল। কেনী পীড়িত, এখনও জীবিত। তাহাতেই এই দশা। আমলা, নেগাহবান, কার্য্যকারক, বিষয়সম্পত্তি, দালানকোঠা সকলি আছে। শরীরের অর্দ্ধাংশ যে স্ত্রী তিনিও বাঁচিয়া আছেন, তত্রাচ এই দশা। জগতের কাণ্ডই এইরূপ।

কেনী আরোগ্য হইলেন। ভালমতে আরোগ্য হইয়া কুঠিতে আসিলেন। আবার কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বেশী হইতে চলিল। নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপের ত্রায় শেষদীপ্তি দেখাইয়া চির নির্ঝাণোন্মুখ রূপ ধারণ করিল।

শ্রোতস্বতীর ঋতুর গতি আর ঘটনাস্রোতের অবিশ্রান্ত পতি বোধ করিতে কাহারই সাধ্য নাই। ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। কেনী আবার পীড়িত হইলেন। জননেত্রির নিম্নে বেষ্মানে

ফোটক হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে ভালমত আবাম হইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইল। শেষে দেখা গেল যে, সংযোগস্থানের জোড়া খসিয়া গিয়াছে। যেখানে ঘা শুকাইয়া, জোড়া লাগিয়া উপরেব চাগড়া পর্যন্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। বক্ত পড়িতেছে। কেনী তখনি কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পারিলেন কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কুষ্টিয়া মহকুমা স্থাপনের পর—বেলগুয়ে লাইন খুলিয়াছে। কলিকাতা য়াওয়া-আসা যতদূর সহজ হইতে হয় হইয়াছে। কোনরূপ খেজালত নাই। কেনী বেলগুয়েযোগে প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা পৌঁছিলেন। সঙ্গে মিসেস কেনী আর সোনাউলা খানসামা।

কেনী গতবারে পাঁড়িত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছিলেন, এবারেও কলিকাতাব সেই প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান লইলেন।

কতদিন পরে কুষ্টিয়া অঞ্চলে একটি কথা প্রকাশ হইল। সকলেরই শুনা কথা, নির্দিষ্ট খবর কেহই বলিতে পাবে না। মুখে মুখে কথাটা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সকলেব মুখেই সেই কথা। “কেনী নাট”। দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেনীর জীবনপ্রদীপ ইহজীবনের মত নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। আশা-ভরসা, শত্রুদমন, পুনরায় নীলকার্ঘ্যের প্রচলন, প্রজাশাসন ইত্যাদির সমুদায় কার্য পড়িয়া রহিল। মনের আশা মনেই বাঁথিয়া গেল। কেনীর সংস্বে যতপ্রকার মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল সমুদায় মূলতবী হইল। কয়েকদিন পরে নীট খবর পাওয়া গেল যে, “কেনী যাথার্থ্য নাই।” মরণের কিছু পূর্বে একখানি উইলপত্র লিখিয়া সমুদায় সম্পত্তি রিসিভাবেব জিন্মা করিয়া গিয়াছেন। দেনা পাঁচলক্ষ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদাবগন টাকা পাইবেন। দেশেব লোক যেন মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। মাথার উপর হইতে ভাবি একটা বোঝা সরিয়া গেল। সকলের শরীবট যেন পাতলা পাতলা বোধ হইতে লাগিল। কেনীর দৌরাড্রা, কেনীর অত্যাচাব, কেনীব কথা মনে হইলে সত্য সত্যই চঞ্চল। কিন্তু কিছুদিন কাহারও বিশ্বাসই হইল না যে কেনী ইহসংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, মায়ামমতা, আশা-ভরসাব হাত হইতে ছুটিয়া শাস্তিধামের অধিবাসী হইবে। খবর নিশ্চয় আদালতের ঘর পার্শ্বস্থ খবর, পাকা খবর কেনীর ঠেটের কার্যকর্ম-সমুদায় হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে বদ্ধ। স্তত্রাচ বিশ্বাস নাই।

বুঝি মবে নাই। কোন সময় হটপাট কবিয়া আসিয়া পড়িবে। সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস। কেনীব জীবন-অন্তের পর অনেকেই কেনীব মেঠে দুর্দাস্ত চেহাৰা, শরীরেব ভীষণ গঠন স্বপ্নাবেশে মানসচক্ষে দেখিয়া—যথার্থ ই দেখিয়া যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।

মিসেস কেনী কুঠিতে আসিলেন। আপন জিনিসপত্র ঘাহা ছিল, তাহা লইয়া পুনৰায় কলিকাতায় চনিয়া গেলেন। বিস্মিতকর্ক কেনীব মনুদা ষ্টেট নীলাম হইল। কিন্তু নিলাম ডাকিবাব লোক নাই বলিলেই হয়। চাবলক্ষ টাকা মূল্যে অগ্ন আৰ এক কোম্পানী খরিদ কবিলেন। তিনিও বেশীদিন বাধিতে পারিলেন না। অগ্ন আৰ এক কোম্পানীব নিকট বিক্রয় কবিলেন। তিনিও সম্পত্তি শাসন কবিয়া কব-আদায়ে সমর্থ হইলেন না। বাধা হইয়া দেশীয় লোকেব নিকট খণ্ড খণ্ড কবিয়া বিক্রয় কবিলে আবস্ত কবিলেন। দেশেব লোকেই ভাগবন্টন কবিয়া কেনীব সাবতীয় সম্পত্তি খরিদ কবিয়া লইল। নীলকবেব নাম দেশ হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরিণাম

কেনীব জমিদারি খণ্ড খণ্ড হইয়া বাঙ্গালার দখলে। শালঘর গধুয়ার কুঠি একজন বাঙ্গালী ক্রয় কবিলেন। আঙ্গিনা, প্রাঙ্গণ, উতান আৰ রহিল না। পাটের আবাদ, ধানের আবাদ আবস্ত হইল। যে কুঠিব সীমায় জমিদার, তালুকদার লক্ষপতি মহাজনের পা ধবিতে গা কাঁদিয়াছে, ঘটনাস্রোতে, নিয়তিব বিধানে, সেই স্বরম্য দ্বিতল বাসগৃহেব চতুশ্চাশ্বে সাধারণ প্রজার কোষ্ঠার আবাদ, মিঁডি পর্যাস্ত কোষ্ঠার আবাদ, ধানের আবাদ আবস্ত হইল। যাহারা খরিদ কবিয়াছেন, তাহাদের বাসেব জন্ত, সময় সময় বসিবার জন্ত ঘৰ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অগ্ন অগ্ন দালানকোঠা পড়িয়া রহিয়াছে। চন্দ্রচটিকা, আবঙলা, ঈদুর, শূগাল ইত্যাদি মনের আনন্দে দিবাবাত্র খেলা কবিতেছে—ছটাছুটি কবিতেছে। এখন তাহারাই কেনীব স্বরম্য বাসগৃহেব অধিকারী—আপিস দালানের অধিকারী।

কিছুদিন পর গোয়ালন্দ লাইন খুলিল। গোয়ালন্দ স্টেশন এবং কোম্পানীর বাজার রক্ষার জন্ত স্রোতস্বতী পদ্মার সহিত রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ লড়াই বাধিল। তাহাদের ইচ্ছা যে, পদ্মারস্রোতের বেগ অগ্ন পথে ফিরাইয়া স্টেশন, বাজার,

স্টিমার-ঘাট তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বুদ্ধিমান কর্মচারী চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে, একটি নদীর শ্রোতই যদি বুদ্ধিকৌশলে দশহাত তফাত দিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া যায়, তবে বিলাতী-গোবর কি? স্টেশন, বাজার, স্টিমারঘাটই যদি পদ্মার শ্রোতবেগ হইতে রক্ষা না কবা যায়, তবে আব রেল কোম্পানীর ক্ষমতা কি? বাঙ্গলাদেশের নদীর সহিত যদি বিলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লঙ্কা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এসপার নয় ওসপার! পদ্মার শ্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেও আড়াআড়ি বাঁধ! ফেল ইটপাথর, দেখি পদ্মাব জোর কত? দেখি পদ্মার শ্রোতের তেজ, তরঙ্গের আঘাত? বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল ‘স্পার’। বিলাতী বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা, ‘স্পার’ প্রস্তুত হইল। একটি পাকা রাস্তা গোয়ালন্দের ঘাট হইতে পাকারূপে পদ্মার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শ্রোতের গতি ফিরিয়া গেল! শীত-কাল, পদ্মা নীবব। যেপ্রকারে ইচ্ছা সেইপ্রকারে বড় বড় বাহাদুরী পুড়িয়া স্পারের মাথা ঠিক রাখা হইল। স্পারের উপর রেললাইন পর্য্যন্ত বসান হইল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! নদীর দিকিভাগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তার দক্ষিণ-বামে শ্রোতবেগ কমিয়া গিয়া স্পারের মাথা ঘেঁষিয়া শ্রোত চলিতে লাগিল। ধন্য বিলাতী বুদ্ধি! স্টেশন, স্টিমার-ঘাট, বাজার সকলি রক্ষা হইল। কোম্পানীর আনন্দের সীমা নাই। কালশ্রোতে বর্ষাশ্রোত আসিয়া উপস্থিত। পদ্মার শ্রী অগুরূপ। শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি—ভীষণ কলকল বব চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। স্পার আর টেকে না, প্রায় তিনলক্ষ টাকা ন্যয় করিয়া যে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহাই একেবারে জলে ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, ভাসিয়া যায় বড়ই লঙ্কার কথা। স্পার রক্ষা করাই কোম্পানীর মত হইল। আরও দুইলাখ টাকার ববান্ন হইল। যে উপায়ে হয় স্পার রক্ষা করিতেই হইবে। কোম্পানীর ইটপাথর যেখানে যাহা ছিল সমুদায় ট্রেনে আসিয়া স্পারে ঢালিতে লাগিল। কিছুতেই আর টেকে না। পদ্মা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষণরবে ছুটিয়াছে। কার সাধ্য বাঁধ বাধিয়া আটকায়? বিলাতী ক্ষমতাও কম নহে। দিবারাত্র ইটপাথর ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। যেখানে একটু দমিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ইটপাথর ফেলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত লোক খাটিতেছে। কোম্পানীর ইটপাথর যাহা যেখানে ছিল সমুদায় স্পারের কল্যাণে পদ্মার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন আর রক্ষার উপায় নাই! ইটপাথরের জোগাড় করিতে পারিলেও-বা আশা ছিল।

টাকার অসাধ্য কি আছে? রেলওয়েলাইনের নিকট পুরাতন বাড়ি, নীলের কুঠি ইউজ, জঁতঘর যেখানে যাহা ছিল, দ্বিগুণ চতুগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ষতসত্তর সম্ভব হইল পদ্মার বুকে ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইল। ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধিতে সাধ্য কার! কেনীর বাসগৃহ, কুঠি; ইমারতসমুদায় রেল কোম্পানীর দ্বাৰা আনীত হইয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু স্পার টিকিল না। স্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা ভাবিয়া নির্দিষ্ট করিতেও ক্ষমতা রহিল না। কেনীর দালানের ইট পথাস্ত জগতেব চক্ষে থাকিল না, যে স্পারে প্রায় সাত আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে স্পারসমেত পদ্মাব স্রোতে উড়িয়া গেল।

পথিকের মনের কথার প্রথম স্তর কেনীর প্রসঙ্গ-পরিণাম-ফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইল।

—সমাপ্ত—

বসন্তকুমারী নাটক

নাট্যকাক্স নর-নারগণ

পুরুষ

বীরেন্দ্র সিংহ	—	—	ইন্দ্রপুত্রের রাজা
নবেন্দ্র সিংহ	—	—	বাজপুত্র
বৈশম্পায়ন	—	—	রাজমন্ত্রী
প্রিয়ংবদ	—	—	বিদূষক
শরৎকুমার	—	—	রাজপুত্রের সহচর
বিজয় সিংহ	—	—	ভোজ পুরাধিপতি

স্বয়ম্বরসভায় মিলিত বাজগণ, কঙ্ককী, প্রতিহাবী, নগরপাল,
প্রজাগণ, ভূতা প্রভৃতি ।

বমণী

রেবতী	—	—	ইন্দ্রপুত্রের রাণী
বসন্তকুমারী	—	—	ভোজপুত্রের রাজকন্যা
বিমলা } সরলা }	—	—	প্রতিবেশিনীদ্বয়
মেঘমালা	—	—	বসন্তকুমারীর সহচর
মালতী	—	—	রেবতীর সহচর

বসন্তকুমারী নাটক

প্রস্তাবনা

(নটের প্রবেশ)

নট—(স্বগত) আহা ! কি অপূৰ্ণ সভা ! এ সভাব শোভা নয়নগোচর কোরে আমার অন্তঃরাশি যেন সন্তোষ—সাগবে সন্তবণ দিচ্ছে । অতঃপর আমার জন্ম সফল হলো । নয়ন চরিতার্থ হলো । এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে বহুগুণ-সম্পন্ন-গণনীয় মহোদয়গণের আগমনে কি অপূৰ্ণ শোভাই হয়েছে, স্থানটি কি মনোহর রূপই ধারণ করেছে । চমৎকার শ্রেণীবদ্ধ দীপমালা যেন অসংখ্য তাবকামালার ন্যায় শত থেকেই সভাতলস্থ অন্ধকার একেবারে হরণ করেছে । কিন্তু এক-চন্দ্রের নিকট যখন গগনস্থ অগণনীয় তারকাস্রোতী দীপ্তি পায় না, তখন দীপমালা যে, এত উপস্থিত মহোদয়গণের মুখচন্দ্রমাব কাছে মলিনভাব ধারণ করবে, এতে আব আশ্চর্য্য কি ? তবে প্রেমসীকে ডেকে দেখি, যদি কিছু উজ্জল করতে পারি । (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে ! যদি বেশ-বিত্যাস হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে সভাতল সমুজ্জল কর ।

(নটের প্রবেশ)

নটী নাথ ! আমারে আবার কেন ডাকলেন ?

নট—প্রিয়ে ! দেখদেখি, কেমন চমৎকার সভা হয়েছে, ইন্দ্ররাজেব দেব-সভার শোভাও এ সভার শোভায় পরাজয় হয়েছে । তবে অনর্থক বাকচাতুর্বীতে সময় নষ্ট না করে কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত মহোদয়গণের চিত্তব্রজন কর ।

নটী—নাথ ! আপনিও আমোদ-প্রমোদ নিয়েই আছেন । তা যাহোক আমায় কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন ।

নট—আজকাল ভদ্রসমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে । অতএব প্রিয়ে ! তোমায় আজ একটি নূতন নাট্যাভিনয় করতে হবে ।

নটী—আজকাল নব্য-সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সকল বিজ্ঞ-জন-মণ্ডিত-সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ নয় ।

নট—তাতে ভয় কি ? গুণীগণ কি মূৰ্খজনের দোষ গ্রহণ করেন ? তোমার এত

ভয় কি ? তুমি একখানা নাটক মনোনীত কব, আমরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই ।

নটী—নাথ ! আপনিই মনোনীত করুন । আপনি উপস্থিত থাকতে কি আমি অগ্রে কোন কথা বলতে পারি ?

নট—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অত্ৰ তারই অভিনয় করা যাক ।

নটী—বসন্তকুমারী ! কার রচিত ?

নট—কুষ্টিয়া নিবাসী মৌব মশাবূরফ হোসেন রচিত ।

নটী—ছি ছি ! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কললেন ।

নট—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?

নটী—তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজ্জাব হোক মুসলমান !

নট—অমন কথা মুখে আনিও না ! ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভাবতেব সর্ব্বনাশ হচ্ছে ।

নটী—নাথ ! ক্ষমা করবেন । আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য । কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় কোবে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন । সভাস্ত মহোদয়গণের মনোবঞ্জন করা দূবে থাক বরং তাঁদের বিরক্তিই হবে ।

নট—প্রিয়ে মনোরঞ্জন না করতে পারি, রহস্ত তো হবে ? সে-ও-এক আমোদ ।
তুমি আর বিলম্ব করনা । একটি গান গেয়ে অভিনয় আরম্ভ কোরে দাও ।

নটী—সে কি নাথ ! আমি স্ত্রীলোক, এই সভার মাঝখানে গান গাবো ?

নট—তাতে লজ্জা কি ?

নটী—আপনি তা বলবেন বটে, কিন্তু আমি তা পারি না, আমার ভারি লজ্জা ।

নট—(হাস্ত করিয়া) দেখ প্রিয়ে ! এটি তোমাদের স্বভাব । পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বললেই লজ্জা জানাও ।

নটী—(ঈষৎ হাস্তমুখে লজ্জিতভাবে) আচ্ছা আপনি বলছেন তবে গাই ।

গীত

বসন্ত বাহার—আড়া ।

ফুটিল বসন্তফুল মোহনকাননে । (সই)

দাঁহছে বিরহী-প্রাণ বিচ্ছেদ দহনে ॥

পিক বঁধু শাখী পরে,

কুহকে পঞ্চম সুরে,

শুনে প্রাণ ছ-ছ করে,

বিরোগী মরে জীবনে ॥

ফুলশরে ফুলবান,

হাসিতেছে পঞ্চবাণ,

ঋতুরাজ বধে প্রাণ,

প্রমোদিত উপবনে ।

এ বসন্তে কান্তাহারা,

ঋষি করে তারা কারা,

কোথারে নয়নতারা,

সতত বলে বদনে ॥

নট—বেশ ! বেশ ! প্রিয়ে তোমার স্বকণ্ঠ বিনির্গত তান-লয় যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণে
বোধহয়, সকলেই মোহিত হয়েছেন । (নেপথ্যে সভাভঙ্গ বাজ)

প্রিয়ে—শুনছ ! বাজা বীরেন্দ্র সিংহের সভাভঙ্গ হলো । চল আমরা যাই ।

(উভয়ে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্যভূমি

(ইন্দ্রপুর ; রাজা বীরেন্দ্র সিংহের বহিস্থ শয়ন মন্দির—রাজা আসীন)

রাজা—(স্বগত) মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, কিছুই ভাল লাগছেনা, মন্ত্রীই বা
এখনো কেন আসছেন না. প্রতিহারীও তো অনেকক্ষণ গিয়েছে । (চতুর্দিকে
অবলোকন করিয়া নিকটস্থ পালঙ্কে শয়ন ও বিবিধ চিন্তা) (প্রিয়ংবদের
প্রবেশ)

প্রিয়—(গ্রীবাউন্নত করিয়া মহারাজের আপাদ-মস্তক দৃষ্টি এবং স্বগত) মহারাজ
তো ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ-বিছানায় বসে মনের সাধটা মিটিয়ে
নিই । অহংকারের সহিত উপবেশন) বা ! বা ! কি নরম ! বালিসে

ঠেক দিলে, মন আর কিছুই চায় না ; কি সখ । (দক্ষিণ-রামে ফিরিয়া)
 উহ কি মজা ! মাধে কি বডলোকে বালিস নিয়ে গড়াগড়ি যায় । রাজা-
 তন্ত্বে বসিলে মনেব গতিও ফিরে যায় । এখন দে'ই হুকুম । মাঝি গদীন !
 না না এই সোনার নলে টান দিয়ে ববাদ্দা বাঝা ডাবা, ফবসী, গুড-
 গুর্ডি, সেতো আছেই এর ভিতবেব মাঝপেঁচটা কি ? মরি আর বাঁচি এ
 সোনার ভাঁকোয় একটান দিবই দিব । নল হাতে করিয়া টানিতেই ।

রাজা—বয়স ! ও কি কর ?

প্রিয়—(চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া গড়াগড়ি দূরে যাওয়া বোডহাতে) না
 মহারাজ ! বিছানায় কেমন সোনারূপাব কান্স, তাই দেখিছিলুম ।

রাজা—ওহে ! আজকাল চলছে কেমন ?

প্রিয়—(একটি মাঝিয়া গিয়া) চলবে কি ? বলব কি ? মহারাজ ! কবব কি ? য
 তাই । সেই ফাঁক-ফাঁক । তবে আপনি যদি পুনরায় বিবাহ কবতেন, তাহলে
 একরকম,—জানতেই পাচ্ছেন, আপনি তো ষার সে নামটিও কববে-
 না । দেখুন, কেমন সখ । এই তো, বিছানা একা শুয়ে কেবল মনে মনে
 সাত সাগরের ঢেউ গুণছেন । আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে দেখাতেন,
 শর্ম্মারাম কখনো গৃহশূন্য হতো না—কখনই হতেন না—মূহুর্তকালের
 জ্ঞাতও ঘবখালি থাকতো না । এক যেতে আর এক আসতো । মহারাজ !
 যে ঘরে স্ত্রীলোক নাই, সে ঘবে লক্ষ্মী নাই : সে ঘর নরক বললেও হয়,
 শাসান বললেও হয় । (পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ ! চললেন,
 আর বসা হলো না ।

রাজা—কেন ? এত ব্যস্ত কেন ? কথা শেষ হলোনা যে ?

প্রিয়—(গাভোথান করিয়া বিরক্তিভাবে) আর থাকতে পার্নতো শেষ হবে ?
 ঐ দেখুন, ও বেটার মুখ দেখলেই আমার প্রাণ উড়ে যায় । যাই মহারাজ !
 (বেগে প্রস্থান)

(মন্ত্রী বৈশম্পায়ন এবং প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

বৈশ—(করযোড়ে দণ্ডায়মান)

রাজা—মন্ত্রীবর ! রাজ্যের সমস্ত কুশল তো ?

বৈশ—মহারাজ ! সর্কাংশেই মঙ্গল । জয়পুর অধিপতি বৃথাগর্বে গর্বিত হয়ে যে

মস্তক-উত্তোলন করেছিলেন, তিনিও এক্ষণে ঘোড়করে কর প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। অল্প রাজাবা বিনাযুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করেছেন। প্রজারাও মহাস্বখে আছে। মহামার, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ এ সকল নামও শুনা যায় না। সর্বুষ্টি হওয়ায় শস্যও অপরিাপ্য জন্মেছে, প্রজাদের পরস্পর দ্বৈষ, হিংসা-বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুই নাই, দস্যাদল আর হিংস্র জন্তুগণ রাজা থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, প্রজাগণ এখন নিশাকালেও নির্ভয়ে বিমুক্তভাবে স্বখে নিদ্রা যাচ্ছে। কোন বিষয়েই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নাই।

রাজা—বাজোব তুল-সমাচার শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। মন্ত্রীবব! আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করেছি, এতে আপনার কি অভিপ্রায়? দেখুন, আমার তো এই শেষ দশা, ভগবান কোনসময় কি ঘটান কে বলতে পাবে? রাণীর লোকান্তর হওয়ারাধি সর্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচ্ছি, বলতে কি তিলান্বিতকালের জন্মও আমি স্থখ নই। বল, বীণা, সাহস অনেক লাঘব হয়েছে, দিন দিন যেন ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে আসছি। কুমার নরেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক, বিজ্ঞাবুদ্ধিতেও বিশারদ হয়েছেন। আমার ইচ্ছা যে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তকরে আমি রাজকাঙ্গ থেকে একেবারে অবসর লই এতে আপনার মত কি?

বীণা—(ঘোড় করে) মহারাজ! এ অতি সংপ্রবর্তন! যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার যেমন শাস্ত্র প্রকৃতি তেমনই দয়ালু চিত্ত, বিজ্ঞাবুদ্ধিতেও বিচক্ষণ, বল-বীণা, সাহস, পবাক্রমেও অদ্বিতীয়, স্ববশেষেও অচলা ভক্তি। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন, এটি আমার একান্ত মত। প্রজারাও তাতে স্তুখী হবে। যুবরাজ প্রজাবঞ্জন করে বাজোব শ্রীবুদ্ধি-সাধন করবেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল। আমি মনেও করি না যে, দুর্জয় রিপুদল তাঁকে পরাজয় করবে, তবু কি জানি এই বিস্তৃত বাজোর অধীশ্বর হয়ে চাটুকারদলের কুমন্ত্রণায় কোন অসঙ্গত-কার্যে প্রবৃত্ত হলে পরিণামে কলঙ্কের ভাজন হতে পারেন, তখন আপনিও অশ্রুতাপ করবেন, তিনিও দুর্নামের ভাগী হবেন। আমি জানি, বটে, অল্প অল্প কার্যে চাটুকারদল তাঁর সং-প্রবৃত্তিকে কোনমতেই অসং—পথের অগ্রবর্তী করতে পারবে না, কিন্তু ভূপতিগণের—ভূপতিগণের কেন,

মহুগু মাত্রেই প্রধান শত্রু কামরিপু। এই ভয়ানক শত্রুর দ্বারা জগতে কেন, হুৱলোকৈ ও কত কত কাণ্ড সংঘটন হযেছে। দেখুন, সে ভয়ানক শত্রুদমনে অক্ষম হয়ে স্তবপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করে কেমন দুর্দশায় পতিত হয়ে- ছিলেন।—কেবল এই অদমনীয় রিপূর ছলনায় লক্ষাধিপতি দশানন সবংশে বিনাশ হয়েছেন। এ সকল তো মহারাজের অবদিত নাই।

রাজা—আপনি কি বিবেচনা করেন ?

বৈশ—মহারাজ ! অগ্রে যুবরাজকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয়গুণ্ডে আবদ্ধ করুন, শেষে বাজ্যাভিষিক্ত করবেন।

রাজা—উত্তম যুক্তি বটে। অগ্রে বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য। কুমার এক্ষণে কোথায় ?

বৈশ—দ্রাবিড় থেকে যে বিচক্ষণ পণ্ডিত বাজধানীতে আগমন করেছেন, তারই সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক-বিতর্ক করছেন ; দেখে এসেছি। (যুবরাজের প্রবেশ)

নরেন্দ্র—(প্রণাম করিয়া ঘোড়কবে) পিতঃ। আজ আমার যুগয়ায় যেতে বাসনা হয়েছে,—অমুমতি হলে মন্দুবা থেকে অস্থ আব জনকতক পদাতিক সৈন্য-লয়ে যুগয়ায় গমন করি।

রাজা—বৎস ! তুমি যুগয়ায় যাবে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, সৈন্যসামন্ত অন্তশস্ত্র বা ইচ্ছা নিয়ে যাও, এতে আমার আদেশের অপেক্ষা কি ? (যুবরাজ প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রী—মহারাজ ! তবে রাজকুমারের বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অব্বেষণে ভাট পাঠানো কর্তব্য।

রাজা—তা তো পাঠাবেই। আর আজ থেকে বিবাহের আয়োজনও কর। (রাজা মন্ত্রী এবং তৎপশ্চাৎ প্রতিহারী প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

পুষ্পোতান

(রাজা ও প্রিয়ংবদের প্রবেশ)

প্রিয়—মহারাজ আপনি যে শত শত টাকা ব্যয় করে এই সকল ফুলগাছ ভিন্ন-দেশ থেকে এনে নন্দনকাননের চেয়েও সাজিয়েছেন, এতে লাভ কি ?

রাজা—এতে কি লাভ, তা তুমি বুঝবে কি ? মনোমম পুষ্পে নয়নের ক্রীড়ি-সাধন,

চিত্তের সন্তোষ-সাধন, আর স্বাস্থ্যে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। এর চেয়ে লাভ আর কি আছে ?

প্রিয়—(পদচারণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া) মহারাজ ! ও কথা শুনলেম না, ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখলে মন খুসী হয় এও কি একটি কথা। কোথায় ফুল আর কোথায় মন ! সন্ধ্যাও ভারি। কি মজার কথা, ছোব না, দেখেই খুসী এমন মনকে আর কি বলবো মহারাজ। মহারাজ ! পেটভবে আহারিটি না করলে হাজার শৌক হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুসী নন। (উদবে গাত দিয়া) দেখুন, এই উদর এই অর্থভাগ্য, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না ফুলেও মন খুসী হয়, চক্ষুর প্রীতি—জন্মে তবে রাজারাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না। তা যাই বলুন মহারাজ ! ও সকল ফুলগাছেব চেয়ে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, লিচু আর সাককচূণ গাছ হলে, বড় আনন্দের বিষয় হত। আহা ! যদি এই সকল গাছই থাকতো তাহলে কি শর্মারাম কক্ষপেটে খালিহাতে ফিরে যান ? (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

রাজা—ওহে সে সকল গাছও তো আছে।

প্রিয়—আছে তো বটে, কিন্তু কাজে পাই কই এ বাগানে যেমন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এসে পড়েন, সেও তো আপনারই বাগান, কই জন্মাবচ্ছিনে তো একদিনও পদার্পণ করতে দেখলুম না। তা সেখানে যাবেন কেন, ফুলগাছই যে আপনারে খেয়েছে।

রাজা—বয়স্ক। দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গিতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধুগন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে। (নিকটস্থ শিমুল বৃক্ষ হইতে কোকিলের স্বর)

প্রিয়—(চমকিত) ও কি ডাকে ? মহারাজ ! ও কি ?—

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আরে ভয় কি ? ও যে কোকিল। বসন্তকালের কোকিলের ডাক শুন নাই ?

প্রিয়—(নিতান্ত আগ্রহে) মহারাজ ! অল্পগ্রহ করে যে গাছে ডাকছে, সেই গাছটি আব পাখিটি আমায় চিনিয়ে দিন।

রাজা—(অঙ্গুলির দ্বারা দর্শন) এই দেখ, শিমূলবৃক্ষ দেখেছ, যার পুষ্প সকল
প্রস্ফুটিত হয়ে লোহিতবর্ণ সূর্য্যকেও লজ্জা দিচ্ছে ; সেই বৃক্ষের দক্ষিণ-
শাখায় বসে পাখিটি ডাকছে । দেখেছ ?

প্রিয়—(আনন্দে রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া)—দেখেছি দেখেছি, ও তো দেশী-
কাক মহারাজ !

রাজা—(ঈষৎ হাস্ত করিয়া) কাকট বটে ! তোমাকে সাক্ষাৎ গচম্পতি বললেই
হয় । যাহোক ফলফুলে সমস্ত বৃক্ষ কেমন মানিয়েছে । বসন্তকালটি কি
মনোহর !

প্রিয়—মহারাজ ! এইসব দেখে আমারও মন যেন খসুই হলো । আমি আর
থাকতে পারি না অল্পমতি করেন তো একটা গান গাই ।

রাজা—আচ্ছা । তাতে আর আপত্তি কি ?

প্রিয়—(গানাবস্ত)

গাগিনী জংলা—তালস্বং

কোথায় রহিল আমার যতনেব ধনবে ।

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

তাবে নারে নাবে বে !

মনে হলো না । পেটে কিছু নাট চাই মনে হবে কি ?

—সে যতনেব ধনবে ।

যার লাগি ঘর ছাড়ি,—

রাজা—হে নটবর ! ব্যাপার কি ?

প্রিয়—কত কিছুই নয় ।—

যাব লাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইবে ।

হেবিষে কুস্তম্বন, মন হল উচাটন,

কোকিলেব স্বরে প্রাণ, আর—

মহারাজ ! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদর খালি রয়েছেন, এতে কি আর গান

মনে হয়, ক্ষুধা হলে কথা আড়িয়ে যায় তার আবার গান—

রাজা—না—না বেশ হয়েছে । অতি উত্তম হয়েছে । চমৎকার গেয়েছ ।

প্রিয়—আমিও ভালই গেয়েছি। আপনি এর অর্থ বুঝেছেন ?

রাজা—বুঝবো না কেন ?

প্রিয়—না, আপনি কখনই বুঝতে পাবেন নি, যদি এর অর্থ বুঝতেন তাহলে কি আর এই সুখসময়ে দ্বী-বিহীন হয়ে একা থাকতেন ? আমি বৎসরাবধি বলছি যে, মহারাজ বিয়ে করুন—বিয়ে করুন। আপনিও স্থখী হবেন, শর্মাও পেটটি পুরে আটারটি করবেন।

রাজা—তুমি পাগল হয়েছ। আমার কি আর বিবাহের সময় আছে। নবোদ্র পূর্ণ-বয়স্ক হয়েছেন, তাবই বিবাহ দিতে মনস্ত কবেছি। এতেই তো তোমার আটারেব ঘোগাড় হচ্ছে।

প্রিয়—সে তো গডানই রয়েছে। ছেলে থাকলেই বিয়ে দিতে হয়। দশদ্বার আশীর্বাদও লইতে হয়। আপনি বিয়ে কললে ছাই মনেও হয় না। একেবারে ছক্কাপাঞ্জা মেবে নিতুম। রাজ্য বিধে খেতে খেতেই যুবরাজের বিয়েব পালা আসতো।

রাজা—না হে। আব বিবাহ করতে বাসনা নাই। এ বয়সে বিবাহ কবলে দেশ-শুদ্ধ লোকে আমায় নিন্দা কববে।

প্রিয়—ফেলে বাখুন নিন্দে কার নিন্দা কাব কাছে। আপনি বাঁচলে—বাপমায়ের নাম—লোকেব নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকেব মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগে। আজকাল ষথার্থবাদী উচিত বক্তা কে আছে মহারাজ ? যিনি একটু মাথা তুলবেন, রাজ্যবিধি খাটাতে হবেনা, শাসনদণ্ডেব সাহায্য লইতে হবে না। সেউ খেউ খেউ, হেউ হেউ এবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভার এ-শর্মার।

রাজা—তাতো মানলেম। বয়সেব কি ? এ বয়সে কি আব বিবাহ সাজে ?

প্রিয়—সে কি মহারাজ ? বলেন কি ? কিসের বয়েস ! আপনার চুল পেকেছে ? কই ? আমি তো একটিও পাকা দেখতে পাই না। একটিও তো কাল হয় নাই। যেমন সাদা, তেমনি শব ধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন ? কিসেব বয়েস ? আপনার যে বয়েস এর চেয়ে কত অধিক বয়েসে কতশত লোক বিয়ে করে বংশরক্ষা করছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে, দ্বীমলে ঘরশূন্য হয়। আপনার কোটাঘর বলে কি আর শূন্য

হবে না ? আমি ষোড়হাতে বলছি মহাবাজ বিয়ে করুন । আপনিও স্ত্রী হবেন, গরীব বামুনের ছেলেও পেটভরে খেতে পাবে ।

রাজা—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওহে, মনে কর যেন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা হতো, উপযুক্ত পাত্রী কোথা পাবো ?

প্রিয়—মহাবাজ কি কথাই বললেন, হাসী রাখবার স্থান আর নাই । ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকলে বুদ্ধির স্থির থাকে না । মহারাজ যত্ন করলে কিনা হয় ? যত্ন করে লোকে সাগর থেকেও মণিমুক্তা তোলে, আর একটা মেয়ে পাওয়া যাবে না ? এতো তুচ্ছ-কথা । আর মহাবাজ ! চিবকালটা রাজা-রাজড়ার সহবাসেই কাটালেম, আপাগোড়া বেঁধে বডলোকের কাছে কথা বলতে হয়, তা আমি বেশ জানি । শর্মা কি তাব যোগাড় না করে প্রকাশ করেছেন ?

রাজা—কি রকম যোগাড় ?

প্রিয়—মহারাজ ! অতাব কি ? আপনাব যে ষাণী মবে গেছেন অবিকল সেই রকম মেয়ে পাওয়া গেছে বরং তার চেয়ে সবস বড় নিরস হবে না ।

রাজা—তবু কোথায় ?

প্রিয়—মহারাজ ! মনে পড়ে ? সেই আপনি একদিন নগর ভ্রমণে আমার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্মরণ হয় ? আমি কত-কৌশলে আপনাকে দেখিয়েছিলুম । আপনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থিরভাবে দেখতে দেখতে বললেন, এই কমলটি প্রস্তুতিত হয়ে যে মহাত্মার হস্তে পড়বে, তিনিই জগত স্ত্রী, তারই জীবন সার্থক । মনে পড়ে ?—ঐ যে—

রাজা—হাঁ হাঁ মনে হয়েছে । সে কি রকমে হবে ?

প্রিয়—হা ! হা ! কি রকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ-রাজেশ্বরের মাথায় নাই । হায়রে গৃহলক্ষ্মী, মহারাজ ! আপনি অগমতি কলনে আবার হবে না, অধীনে থেকে তার এত ক্ষমতা যে মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবে না ?

রাজা—মহারাজ হলে কি হবে ? তার বয়স অতি অল্প, তার মা, বাপ স্বীকার হবে কেন ?

প্রিয়—মহারাজ বুঝেছি । আর বলতে হবে না, মাতৃ-পিতৃ-বিশোগে আজীবন

দুর্দশা—রাজ-মন্তক স্ত্রী-বিশোগ ভাবে অবনত । বুদ্ধির বিপর্যয় । হায়রে

লক্ষ্মী! হায়রে গৃহলক্ষ্মী! গৃহভূষণ। কি পরিতাপ, কি পরিতাপ, রাজা
বীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম মহারাজ। আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেন
কি? প্রস্তাব মাত্র সম্মত। যদি না হয় তবে এ গলার এ সাদাস্ত আর
গলার রাখবো না চিঁড়ে অগ্নিদেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।

রাজা—তবে তুমিই কেন ঘটকালি কর না? ঘটকালি পাবে।

প্রিয়—(হাত মুখে) মহারাজ। আমি কিছুই চাই না। আমি আপনার (পেটে
হাত দিয়া) এই হলেক্ট হয়।

রাজা—আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয়—তবে শশা বায় চলেন। প্রস্থান।

রাজা—(স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। এ দিকে প্রিয়ংবদও
আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। কি কবি প্রিয়ংবদ কৃতকার্য্যই হয়; তবে বিশেষ
গোপনে এ কাণ্ড সম্পন্ন করা চাই। এ বয়সে আর লোক জানাজানি করে
আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এ দিকে
ঘটে যায়, তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জল কোথায়
গড়ায়, কাঁব মেয়ে তার জীবনের ভাব হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে
বিষে দেবে। কপালে কি আছে বলা যায় না। (প্রস্থান)

তৃতীয় রক্তভূমি

(ভোজপুর; বসন্তকুমারীর—বাসগৃহ)

বসন্তকুমারী—(শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) হায়! কোথা গেল?
এত কথা, এত ভালবাসা, এত প্রেম, শেষে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয়
—প্রাণ ঝারিয়া ফাঁকি! কি নিষ্ঠুর। কি নিষ্ঠুর। না—না তাই বা বলি
কিসে? ধর্ম সাক্ষী করে কণ্ঠহাব বদল হয়েছে, (হারের প্রতি চাহিয়া)
একি? কি সর্বনাশ! এ কার হার? এ হার কার? এ যে আমারই হার।
কথা কি? হায়! হায়! এব অর্থ কি? না না আমি দেখলাম কি? একি
স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তাঁর গলায় হার
পরাইয়াছি। তিনি ও তাঁর গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন।
সে হার কই? এ যে আমারই হার। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া) এই যে

আমারই হার আমার গলায় এ হার কেন ? তবে কি যথার্থ ইশ্বর না চিত্ত-
বিকার । অসম্ভব ! সম্পূর্ণ অসম্ভব ! আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না ।
আমাব চক্ষুও বন্ধ ছিল না । আমি স্পষ্ট দেখেছি, কথা বলেছি, কথা
ভুনেছি ; কাছে বসেছি, স্বপ্নে কি এত কথা হয়, এত ভালবাসা জন্মে,
আর এত ভাল দেখায় । হা ! নাথ ! কোথা গেলে ?

(বসন্তকুমারীর পশ্চাদ্দিগে দাব দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান)

হার হায় ! এমন কথা সকলি মিছে হলো । সত্য সত্যই কি স্বপ্ন ? (কণ্ঠ-
হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আমার গলায় পরবে না, না তা হবে না, হার
আমাব যত্নেব, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল, স্পর্শ-
শুণে হারও পবিত্র হয়েছে, এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব । (হার
আনিয়া পুনরায় কণ্ঠে দাওন এবং পৃষ্ঠবৎ উপবেশন) আমার একি হলো !
আর সহ্য হয় না । কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে ? কেন প্রাণ কান্দিয়া উঠে ।
একি জ্বালা ! হায় ! হায় ! কেন চক্ষু— অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘমালা

অতি সাবধানে বসন্তকুমারীর পশ্চাদ্দিগে ফাইয়া দুই গুলে চক্ষু আবরণ)

বসন্ত—(চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালা শু দু-খানি পায় ধরি, অবলা বাল্য,
অন্তরে আব আঘাত দিও না । —নাথ ! আমি বালিকা এ চাতুরীর মর্শ্ব
কি বুঝবো । (মেঘমালা বসন্তকুমারীর চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে আগমন
বসন্তকুমারীর—বোধ, ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ-লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)

মেঘমালা—(মিকটে বসিয়া)

ও সখি কেন কেন অধোবদনে ।

কি কথা হল কাবঠ মনে ॥

ছল ছল দুটি আঁখি,

ভাবিছ কি বিদুমুখী,

বল, বল, প্রাণসখী ।

কি আছে মনে ॥

(চিবুক ধরিয়া : ও সখি ' কেন অধোবদনে, কি হয়েছে ? সহি । তোমার
দু-খানি পায় ধরি, বল কি হয়েছে । (পায়ের ধরিতে উত্তত)

বসন্ত—আমার কিছু হয় নাট । আমি তোমার পায় ধরি, তুমি আমার মাথা

খাপ, আমাকে বিরক্ত করো না ।

মেঘ—কি বিরক্ত কললুম ভাই ? বিরক্তেব মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি ।

আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে ? এতেই কি বিরক্ত করা হলো ?

বসন্ত—(বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান শুনতে ইচ্ছা করি না । কথা শুনতে ভালবাসি না । • তোমার পাখ ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর—বক্ষা কর ।

(পূর্ব-বক্ষিণী প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া ষোড়কবে)

পূর্ববক্ষিণী—মহাবাজ আপনাকে দেখতে আসছেন ।

বসন্ত—আসছেন ভালই । (রাজা বিজয় সিংহের প্রবেশ ও পূর্ব-বক্ষিণীর প্রস্থান ।

বসন্তকুমারী, মেঘমালা উভয়ে শশবাস্তে উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং নত-শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা—(বসন্তকুমারীর প্রতি) মা ! আমি তোমার দাসীর মুখে শুনলেম, কি অসুখ হয়েছে মা ?

বসন্ত—(মুহূর্তের) আমার কোন অসুখ হয় নাই ।

মেঘমালা—(নম্রভাবে) অসুখ হয় নাই কি কথা ? যা কখনও দেখি নাই তাই দেখছি, একি অসুখ নয় ?

রাজা—(মেঘমালায় প্রতি চাহিয়া) মা কি দেখেছ ? অসুখের কি লক্ষণ দেখলে মা ?

মেঘমালা—আপনি সখী, মুখের ভাব, কথাব আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি বুঝতে পাচ্ছেন না । আমার কথায় বিরক্ত, আমাকে মনের বলি ? একি দেখতে অনিচ্ছা—ইহাতে কি বলি ? একি মনের বিকাব নয় ? একি অসুখের লক্ষণ নয় ? বিপদের আশঙ্কা নয় ?

রাজা—(বসন্তকুমারীর আপাদ-মস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন) মা তুমি আমার সর্বস্ব ভোজ্যপুত্র রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মণি, মা ! বার্থ কথা বলা তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

বসন্ত—(মহাবাজের পাখ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ । আমার কোন অসুখ হয় নাই ।

রাজা—কোন অসুখ হয় নাই, তবে একি মা ? তোমার চক্ষে জল কেন ? তোমার মুখ মলিন কেন ? তোমার সেই একপ্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির-মন কেন মা ? তোমার অভাব কি ? তুমি আমার একমাত্র কন্যা, এ-রাজ্য, ধন, সকলি তোমার । তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসবে কেন মা ! আমার যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘমালায় কথায় আর নাই । মা । তোমার মনের কথা বলো । কোন দাসী কি অল্প কেহ তোমাকে কিছু বলে থাকে, কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, বল । এখনই তাব সমুচিত শাস্তি বিধান করছি ।

বসন্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ ! আমার কোন অসুখ হয় নাই । আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই । কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই । আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই । (ক্রন্দন) ।

রাজা—মা ! বৃদ্ধ বয়সে আর আমার অন্তরে ব্যথা দিও না । মা । তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্টভাবে বল । যে প্রকার অসুখই হয়ে থাকে গোপন করে না । মা । আমি তোমার পিতা, আমার কাছে মিথ্যা বলিলে মহাপাপ । তুমি অবোধ নও, মনের কথা বল । বৈজ্ঞ, গণক, রাজপুত্রীতে সকলি উপস্থিত আছেন । কোনপ্রকার লোকের অভাব নাই এই মুহূর্তেই তাহা-দিগকে আনিয়া তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি ।

বসন্ত—পিতঃ ! আমার কোন পীড়া হয় নাই । বৈজ্ঞ, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই । আমার কোনপ্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই । আমি—
(ক্রন্দন)

রাজা—(সজল নয়নে) হা ! এ পুরীষ আর মঙ্গল নাই । বাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে ; (মেঘমালাকে সঙ্গেতে ডাকিয়া মুহু মুহু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, উন্মাদের পূর্ব-লক্ষণ ।

মেঘ—আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না ।

রাজা—মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হয়োনা । আমি মন্ত্রীসহ পরামর্শ করে বৈজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ, বোজা সংগ্রহ করে এখনি আসছি । সাবধান বসন্তের কাছছাড়া হয়োনা । মা । আমার বসন্তের কেউ নাই । (রাজার প্রস্থান)

মেঘ—সই ! সেধে সেধে গান শুনেছ । কত মাথার ক্রিরে দিয়ে কথা বলি-

য়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে চাচ্ছি তুমি শুনবে না!

একি কথা? আর সখী! আমি তোমার বাল্যকালের সখী, আমার কাছে

এত গোপন কেন? কি হয়েছে?—কার জন্তে এত,—

বসন্ত—দেখ ভাই! আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন-

কথা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

মেঘ—আর একটি গান কবছি।—

বসন্ত—না সখী। আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো—

(হাসিতে হাসিতে বসন্তকুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ—ওলো! তোব আবার কি হলো! এনে হাসি কেন? হতভাগিনী স্থির হয়ে

কথা বল, কথা নাই বার্তা নাই শুধুই হাসি। কথাটি কি।

দাসী—(পুনরায় হাসি)

মেঘ—(দাসীর হাত ধরিয়া) খেপি! আবার হাসবি তো মার খাবি। রাজ-

কুমারীর অস্থখ, তোর হাসি ধবে না।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) ঐ অস্থখের জগুই তো গণকঠাকুর গণে বলেছে।

রাজদরবারে কি কমলোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন,

মন্ত্রীরা মুখে কথা ছিল না। এখন সকলেই হাসিখুসিতে আছেন।

মেঘ—আরে! ভেঙ্গে বলনা আমিও একটু স্থস্থির হই। সখীকেও স্থস্থির করি।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) না না আমি বলতে পারবো না।

মেঘ—(কৃত্রিম-বোবে) তোকে বলতেই হবে। বলবি না?

দাসী—কিন্তু কানে কানে অথচ একটু সরে গিয়ে।

(মেঘমালার কানে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ—সখী! জ্যোতিষ-শাস্ত্র বড় কঠিন! কোনকথা গোপন রাখবার ক্ষমতা

নাই। সাতপুরু চর্ম-মাংস-অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিষে প্রকাশ করে।

ধরা পড়েছো, আর বলব কি? মনের কথা আমাকে বললে না। এখন

রাজসভায় কথা ভাঙ্গচুর হচ্ছে।

বসন্ত—(মৃদুস্বরে) কি কথা সখী? কি কথার ভাঙ্গচুর হচ্ছে বল!

মেঘ—তুমি বললে না! আমি বলব কেন?

বসন্ত--তখনও পায়ে ধবেছি, এখনও পায়ে ধরছি বল ?

মেঘ--তুমি আমার সখী! প্রাণের সখী বলছি। ভেঙ্গেচুরে বলাছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত--না--না বিলম্ব সহ্য হয় না--এখানি বল !

মেঘ--আব কি "ফুল ফটিল" !

বসন্ত--ও কি কথা ? যাও ! আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। কিসের ফুল ফটিল ?

মেঘ--যে ফুল কুঁড়ি ছিল গাছ ফোটা-ফোটা হয়েচে শীঘ্রই ফটবে চিন্তা নাই ; ও দিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত--তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি শুনব না।

মেঘ--আব বাকি বাথলে কি ? আচ্ছা আমি চললেম। ষাটতেই বসন্তকুমারী মেঘমালাব বস্ত্র ধারণ আব প্রদর্শন কেন গণকে গুণে বলেছে স্বয়ম্বব সভাব ঘোষণা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে এখনও মন ভাল হয় নি--(মেঘমালা ষাটতে উগাত বসন্তকুমারী মেঘমালাব বস্ত্র ধরিয়া উভয়ে প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

পঞ্চমধ্য

(কল-কলস কক্ষে সন্ধ্যা, এবং অগ্নিদিক হঠতে বিমলার প্রবেশ)

সন্ধ্যা--দিদি ! ভাল আছিস তো ? আজ যে তারি ফিটফাট। সেজেগুজে কোথা গিয়েছিলে ? আবাব কি দিন ফিরেছে ?

বিমলা--(হাস্তমুখে) তুই যে অবাক কললি। দিনকাল নেই বলে কি সাধ নাই ? দাঁত পড়ে, চুল থাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা কববে বলে বুড়িরা ছুঁড়িদের মত সাজগোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সন্ধ্যা--দিদি ! কাঞ্চনের তো কিছু হয় নাই ?

বিমলা--(মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সন্ধ্যা--ক-মাস হলো ?

বিমলা--এই সেদিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা—ও মা ! সেদিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল !

বিমলা—এ কালে ছুঁড়ি-বুড়ি কিছুই চেনা যায় না । আব এক কথা শুনেছ ?

সরমা—কি কথা দিদি ?

বিমলা—বলবো কি কিছু, কিছাঁদন হলো, শুনেছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন ।

সরমা—হাঁ, আমিও শুনেছিলেম ! দিদি ! যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নাই । রাজারাজডাব ঘরের ছেলে যে এমন লাঞ্ছক হয় তা বোন কখনও শুনিনি । পাড়াপড়সাঁব মেয়েগুলো নজ্জবে পড়লে অমনি মাথাটি হেঁট কবে চলে যান । এত বড় হয়েছেন, তবু উচু-নজ্জবে কারো পানে চান না ।

বিমলা—সে যাহাঁহোক, আমবা পাড়া' পাড়া' যুবরাজের বিয়ের কথাই বলাবলি কবতুম, সকালই আশা কবে বয়েছি যে যুবরাজের বিয়ে দেখবো । এব মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনেলেম, মহারাজ আপনিই বিয়ে করেছেন ।

সরমা—(আশ্চর্য হওয়া অবাক) বলিস কিবে ? (জল-কলস কক্ষ হইতে নামাইয়া) দিদি ! বলিস কি ?—মাঠবি ? বুড়ো বাজা' বিয়ে হয়েছে ?

বিমলা—আমি কি মিছে কথা বলছি ?

সরমা—মাগো কোথা যাব ! আমবা তো কিছুই টের পাঠনি । যুবরাজের বিয়ে হবে তাই জানি । এব মধ্যে বুড়ো' বিয়ে হয়ে গেল । দিদি ! তুই যা বললি যথার্থ । একালে বুড়ো' শু চেনা যায় না, ছেলে' শু চেনা যায় না ; কই, বাজবাড়িতে শু তো কোন ধুমধাম হয়নি !

বিমলা—এ কাজটি চুপেচুপে সারা হয়েছে । বুঝলামে বিয়ে করতে অবশ্যই কিছু লজ্জা হয়, সে' বিবেচনা করেই বোধ'য় কাকেও জানান নি ।

সরমা—(মুখভঙ্গ্য করিয়া) কি লজ্জা ! আরে আমার লজ্জা ! বিয়ে কবে ঘরে আনতে পারলেন, তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানলেই লজ্জা হতো ; একথা গোপন থাকবে কিনা ? হি হি ! মহারাজ বড় অগ্রায় কাজ করেছেন । এই বয়সে লজ্জার মাথাখেঁচে বর' সাজলেন কি করে ? চুলে, গৌফে বুনি কলপ দিয়েছিলেন ? হি হি ! বড় লজ্জার কথা !

বিমলা—আরো শোন ! আরো মজা আছে । সেইদিন শুনে নতুন রাজবানী দেখতে বড় সাধ গেল, তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি ।

দেখতে বড় সন্দেহ। এলোচুলে বসে সখীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সে দিকে তাকাচ্ছেনও না। নাক, কান আব সেই জোড়াভুরুতে মুখখানি চতুর্দশীর চাঁদের মত দবদব কবছে। ঠিক ভুঝর মাঝখানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন থেকে থেকে চাঁদের আলো ফুটে সেইটি যেন তারার ত্রায় টিপটিপ করছে। চক্ষের ভাবভঙ্গি আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোট দুখানি জবাফুলের মত লাল, দাঁতগুলি বড় পরি পাটি, কথাও বড় মিষ্টি বয়স অতি অল্প,—এখনও চোদ্দ পেরোয়নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায় নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটি হতো, তা হলে স্ত্রের সীমা থাকতো না। যেমন বর, ঠিক তেমনি কনে মিলে যেতো।

সরমা—ছি ছি! রাজাকে বিয়ে করতে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা—রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগলা গোছেব বামুন থাকে, সেই নাকি এর ঘটক।

সরমা—তার কি? সে পেটপুরে খেতে পেলোই বড় খুশী। বাজার তো চোখ ছিল?

বিমলা—চোখ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়; তা তো আগেই বলেছি।

সরমা—দিদি! রাজার বিয়ে করতে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছুদিন খুঁজে একটি বড়মেয়ে দেখে কেন বিয়ে কললেন না? এ বিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়সে অমন মেয়েকে বশে রাখা বড় ছোটকথা নয়। শত শত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, বয়সের মিল না হলে কোনকালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো! রাজা আমাদের নতুন বোয়ের মন যোগাতে যোগাতে একেবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠবে না। রাজাই হন, আর প্রজাই হন, যুবতী নারী ঘরে পুরে মুখফুটে বলতে পারবেন না যে, আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসে। যিনি একথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা—সত্যি কথা, বুড়ো বয়সে কখনই সোমন্ত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বুড়োরা কত করে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? শুধু কথায় কি হয়! পোড়া কপাল! কথা বলতেও থুথু পড়ে।

(দুবে যুবরাজ নবেন্দ্র ও শবৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা—চুপ কব দিদি ! চুপ কব ! ঐ যুবরাজ আসছেন । মন্ত্রীপুত্র শবৎকুমারও সঙ্গে আছেন । আমরা যে সকল কথা বলাবলি কবোঁছি, বোধহয় আড়াল থেকে ওরা সকলই শুনেতে পেয়েছেন ।

বিমলা—(পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি কয়িয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রস্থান, সরমা ও জল-কলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

শবৎ—যুবরাজ ! শুনলেন তো । পাড়ার মেয়ে দুটি কি বলে গেল । শুধু আমিই যে বলি, তা নয়, মেয়েবাও মহাবাজকে ধিক্কার দিচ্ছে । বাজ্যের অপর-সাধাবণ সকলেই মহারাজের নিন্দা করছে ।

নরেন্দ্র—মিত্র ! শুকজনের কথায় কথা কওয়া আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবশ্যই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই পুনরায় দাবপরিগ্রহ করেছেন ।

সামান্যলোকে তাব ভাব কিসে বুঝবে ? আব আমরাই বা কি বুঝতে পারি ?

শবৎ—না—না—আমি যে কেবল বিবাহের জন্তেই বলছি তা নয় । দেখুন ! অমাত্যগণ, সভাসদগণ, প্রজাগণ, সকলেই মহাবাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, মহারাজ মাসাবধি বাজকাষ একেবারে পবিত্যাগ করেছেন । প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তো সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় না । সিংহাসন শূন্য থাকলে যে বাজ্যের কি দশা ঘটে, তা বুঝতেই পাচ্ছেন, দুজনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দোরাআ করে তাদের সর্বস্বান্ত করছে । কাম্ভচারীরা খোলা মহল পেয়ে, দেদার লুট আরম্ভ করছে । প্রভু প্রকাশ করতে কেহই ক্রটি করছে না । প্রজাগণ কাতব হয়ে, বিচারের প্রার্থনায় রাজবাটিতে প্রত্যহই আসছে ; সমস্তদিন অনাহারে থেকে স্নানমুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে । বিশেষ অসুস্থস্থানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধসজ্জার উপক্রম করছেন । 'রাজা সর্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা বাণীর মন্দিরে থাকেন, রাজকাৰ্যে মনযোগ নাই ; দেশে দেশে এই ঘোষণা হয়েছে । অত্যাচারী রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ করছেন ।

নরেন্দ্র—মিত্র ! এতদূর হয়েছে ? —আমি এর কিছুই শুনেতে পাইনি । শুনবোঁই বা কি করে ? আমি তো প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলেম না ।

শবৎ—বডই অজ্ঞায় হয়েছে ।

নরেন্দ্র—প্রধানমন্ত্রীবব কেন এ সকল বিষয় বাজাকে জানান না ? •

শব্দ—মহারাজ সর্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কারো অধমতি নাই ।

নরেন্দ্র—তবেই তো বিভ্রাট । (কয়েকজন প্রজাব প্রবেশ)

প্রথম প্রজা—বলি ও বেয়াই ! বাজাবেটা বুড়োকালে বিয়ে করে একে বাবে যাচ্ছে-
তাই হয়ে গেছে । দাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে, আর কানন আসবো, প্রত্য-
হই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বোঝায় না, না বিচার করবে কি ? যেতে
আসলে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল । প্রতাহ দিনেববেলা না খেয়ে থাকতে
হয়, আর বাচি না । বেটা উচ্ছ্রের যাক, এমন মাগী-পাগলা বাজাব যাচ্ছে
কি থাকতে আছে ? সে মাতিষ মেয়েমাতিষের গোলাম সে কি মাতিষ ?

দ্বিতীয় প্রজা—ওহে ! তুমি বুঝতে পারো নি, রাজা কি মাদে ও বকম হনোছেন ?
রাজা বুড়ো, বাগী কঁটা, একেবাবে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কাজেই পাগল
হনোছেন । বুড়ো বয়সে যিমে কললে সকলোই ঐ দল হনোছে । তুমিও তো
কিছু কিছু বোঝ ?

প্রথম প্রজা—এতনা ।

দ্বিতীয় প্রজা—বডলোকে আর ছোটলোকে অনেক তফাত ।

প্রথম প্রজা—যাবে ভাই খাম আমবা বাজাব মত পাগল নষ্ট । মোনার চাঁদ ছেলে
থাকতে নিজে বিয়ে করে বসলো । পাগলেও এমন করে না । বডমাচনের
দোষ নাই, আমাদের ডোমলোকে ব মবে হলে চাকচোলে কাটি বাজতো ।

দ্বিতীয় প্রজা—ঐ জগেই তো বলছি, বডলোকে যা করে, তাই শোভা পায় ।
(বাজপুত্রকে দেখিয়া) বেয়াই ! এইবাবেই গেছি ; আমবা যা যা বলেছি
সকলই বাজার ছেলে শুনতে পেয়েছে । (সভয়ে কম্পিত কলেবরে সকলের
প্রণাম)

নরেন্দ্র—বাপুসকল ! তোমরা কোথা গিয়েছিলে ?

প্রথম প্রজা—কর্তা ! আমরা বাজার-দববারে নালিশ করেছি, কাবও এক মাস,
কারও দু'মাস যায়, তবুও বিচার হয় না । শুনতে পাই যে' তিনি অন্তরে
আছেন । বোজ রোজ হাঁটাইটি করে আমরা সারা হলেম । সারাদিন
না খেয়ে এই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমাদের দুঃখের সীমা
নাই । আপনি রাজা হলে আমরা বাঁচি ।

নরেন্দ্র—বাপুসকল ! (হস্ত বাঁড়াইয়া) আমি এই কয়কটি টাকা দিচ্ছি, তোমরা
জল খাওগে !

প্রজা—(হস্ত বাঁড়াইয়া টাকার গ্রহণ) যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয়
হউক !

(যুবরাজ নবেঙ্গকুমার ও শবৎকুমারের প্রস্থান । এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে
আপন আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিতে বান্ধিতে গান)

এমন বিচাৰক রাজ্যের রাজ্যে মবি অবিচাবে ।

আমাদের ভাই সাধা নাই,

আমরা রাজ্যের কাছে যাই,

বলি সব মনের কথা তুটি পাশ ধবে ॥

বিড়াল, ককুর, শৃগাল মত, বধে প্রাণ বসব কত,

জোবে ধবে নিশে কার সন্ধান কবে ॥

আমাদের বক্ষা তেতু, আছে যত ধুমকেতু

মন যোগালে মনের মত পোলে তারা সকলি পারে ।

যার যা ইচ্ছা সে তাই কবে,

ওবে ! রাজা থাকতে প্রজা মবে, হায় ! হায় !

এ দুঃখের কথা আমরা বলি কালে ॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম বন্দুয়ি

তন্দ্রপুৰ ; বেবতীর শয়ন-মন্দির

(বেবতী ও মালতী আমন)

বেবতী—(হস্তে দর্পণ লইয়া) মালতী ! দেখ দেখি, আজ কেমন বেশ করেছি ।

ভাল হয় নি ?

মালতী—বেশ হয়েছে ! রাজা একেই পাগল হয়েছেন, আবার এই নূতন সাজ-
গোজ দেখলে ঘর থেকে আর নড়বেন না । বাছা ! তুমি আচ্ছা মেয়ে
জন্মেছিলে । রাজা বীরেন্দ্রের নাম শুনে ভয়ে মাটি কঁপে উঠে,
সে বীরকে একেবারে নাটি করে ফেলেছে । সাবাস মেয়ে জন্মেছিলে !

বেবতী—(দর্পণ ফেলিয়া) রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেন নি। তিনি আমায় না দেখে এক নিমিষ স্থির থাকতে পারেন না, কিন্তু আমার তা নয়, সে মুখ নজবে পড়লেই যেন গায়ে ঝেঁটার-বাড়ি পড়ে। মন ঘরে ভালবাসে না, চোখ বাবে ভালবাসবে কেন? এ তো আমারি চোখ।

মালতী—এদিকে তো বড় মিল দেখা যায়।

বেবতী—তুই যেমন মিল দেখতে পাস, কিসের মিল? হেসে হেসে ছোটো মিষ্ট-কথা বলি, তাতেই কি মিল হলো? মুখে মিল থাকলে কি হয়, মনে যে মেলে না।

মালতী—মিল করতে কতক্ষণ লাগে? কললেই পাবে!

বেবতী—পোড়া কপালি! তুই কিছুই বুঝিস নে, মিল কি কথায় হয়? মনে মনে মিললেই তবে মিল হয়। বলতে হাসিও আসে, কান্নাও পায়, তার সঙ্গে আমার মনের মিল কেন হবে? তাব যৌবন-অবস্থা মধ্যম-অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে; আমার অবস্থা, তো দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমিই বা তাকে ভালবাসবো কেন? মণিমুক্তা আর ভাল ভাল গয়না, ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক। তবে মা বাপে জীব করে ধরে রাজবাণী করে দিয়েছেন, ভেবেছেন আমি স্বামী হলে তাঁরা সুখে থাকবেন, তাঁরা ভাগ্যবন্ত হবেন, রাজার কুটুম্ব বলে সমাজে আদর পাবেন, বাবা মহারাজের খণ্ডর, নিজ-ক্ষমতাতেই উচ্চাসনে বসে চারপাশে নজর করবেন, মনে ভাববেন যে, সকলেই আমাকে নজর করে। মা তো একেবারে আফ্লাদে আটখানা হয়েছেন, বাজার শান্তডী হয়েছি, আর ভাবনা কি? সকলেই সুখের ভাগী হলেন, হত-ভাগিনীই কেবল চিবড়ুখিনী হলো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মালতী! আমি যে যাতনা ভোগ করছি, তা সেই ভগবানই জানেন? অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাই হয়েছে, তা বলে আর দুঃখ কললে কি হবে?

মালতী—রাজমহিষী! আর দুঃখ করো না! কেবল আপনারই যে ওরকম

হয়েছে, তাও নয়, অনেকেরি এই দশা ?

বেবতী—না—না—আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি যেমন জন্মিছি, শত্রুও যেন এমন না জন্মে।

মালতী—তা যাই বল, রাজা কিন্তু তোমায় বড় ভালবাসেন, প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন। শুনেছিলাম, যুবরাজকে এক মুহূর্তও চক্ষের আড়াল করতেন না, তোমায় বিয়ে করে অবধি তাঁকে মনেও করেন না, একটাবার নামও করেন না।

বেবতী—(বাস্তবের চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) মালতী! ভালকথা মনে করেছি। নবব্রতকে যেকথা বলতে বলেছিলুম, বলছিলি তো ?

মালতী—তুমি যে কথা বলতে বলেছিলে, আমি তাব দর্শণে বাড়িয়ে বলেছি, তিনি শুনে দুটি চক্ষু পাকল করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি সেই-ভাবে, ভক্তি দেখেই পালিয়ে প্রাণরক্ষা কলনৈম। মাগো! ও আমার কাজ নয়।

বেবতী—(চক্ষু হঠাৎ জল পতন) এখন চক্ষে জল পড়ছে, যখন যুবরাজকে একদৃষ্টে দেখেছিলি, তখন আগপাছ ছিল না। মালতী! যুবরাজকে সেই অবধি দেখে আহারনিদ্রা কিছুতেই স্থখ নাই। সর্বদাই যেন সেই কথা মনে পড়ে : তুই আজ আবাব যা, আমার এই যেন সেইকথা মনে পড়ে তুই আজ আবাব যা, আমার এই সব দুঃখের কথা ভাল কবে বোলগে ?

মালতী—না—না আমি আর যেতে পারবো না। আমার ওদর কথা বোলো না। রাজকুমারের চোখ দেখলেই ভয়ে আমার গা কাঁপতে থাকে। আমি কি আর তাঁর কাছে যাই ? গেলেই বা কি হবে ? তিনি তোমার নামও শুনতে পারেন না।

বেবতী—(দুঃখিত স্বরে) আমিই যেন তারে দেখে একেবারে পাগল হয়েছি, তিনি তো আমায় দেখেন নি, চার চোখ একত্র হলে তবে বোঝা যাবে। মনের কি ভাব, তাও জানা যাবে। হায়! পিতামাতার ষথার্থই চক্ষু ছিল না। রাজাকে চোখে দেখতে পেলেন, আর যুবরাজকে চোখে দেখতে পেলেন না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যুবরাজ! তুমিই আমার হয়েছিলে। যুবরাজ! তুমিই আমার—

(বাজার প্রবেশ)

বেবতী—(ত্রস্তভাবে চক্ষের জল মুছিয়া হাত্মবৃত্তে) এই যেতেই যে ফিরেছেন ?

বীবেন্দ্র—কেন ?

বেবতী—আবার কেন ? মাসান্তরে যদি বা দববাবে গিয়েছিলেন, মুহূর্তকাল অতীত না হতেই আবার এলেন ?

বীবেন্দ্র—প্রিয়ে ! কেন যে এলেম,—শেষে বলবো । আজ যে চমৎকার রূপ দেখতে পাচ্ছি ? আজ অমানিশা, আকাশে চন্দ্র নাই, কিন্তু আমার গৃহে একেবারে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় । আমি যথার্থই আজ তোমায় যেন পূর্ণ-চন্দ্র দেখছি । বেশ মানিয়েছে ।

বেবতী—মানিয়েছে, ভাল হয়েছে । তোমার আর সটো করতে হবে না ! আমি একটা মাতুষ, আমার আবার মানিয়েছে, ওসব পুরনো কথা ভাল লাগে না, যেতে যেতে ফিরে এলে কেন, তাই বলে ।

বীবেন্দ্র—তুমি কি পাগল হয়েছে ? দেখ কি কখনো অজ্ঞা ছেড়ে থাকতে পারে ? না ছায়াই কখনও কাষাব অন্তর হতে পারে ? অলি কি কখন নবকলি ফেলে থাকতে পারে ? দেখ প্রিয়ে ! চক্ষের কি করে স্থধাকরের পূর্ণ কলেবর হবে স্থধাপানে বঞ্চিত থাকবে ? তুমি স্নেহেও আজ ভুলছো । আর কেই বা না জানে যে বাবি বিহনে যেমন মীন বাঁচে না, তেমনি তোমা বিহনে আমি বাঁচি না । আর এও কি কখনও হয় যে, সর্বস্ব-ধন বেবতী, বীবেন্দ্র তাই নয়নের অন্তরাল করে দববাবে বসে থাকবে ?

বেবতী—যাও যাও, আব বাড়িও না, মাথা খাও, আর জালিও না । (মুহূ হাত্মে)
ও মুখে অত ভাল লাগে না । মিনতি কবে বলছি, দরবাবে যাও ।

বীবেন্দ্র—আজ আবার দরবার ? যে দরবার পেয়েছি, এব কাছে আবার দরবার ?

বেবতী—তুমি যাই কেন বল না, দেশভ্রম লোক আমাবই নিন্দা করে । তাবা এই কথা বলে, রাজা নতুন রাণীব কাছে একেবারে চাকরের মতন বয়েছেন রাণী যা বলেন, তাই করেন । ক্ষণকালও রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না । রাজকার্য নাই, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, দেখা নাই, দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই রাণীর চরণ সেবা কচ্ছেন ! ছি ছি ! বড় লজ্জার কথা ।

বীরেন্দ্র—এতে আবার তোমার লজ্জা কি ? এ লজ্জা একপ্রকার আমাকেই অর্শে ।

যাহোক, তাতেই বা ক্ষতি কি ? এমন রূপবতী সতী যার ঘরে, তার চিন্তা কি ? ছাই রাজা থাক বা যাক তাতেই বা ক্ষতি কি ? তাদের কি চক্ষু নাই, তাদের কি কর্ণও নাই,—কখন কার মুখে শুনেও নাই যে, তৃতীয়াব চন্দ্র তার ললাটেব সমতুল হতে পাবেনা । আর অনেকেই বলে থাকে যে, স্ত্রী জাতির ভ্র-ভঙ্গী দেখেই ইন্দ্রধনুঃ গগনাত্মক বসেচে, তা আমিও স্বীকার করি । এখনও যে, বৃষ্টিফলে সূর্যকিরণ পড়লেই স্তম্ভময় ইন্দ্রধনুঃ দেখা পাওয়া যায়, সেটিও যথার্থ । কিন্তু বিনা মেঘে বিনা সূর্য্যে তৃতীয়াব চন্দ্রকিরণে একেবারে যে সুগল-বামধনুঃ সজ্জা বিবাজ কচ্ছে, তা কি তাবা শুনেও নাই ? (রেবতীর নয়নের নিকট হস্ত লইয়া) এই নানের ঈর্ষাতে কুবঙ্গিনী যে বনবাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে ? এই দস্তের আভা হেবে যে দামিনী অভিমানিনী হলে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তাবু তোমার মৃদুগামিতে দস্তরাজি ক্ষণে ক্ষণে হেবে সময় সময় ক্ষণপ্রভা করে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও তো স্থির নাই । তাবা যাউ কেন বলুক না, আমি এ মুখে এ নাসার তুলনা তিলকলের সঙ্গে দিব না —হা ! সকলেই কি অন্ধ হয়েছে ? যার চিকুরেব শোভা দেখে কাদম্বিনী ভয়ে যে, কোথায় পালাবে, তারই স্থান উদ্দেশ্যে একবার পূর্বে, একবার উত্তরে, একবার পশ্চিমে, শেষে নিকপায় বৃষ্টিফলে আনন্দ শিলাচ্ছলে অঙ্গ-বিসর্জন করেছে ; যথার্থই তাবা অন্ধ । যার কটির শোভায় বাম্বাজ গরি মানভয়ে কোনস্থানে আশ্রয়হান না পেয়ে শেষে যে পদের আশ্রয় নিলে কাতারও ভয় থাকে না, একেবারে সেই অভয়ার পদাশ্রয় গ্রহণ করেছে । আমার গৃহে এ কপ কপ-মাবুরী বমণী থাকতে কি প্রকারে তার চক্ষের আড়াল হতে পারি ? ক্ষণকাল আমার নয়নের অন্তর-হলে চতুর্দিকে যেন অন্ধকার বোধহয় । কাজেই প্রিয়ে । তোমায় সম্মুখে তোমারি ঐ লোহিতবর্ণ গুষ্ঠ দুখানির প্রতি চেয়ে থাকি । পূর্বে নরেন্দ্র ক্ষণকাল চক্ষের আড়াল হলে যেমন কষ্ট বোধ হতো, তুমি চক্ষের আড়াল হলে, তার চেয়ে এখন শতগুণ কষ্ট বোধহয় ।

রেবতী—(অবগুপ্তন খুলিয়া) নাথ ! তোমার বিবেচনা নাই । দেখ দেখি ! আমি তোমায় কদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই

সাধ গেছে। আমার গর্ভজাতই না হলো, আপনার সন্তান তো, তা মহাবাজ ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার কি দেখা দিতে নাই ? আমারও সাধ আছে তো ?

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! তুমি নরেন্দ্রকে দেখবে, তাতে আমার অল্পমতি কি ? তার মা নাই, তুমি আপন পুত্রের জায় স্নেহ কব, তাহলে নরেন্দ্রও তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, দেশভুক্ত লোকেও তোমার স্তুতি কববে। সকলের মনে বিশ্বাস আছে যে, নারীজাতি স্বপত্নী-পুত্রের পবন শত্রু, তাকে একেবারে চক্ষুশূল-জ্ঞান করে, তুমি যদি নরেন্দ্রের প্রতি জননী৷ জাণ ব্যবহার কর, তা হলে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না।

বেবতী—মহাবাজ ! আমি বুঝি। —ছেলেবেলা থেকে অনেক বই পড়েছি, তাতে হিতকথাও অনেক দেখেছি, যে যেমন পাত্র, তাতে কেমনি আদব করতেও শিখেছি। আপনার পুত্র তো, আমার গর্ভেই না হলো, তাইতে কি আমি তাব স্নেহ করবো না, ভালবাসবো না ? —কেমন কথা বলছেন ?

রাজা—(বাস্তব হইয়া) না—না—আমি তোমায় বলছি না, তবে যুগ-যুগান্তরে এইরূপ হয়।

বেবতী—মহাবাজ ! আপনি একবার যুবরাজকে অঙ্গপুবে ডেকে পান।

রাজা—কিন্তু এখানে প্রতিহাবী তে' কেউ নাই।

বেবতী—মালতীই আজ আপনার প্রতিহাবী।

রাজা—আচ্ছা, মালতী ! নরেন্দ্রকে একবার ডাক তো ? (মালতীর প্রশ্ন)

বেবতী—মহাবাজ দেখুন ! এগনও একটু বেলা আছে, কিন্তু বোধ নাই। সময়টি অতি মনোহর, বসন্তকালের এই সময়টি সকলের পক্ষেই মনোহর, এই সময় একবার প্রমোদবনে গেলে হয় না ?

রাজা—না প্রিয়ে ! নরেন্দ্রকে আসতে বলা হলো, হয়তো এগনই আসবেন, এখন আব প্রমোদউদ্যানে গিয়ে কাজ নাই। চল, প্রদোষগৃহে গিয়ে বস। যাক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ বঙ্গভূমি

(নরেন্দ্রকুমারের বিশ্রামগৃহ—যুবরাজ ও শরৎকুমার আসীন)

নরেন্দ্র—(সংস্কৃত কাদম্বরী হস্তে অগ্ৰমনস্ব)

শবৎ—পড় ! —তাবপব কি হলো ?

নরেন্দ্র—(সমভাবে অগ্ৰমনস্ব)

শবৎ—কি যুববাজ ! হঠাৎ এমন হলে যে ? এখানে এমন কি কথা আছে ?

নরেন্দ্র—(সচকিতে) কথা এমন কিছুই নাই, তবে এইটি ভাবছি, সংস্কৃত কবি-
দের কতদূর ক্ষমতা !

শবৎ—না,—শুধু তা নয়, তুমি হাঠি ভাবছো না,—ভিতরে কিছু কথা আছে ।

কবির ক্ষমতা আর মনের ক্ষমতা কে কেমন কবে ভাবে, তা লক্ষ্য দেখে
স্পষ্টই জানা যায় । তুমি আমার কাছে গোপন করো না, আমি কতক
বুঝতেও পেয়েছি । কাদম্বরীর বিরহদশা আর চন্দ্রপীড়ের সেই লজ্জা,—
কেমন এই নয় ?

নরেন্দ্র—হাঁ । এক বকমই বটে, বলছি যে, সংস্কৃত কবিদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা !

দেখ ! কাদম্বরীর এখন যে অবস্থা, তা দেখ, যে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তিও
বাজপুত্র চন্দ্রপীড়ের স্মরদশা অবশ্যই বুঝতে পাচ্ছে । কবির এমনি কৌশল,
লজ্জায় মুখফুটে কাউকে কিছু বলতে দিচ্ছেন না । কাদম্বরী এখানে নাই,
চন্দ্রপীড় এখানে নাই,—সে লতামণ্ডপও নাই,—তাব ছবিও নাই,—তবু
পচনাকৌশলে সকলেই যেন ঠিক চক্ষের উপর বিবাজ কবছে । আহা !
গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরী কি লজ্জাশীলা ।

শবৎ—এই এতক্ষণের পব ঠিক হলো । আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন কুলবালী
ঠিক অমনি কবে আপনার কাছে প্রণয়ভাব জানায়, আর মুখে কিছু না বলে
তাহলে আপনি কি কবেন ? একথা কি বলতে পাবেন যে, প্রেয়সী ! তুমি
আমার প্রতি বড় অনুরাগিনী, আমি তোমার প্রতি বড় অনুরক্ত এখনই
আমায় বিয়ে কব ! একথা কি বলতে পাবেন ? আর সেই কামিণীই কি
পারে ?

নরেন্দ্র—বয়স ! এই তোমার রহস্য করবাব সময় ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শবৎ—রহস্য করছি না । মহাকবি বাণভট্ট ষথার্থ প্রণয়ের লক্ষণ কাদম্বরীর ঐ স্থানে
বর্ণন করেছেন কেন, অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । স্বভাব যেন চক্ষের
উপর নৃত্য কবছে । এই আপনিই তো বললেন, কাদম্বরী নাই, চন্দ্রপীড়

নাই, লতাম গুপ নাই, অথচ যেন সকলই চক্ষুর উপর দেখতে পাচ্ছি।

কবিদের ঐ তো প্রশংসা।

নবেন্দ্র—(পুস্তকখানি বন্ধ কবিয়া দ্বিবনেত্রে দৌর্গনিঃশ্বাস)

শবৎ—আবার কি ভাবছেন, যুবরাজ ! বঝেছি আপনার মন অস্থির হয়েছে।

আচ্ছা, ও সকল কথাই আন্দোলন ছেড়ে দিন। এখন একটি গান গান।

নবেন্দ্র—নূতন বকম আমোদ হলে এনর কথা ঢাক পড়ে বটে, কিন্তু আমার তো

ভাই সে-অভ্যাস নাই। তুমিই একটি গাও।

শবৎ—আচ্ছা, তবে গাই।

বাঁগীণী-মন্ডাপ :—তাল একতাল।

বমণী বতনে, বিধি সম্বন্ধে,

নিবন্ধনে গড়িয়াছে

‘তাঁই যত মনি, হয়ে অভিমানী,

মানের গুমাণে এত বাঁড়িয়াছে।

মুনি, ধর্মি বত যে শিবসাধনে,

তিনিও আশ্রিত বমণীচরণে,

ব্রজে কেলেশোণা, নিকুঞ্জকাননে,

বমণীর পায়ে পড়িয়াছে।

ধিকবে শবৎ, ধিক্কার জীবন,

এহেন বতনে কব অযতন,

সাধনের ধন, সংসার রতন,

সোযার্তী জীবনবথে চড়িয়াছে ॥

নবেন্দ্র—না বয়স ! আজ কিছুই ভাল লাগছে না।

শবৎ—(তানপুরা রাখিয়া) তবে অত্র আলাপ করা যাক। ভালকথা মনে হলো।

মহারাজ যে আপনার বিবাহের জন্ত স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো ?

নবেন্দ্র—ঘটক পাঠিয়েছেন এইমাত্র জানি, কি হয়েছে কিছুই জানি না।

শবৎ—যতদিন আপনার বিবাহ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু রাজকার্যের শৃঙ্খলা হচ্ছে না।

নরেন্দ্র—বিলক্ষণ ! আমার বিবাহ হলে বাজোব শৃঙ্খলা কি হবে ?

শবৎ—(সভয়ে) তার মানে আছে । আগে মহারাজ আপনার বিবাহ না দিয়ে বাজো অভিষিক্ত করবেন না । শ্রীলাভ না হলে বাজালাভ হবেনা । আপনি বাজা হলে সকলদিকেই মঙ্গল হয় । প্রজাবাও সুখী হবে, আমবাও মনের আমোদে থাকবে ।

নরেন্দ্র—সখে ! বাজদণ্ড ধাবন করা সহজ ব্যাপার নয় । বিবাহটিও কম কথা নয় । লোকে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করতে পারে, কিন্তু প্রণয়শৃঙ্খল ভগ্ন করা নিতান্ত অসাধ্য । সাক্ষী স্ত্রীকে শাপে বহু বলে, বহু সাগর ছেঁচে তুলতে হয়, তুলে আবার বেড়ে নিতে হয় । সে কাবনের সঙ্গিনী, স্তম্ভ-দুঃখেব ভাগিনী, প্রথমেই তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা উচিত । নারী অতি অভিমানী । যেমনই কেন হোকনা, আমি বড় সন্দেহী, আমার মত কেউ নাই, এইটি নারী-জাতির স্বভাবসিদ্ধি গর্ব । সে গর্ব নাই, এমন স্ত্রীবত্ন যদি মিলে, তবে বিবাহে স্তম্ভ আছে । নইলে নয় ।

শবৎ—এত খঁজতে হলে আর বিবাহ হয় না । এও কি কোন কাজের কথা ?

নরেন্দ্র—সখে ! তুমি যাও বল, অমন গুণবতী বমণী যদি হয় তবে তার পাণিগ্রহণ করবো, নচেৎ যেভাবে আছি চিবজীবন সেইভাবেই থাকবো ।

শবৎ—তবে আর বিবাহই কববেন না ?

নরেন্দ্র—কেন করবোনা ? উপযুক্ত পাত্রী পেলেই বিবাহ করবো । সখে ! তোমাকে তাও বলি, তুমিও শুনেছ, বাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী বমণী-কলের ঈশ্বরী । অবলাজাতির যতগুণ থাকা আবশ্যক, বিধাতা সে সকলই বসন্তকুমারীকে অর্পণ কবেছেন । তাঁর পাণিগ্রহণ করাই আমার নিতান্ত বাসনা । এইটি আমার মনের কথা । (মালতীর প্রবেশ)

মালতী—(করযোড়ে) যুবরাজ ! মহারাজ আপনারে ডাকছেন ।

নরেন্দ্র—(সরোষ নয়নে) রাজা কোথায় ?

মালতী—মহাবাজ অন্তঃপুরেই আছেন ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ! তুমি যাও, আমি যাচ্ছি । [মালতীর প্রস্থান]

(স্বগত) রাজা আজ আমায় হঠাৎ অন্তঃপুরে ডাকলেন কেন ? (শবৎ-কুমারের প্রতি) সখে ! মহারাজ যখন আমায় যে আজ্ঞা করে থাকেন,

সে তো সভার মধ্যেই প্রকাশ করেন । জননী'র মৃত্যু অবধি আমার অন্তঃপুরে
ডাকেন না, আজ হঠাৎ কেন ডাকলেন ?

শরৎ—পিতা ডেকেছেন তাতে আর কেন ডাকলেন, কি বৃত্তান্ত, তার তর্কবিতর্ক
কেন ? বোধহয় কোন আবশ্যক আছে ।

নরেন্দ্র—তবে তুমি এখন বিদায় হও, আমি অন্তঃপুর থেকে একবার আসি ।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় বঙ্গভূমি

রাজার প্রদোষগৃহ

(বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, বেবতী ও মালতী আসীন)

রাজা—বৎস ! এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব কথা বললেন, তাতে কখনই উপেক্ষা
করনা । তুমি বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছ, তোমার আর কি উপদেশ
দিব, চতুর্দিকে তোমার যশোখ্যাতি-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । অপরের
মুখে তোমার সুখ্যাতি শ্রবণ করে আশ্চর্য্যে আমার চিত্ত নৃত্য করচে ।
রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যেমন বংশ উজ্জল করেছিলেন, তেমনি তুমি আমার
কুলতিলক । তিনি যেমন কৈকেয়ীর আজ্ঞা প্রতিপালন করে জগতে চিব-
স্মরণীয় হয়েছেন । বাপু । তুমিও তোমার বিমাতার আদেশ প্রতিপালন
করে ভূমণ্ডলে সেইকপ কীর্তি স্থাপন কর । মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে এসে
বাণীকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন কর, সম্ভানের
কর্তব্য-কার্যে যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয় ।

বেবতী—মহারাজ ! আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয় । ভগবান
আমায়—কবেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয় । মহা-
রাজ ! যুবরাজ আমায় ভালবাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার
প্রাণের চেয়েও ভালবাসি ।

মালতী—(করষোড়ে) মহারাজ ! মন্ত্রী বৈশম্পায়ন কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে
দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ।

বীরেন্দ্র—কি আপদ ! যদি ক্ষণকাল অন্তঃপুরে এসেছি, এখানেও প্রধানমন্ত্রী !
ক্ষণকাল স্থির থাকতে দেননা । ওরাই আমাকে পাগলী'করলেন ।

বৈবর্তী—এ কেমন কথা ! কাজ থাকলে আসবেন না । মন্ত্রীবর যখন অন্তঃপুর পর্যন্ত এসেছেন, তখন বিশেষ কোন দরকার না থাকলে কখনই আসতেন না । আপনি না যেতে পাবেন, মন্ত্রীবরকে আসতে অন্তমতি করুন ।

বীবেন্দ্র—(আগ্রহপূর্বক) মালতী ! তবে মন্ত্রীকে ডাক ।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

বৈশ—(কবযোভে) বাজা বিজয় সিংহ দূতের দ্বারা মহারাজের কাছে এই পত্র পাঠিয়েছেন ।

বীবেন্দ্র—পত্র শেষে শোনা যাবে, দূত মুখে কি বললে ?

বৈশ—বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী—(নরেন্দ্র মন্ত্রীকে দুখপানে দৃষ্টি করলেন) স্বয়ম্বরা হবেন, অত্র দেশীয় রাজপুত্রগণ সেই সভায় আহৃত হবেন, বিজয়-সিংহ বসন্তকুমারীকে একখানি চিঠি আন এই পত্র মহারাজের নিকট পাঠিয়েছেন ।

বীবেন্দ্র—আচ্ছা, পত্র পড় ।

বৈশ—(পত্র পাঠাবস্ত) প্রিয়তম রাজন !

আমার প্রাণাধিক। চহিতা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বরমভা । কন্যা আপনার ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন । অতএব তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্তি আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অধীনস্থ রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বরসভায় প্রেরণ-পূর্বক বঞ্চিত করিবেন । আর প্রাণাধিক কুমার নরেন্দ্র এবং আপনিও সভাস্থ হন, এই আমার নিতান্ত অভিলাষ ।

একান্তই আপনার
বিজয় সিংহ ।

বীরেন্দ্র—ভোজপুর অধিপতি এইবারে অতি জীববেচনার কার্য্য করেছেন, এতে কোনপক্ষেরই আপত্তি থাকবে না । মন্ত্রীবর ! আমার শরীর তো সর্বদাই অসুস্থ ; তুমি লোকজন সঙ্গে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভোজপুরে প্রেরণ কর । (কুমারের প্রতি) বৎস নরেন্দ্র ! সকলি তো স্তনলে, ভোজপুর অধিপতির কন্যা স্বয়ম্বরা হয়েছেন ।

(নরেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে প্রস্থান)

বীরেন্দ্র—তবে এক্ষণে চলুন, সভায় গিয়ে সভাস্থ সভ্যগণ সহিত অত্র বিষয়ের

পরামর্শ কবা থাক'। নরেন্দ্রকুমারকে বিশেষ জাঁক-জমকেব'সহিত ভোজ-
পুরে পাঠাতে হবে ।। বাজার গাত্রোথান—মন্ত্রীৰ দিকে ফিৰিয়া । মন্ত্রীবৰ !
চিত্রপটখানি কুমাৰ নবেন্দ্রৰ কাছে পাঠিয়ে দেও ।

ৰেবতী—না না মহাবাজ ! তা হ'লে না, পটখানি আমাৰ কাছেই থাক । যদি
বিধাতা এঁকেই (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) আমাদেব পুত্ৰবধু করেন,
তাহলে আমি সেই তাদমুখ দেখে মাগেই ম'দ মিটিয়ে নিই । পটখানি
আমাৰ কাছেই থাক, আমি দত্ত কৰে তুলে পাখৰ । ম'দ মাৰো মাৰো
বুকে বেখে প্ৰাণ জুড়াব ।

বীবেন্দ্র—আজ্ঞা ! তবে তোমাৰ কাছেই থাক, কিন্তু নবেন্দ্রৰে ম'দবাৰ দেখালে
আমি বোদকৰি ভাল হ'ত ।

ৰেবতী—না মহাবাজ ! দেখলে ভাল হ'ত না, শুনেই ভাল হবে ।

বীবেন্দ্র—আচ্ছা মন্ত্রীবৰ ! কুমাৰকে পিতা ব'ল, এজকুমাৰী বসন্তকুমাৰী আঁত
সুন্দৰী, তাঁৰ স্বপ্নবদন্তী, অলপটো খেল বাতৰী হয় ।

ৰেবতী—(মন্ত্রীৰ প্ৰতি) না মন্ত্রীবৰ ! হ'ব নোনা । কেবল এহঁকখা ব'ল, ভোজ-
পুৰেব বাজা নিমন্ত্ৰণ কৰোঁৱেন, তোমাৰ নিমন্ত্ৰণ বক্ষা কৰতে যেতে হবে ।

বীবেন্দ্র—মন্ত্রীবৰ ! তবে চল আমল বাই । । রাজা ও মন্ত্রীৰ প্ৰস্থান ।

ৰেবতী—বাঁচলুম, অ'দ গেল ! বাজা যে স্বপ্নকালও চক্ষের আড়াল কৰতে চান
না, সে যে ভালি দিখ'দ । কেবল কথায় ভুলাতে চান, এও কি কখনো হয় ।
আমি কি কথায় ভুনি । মুখেৰ কথাতে কিবা হয় অবলা-সৰলা কোথা, শুধু
কথায় ভুলে বয় ।

মালতী—রাজমহিষী ! একটু স্থব কৰে ব'লো ।

ৰেবতী—হতভাগী ! এখন কি আমাৰ স্থবৰ সময় আছে । স্থব কৰে ব'লতে
আমাৰ লজ্জা কৰে ।

মালতী—বলই না কেন, এখানে আব তো কেউ না'ই, আৰ কেই বা কি বলবে ?

ৰেবতী—তবে বলি, কিন্তু সেও না বলাব মত ।

রাগিনী সুরট—তাল কাওয়ালী ।

সজনী লো মুখের কথাতে কিবা হয় ।

প্ৰাণে আৰ কত ময়, অবলা-সৰলা কোথা

শুধু কথায় ভুলে'বয় ॥

নবীনা যুবতী আমি,
অস্ত, দস্ত-হাবা স্বামী,
অস্ত জানেন অন্তরামী,
মধু প্রেম বিনময় ।
মনো যাণে নাহি চায়,
মিথি মিলাহল ভাগ,
কবি মাথায় কি উপায়,

প্রেমানলে প্রাণ দয় ॥

মালতী—(গালে হাত দিয়া অধোবদনে) হাঁ, তাই তো । (চিন্তা)

বেবতী—তুই আবার ভাবছিস কি ? (বসন্তকুমারীর পট লতনা) দেখ দোখ, এ
পটখানি কেমন ?

মালতী—এ কার ছবি ? তোমার ছবি ?

বেবতী—দূর হতভাগী ! এতক্ষণ বি শুনলি ?

মালতী—আমি কিছুই শুনেছি পাইনি । যাবণ যাও শুনেছি, দোহাই স্বর্গের,
কিছুই বুঝতে পারিনি । যাইরি । পারিনি ।

বেবতী—(হাস্য করিয়া) কিছুই বুঝতে পারিস নি ? ও আমার দশা । কিছুই
বোধশোধ নেই ! তোর সম্মুখে এত কথা হলো, কিছুই বুঝতে পারলিনে ।
মরণ আর কি

মালতী—ঠাকরুন ! তোমার পানে ধরি, এ ছবিটি কার বল ।

বেবতী—ভোজপুবেব রাজ্য বিজয় সিংহের মেয়ের ছবি ।

মালতী—বল কি ? আ ! —মাতুষে কি অমন সস্ত্রী হতে পারে ? আমার তো
বিশ্বাস হয় না । তুমি যাও বল, আমি বলছি, এ ছবিটি ঠিক নয় ।
লোকের মন ভুলাবার জন্তে মিছে করে এঁকেছে । যদি সত্য হয় তবে সে
মেয়ে কখনই মাতুষ নয়, কখনই না, নিশ্চয় দেবকন্যা । তা যাহোক মহা-
রাজ তোমায় এ ছবিখানি কেন দিলেন ?

বেবতী—দিলেন সাধে ? সহজে দিয়েছেন ? আমি জোর করে বেখেছি । রাজা
বিজয় সিংহের ইচ্ছা মেয়েটি নরেন্দ্রকেই দেন । ঠিক জানি না ; তবে
বুঝতে পারছি, আর আমাদের রাজারও যেন ইচ্ছা তাই । সেইজন্তে

ছবিখানি নরেন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। আমি দেখি, বিষম বিভ্রাট ; নরেন্দ্রের বিয়ে হলে সে এই রাজ্যের রাজা হবে, তাহলে আর আমার মান, গৌরব কিছুই থাকবেনা, আর যা হবে, বুঝতেই পারছ।

মালতী—কেন থাকবেনা মহিষী ? কুমার তোমায় যে বকম মাগু করেন তাতে তিনি বিয়ে করলেই যে একেবারে দয়া, মায়া কাটাবেন, এ তো আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

বেবতী—তুই যা বলিস মালতী ! কিন্তু আমার তো সন্দেহ ঘুচ্ছে না।

মালতী—এত সন্দেহ কি তোমার ?

বেবতী—সে আমার আত্মাই জানে, আর আমিও জানি।

মালতী—বাজমহিষী ! তাতেই বা বিশ্বাস কি ? বনস্তুকুমারী স্বয়ম্ববা হয়ে কার গলায় মালা দেবে, তা কে জানে ? সেজ্ঞে তোমার এত সন্দেহ কেন ? হাঁ, তবে যদি জানতেম, নহক টিক হয়েছে, সুবরাজই বর হয়েছে, এ বিয়ে হবেই হবে, তবেই যাহোক। এ তো তা নয় ! এটি বারোয়ারি বিয়ে, কার কপালে কি আছে, বনস্তুকুমারী যে কার হবে, আমি আন্দাজ করি বনস্তুকুমারীও তা জানে না। এর জ্ঞে তোমার এত ভাবনা কেন ? এখনই কি ?

বেবতী—তুই বলিস কিবে ! শত শত বাজপুত্রের মধ্যে নরেন্দ্রকুমার যদি অতি মলিনবেশেও সভায় একপাশে বসে থাকেন, আর এই মেয়েটি যদি (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) যথাথই রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুনিকন্যা হোক, আর দেবকন্যা হোক, বিধি যদি উপযুক্ত নয়ন দিয়ে থাকেন, তাহলে সভা মধ্যে নরেন্দ্রকুমার ভিন্ন আর কাউকেই চক্ষে দেখবে না ; সুবরাজকে মালা পরাতে হবে। পটে যে রূপ দেখা যাচ্ছে, এব চেয়েও যদি সে শতগুণে রূপবতী হয়; নরেন্দ্রকুমারের মুখপানে একবার নয়ন পড়লে যে ফিরে উলটে পলক ফেলবে, সে পথ আর থাকবে না। যতই কেন লজ্জাশীলা হোক না, একদৃষ্টে সেই মুখপানে চেয়ে থাকতেই হবে।

মালতী—দেখবো সুবরাজ তো ভোজপুরে যাবেন, কি করে আসেন, শেষেই দেখো
—এখন আর কিছুই বলবনা, ছদ্মিনের চাঁদ হলে স্নরে বসেই দেখতে পাব।

রেবতী—চুপ কর, ও কোন কাজের কথা নয়, তুই দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যান, তবে সে বসন্তকুমারীর ক্ষমতা কি যে, নরেন্দ্রকে ফেলে অল্প পুরুষের গলায় মালা পরাতে পারে, ওলো! তুই দেখিস, দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যায়, (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! আমি ধর্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না? লজ্জার মাথা খেয়ে সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন করতে হবে, লোকের গল্পনা সহ্যেতে হবে, অর্ধশ্রমে নরকে পুড়তে হবে। এ সকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ করলেম, কিন্তু তিনি আমার পানে একবারও চাইলেন না। আমার সমুখে যতক্ষণ ছিলেন, আমি একবারও চক্ষের পলক উলটাতে পারিনি, কিন্তু তিনি তো মুখ তুলেও চাইলেন না। ষিক আমার জীবনে। যদি এই রমণী (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) তাঁর প্রণয়িনী হয়, তাহলে আমার আশা পূর্ণ কবা দূরে থাক ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর করবেন না। হা! সকল আশাই নিরাশ হল। মালতী! এর উপায়? আমি তো আব বাঁচিনা।

মালতী—উপায় আর কি? একেবারে ক্ষান্ত দেওয়াই উপায়। কেন ছুদিনের তরে গঙ্গনার ভাগিনী, পাপের ভাগিনী, কলঙ্কের ভাগিনী হতে চান; মনেও যে এ কলঙ্ক যাবে, তা মনে করোনা, বেক্ষাপ্ত যতদিন থাকবে, ততদিন এ কলঙ্ক যাবার নয়।

রেবতী—তুই যা বলিস, প্রাণ কোনমতে ধৈর্য্য মানে না। ভাগ্যে যাই থাক, যুব-রাজকে পত্র লিখে মনের ভাব জানান, এতে বিধি কপালে যা ঘটান, তাই স্বীকার—ভয় কি? একদিন তো মরতেই হবে, তাতে আর এত ভয় কি?

মালতী—কি বলে পত্র লিখবে?

রেবতী—যা মনে হয়, তাই লিখবো। তুই শীঘ্র আমার লিখনের উপকরণ নিয়ে আয়। (মালতীর প্রশ্নান এবং কিঞ্চিৎ পরে লিখনের সমস্ত উপকরণ লইয়া উপস্থিতি)

মালতী—এই নিন। (রেবতী পত্র লিখিতে আরম্ভ)

রেবতী—(স্বগত) কি লিখি? (কালি লইয়া লেখনী কাগজে স্পর্শ) যা মনে হয়েছে, তাই লিখি। (লেখনীর দৃষ্টে স্পর্শ করিয়া চিন্তা) লিখবই,

অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, (লিখিতে আরম্ভ—তিন-চারছত্র লিখিয়া
কাগজদ্বিখণ্ড করে মুচড়ে নিক্ষেপ এবং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)

মালতী—(হেঁচে বাধা দিল)

বেবতী—দূর হতভাগী ! সব নষ্ট করলি। বাধা মানাই চাই। (কিঞ্চিৎ পরে
লিখিতে আরম্ভ, দুই-তিনছত্র লিখিতেই লেখনী ভাঙ্গিয়া গেল, লেখনীর
প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তুই আজ ভেঙ্গে গেলি ? (সক্রোধে লেখনী দুই খণ্ড
করিয়া নিক্ষেপ) আর লিখব না। এত বাধা পড়ছে আব লিখব না।
(দণ্ডায়মান) মালতী ! এ সব কাগজপত্র নিয়ে যা, আজ আর লিখব না।
কি জানি—

মালতী—(লিখনের উপকরণ লইতে অগ্রসর)

বেবতী—বাথ ! রাখ ! (উপবেশন, পুনরায় কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণ-
কাল পরে পত্রলেখা শেষ হইল) দেখি কোন পথে।

মালতী—কি লিখলেন, আমায় একটু শুনান।

বেবতী—শুনবি ! তবে শোন।

(পত্র পাঠ্যারম্ভ)

যুবরাজ ! চিনিতে কি পারিবে আমায় ।
বেদিন প্রমোদবনে দেখেছি তোমায় ॥
শরতকুমার সনে গলাগলি করি ।
বেড়াইতেছিলে করে হাত-ধরাধরি ॥
সেদিন নয়নকোণে হেরিয়ে তোমায় ।
একেবারে মজিয়াছি প্রণয়-মায়ায় ॥
পার কি না পার তুমি চিনিতে এখন ।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
মোহন নয়নবাণে বিঁধিয়ে নয়ন ।
কোথা লুকাইয়া গেলে নাহি দরশন ॥
এঁকেছি হৃদয়পটে প্রতিমা তোমার ।
ভুলিবনা কভু তাহা ভুলিবনা আর ॥
সে রূপমাধুরী প্রাণ ভুলিতে কি পারি ॥

লহরী খেলিছে যেন সাগরের বাবি
 দূরে যায় ফিরে আসে লহরী যেমন
 তেমনি তোমায় আমি জানি প্রাণধন ॥
 বলে কি জ্ঞানান যায় মনেব বেদন ।
 যে ভুগেছে সেই জানে যাতনা কেমন ॥
 তদবধি ভুগিতেছি আমি অভাগিনী ।
 খেতে শুতে স্থখ নাই দিবস যামিনী ॥
 হেরিয়ে মোহনরূপ ভুলিয়াছে মন ।
 হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা মুরতিমোহন ॥
 ভুলেছ, কটাক্ষশবে হরে নিয়ে মন ।
 মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
 বিরহিণী একাকিনী ছিলাম কাননে ।
 যে দিন ভ্রামতেছিলে শরতের সনে ॥
 মালতী আমার সনে ছিল সে সময় ।
 সাক্ষী দিবে কটাক্ষের মিথ্যাকথা নয় ॥
 চুরি করিয়াছ মন হইয়াছ চোব ।
 তদবধি মনচুরি হইয়াছে মোর ॥
 জপিতেছি কতদিনে হইবে মিলন ।
 বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ প্রিয় প্রাণধন ॥

তোমারই প্রেমভিলাষিণী
 রেবতী ।

মালতী—বেশ হয়েছে । এখন দেখব যুবরাজ আমার উপর কেমন করে চোখ
 রাঙান । (রাজার প্রবেশ)

মালতী—(নিঃশব্দে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—(রেবতীর হস্তে পত্র দেখিয়া) প্রিয়ে ! কোথায় পত্র লিখছ ?

রেবতী—(সক্রোধে) সে কথায় তোমার কাজ কি ?

বীরেন্দ্র—বল না কোথায় লিখছ, বল, আমার মাথা খাও বল । কোথায়
 লিখছ ?

রেবতী—আমি বলবনা, যাও আমি বলব না, যে কথা বলবনা, সে কথায় তোমার
আবার কথা কেন, আর মাথা খাওয়াই বা কেন ?

বীরেন্দ্র—(হঠাৎ রেবতীর হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ) কেমন এইতো নিয়েছি ।

রেবতী—(স্নান মুখে রাজার মুখ দর্শন)

বীরেন্দ্র—(ভয়ে) প্রিয়ে ! বিরক্ত হলে ?

রেবতী—(দুঃখিত দ্বরে) বিরক্ত হব কেন ? হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিলেন
আপনি চাইলে আর আমি দিতুম না ! (অশ্রুপতন)

বীরেন্দ্র—বড় অন্তায় করেছি । তোমার অসম্মতিতে পত্রখানা হাতে থেকে কেড়ে
নেওয়া বড়ই অন্তায় হয়েছে । প্রিয়ে ! ক্ষমা কর, পত্র নেও । (পত্র
দিতে হস্ত অগ্রসর)

রেবতী—(সক্রোধে রাজার হাতে আঘাত করিয়া) আমি পত্র চাইনে । আপনি
আমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিয়েছেন, ঐ পত্র আবার আমি হাতে
কবব ?

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে ধরি । পত্র ধর, আমার অপরাধ হয়েছে । (পত্র রেবতীর
সম্মুখে লইয়া) ক্ষমা কর, আর কোনদিন এমন হবে না । প্রিয়ে ! মার্জনা
কর ।

রেবতী—(পত্র লইয়া দূরে নিষ্ক্ষেপ) আমি আবার—কখনই—

বীরেন্দ্র—(অতিব্রন্তে পত্র আনিয়া রেবতীর পদধারণ) প্রিয়ে ! তোমার পায়
ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তা
হলে পত্র নেওয়া দূরে থাক-ছ, তুমিও না । পায় ধরি—নেও, আর মনে ব্যথা
দিও না ।

রেবতী—(রাজার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ)

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে শত নমস্কার, বাপরে ! একমূহূর্ত্ত মধ্যে আমায় একেবারে
ত্রিভুবন দেখিয়েছ ।

রেবতী—(হস্ত মুখে) পত্রের কথা শুনবে ।

বীরেন্দ্র—না না, আমি আর শুনতে চাইনে । তোমার পায়ে ধরি গো আর শুনতে
চাইনে ।

রেবতী—না না শুনুন । আপনি মনে মনে দুঃখিত হবেন, তা আর কাজ কি,
শুনুন !

বীরেন্দ্র—তোমার ইচ্ছা হয়, ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমি আর কিছু বলব না ।

বেবতী—আমার যে ছোট ভগ্নী আছে তা আপনি জানেন তো ?

বীরেন্দ্র—জানব না কেন ?

বেবতী—আমার বিবাহ হওয়াবধি তার সঙ্গে আর দেখা নাই । অনেকদিন হলো, কোন সংবাদও পাই নাই, মনটা আজকে বড়-অস্থির হয়েছিল, তাকেই এই পত্র লিখেছি ।

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! তুমি যদি বিরক্ত না হও, তবে আর একটি কথা বলি ।

বেবতী—বলুন ।

বীরেন্দ্র—তোমার ঐ কমল-কর-বিনির্গত পত্রখানি পাঠ কবে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্রীতি সাধন কর ।

বেবতী—তা আর হানি কি ? আপনি শুনবেন, তাতে ক্ষতি কি ? আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নহে । শুভুন । (মনঃকল্পিত রূপে হস্তস্থিত পত্র পাঠারম্ভ)

প্রিয় ভগিনী,

দীর্ঘকাল তোমার কুশল সমাচার অ-প্রাপ্তে যারপর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি । আমি পরাধিনী । রাজার বিনামৃত্যুতে পদ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা নাই । তুমি অবশ্যই মনে কবেছ যে, দিদি রাজরাণী হয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন ! সে কথা মনেও করো না । আমি সুখী হই নাই । কারণ তুমি যদি আমার নিকটে থাকতে তা হলে যথার্থ সুখভোগিনী হতেন । ভগিনী ! সেই যখন আমার বিবাহ হয় নাই, দুজনে একত্রে কত খেলা করিয়াছি । পুতুল বিয়ে দিয়ে তুমি আমি কত সম্বন্ধ পেতেছি, সেই সকল পূর্বকথা মনে হলে কিছুতেই সুখবোধ হয় না । এ অতুল্য সুখও যেন সে সময় বিষময় বোধহয়, রাজভোগ তখন আমার বিষয় বোধহয় । রাজা অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই কিঞ্চিৎ স্তম্ভ আছি । নচেৎ আমার যে কি দশা হত, তা বিধাতাই জানেন । যত শীঘ্র শীঘ্র পার, তোমার শুভ সংবাদ লিখিয়া আমায় সুখী করিবে ।

তোমারই—বেবতী ।

বীরেন্দ্র—কেন লিখেছ ! খাঙ্গা কেন হবে না ? প্রিয়ে ! তুমি যে এমন লিখতে পার আমি স্বপ্নেও জানতেন না । ষাহোক, শুনে বড় সুখী হলেম । তুমি

বস আমি আসছি। [প্রস্থান]

মালতী—প্রণাম করি ! তোমার পায় দণ্ডবৎ হই ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রাজা যখন তোমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিলেন, আমার প্রাণ তখনই উড়ে গিয়েছিল—মনে করলেম আজ সর্বনাশ হলো।

বেবতী—ওলো ! (হাসিতে হাসিতে) সেকলে বুড়োরা কি একেলে যেয়েদের চাতুরী বুঝতে পাবে ? দেখলি তো রাজাকে কেমন জ্বদ করেছি, কেমন ঠকিয়েছি ? তা যা-হোক, পত্রখানা আজকেই যুববাজকে দিবি। মালতী ! সাবধান ! একটি প্রাণীও যেন টের না পায়। তাহলে তোমাবই মাথা আগে কাটা যাবে। (শিবোনামা দিয়ে মালতীর হস্তে প্রদান)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী

যুবরাজ দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণ।

যায় যায়, যায় প্রাণ।

সহেনা সহেনা আব তব অদর্শন বাণ ॥

হেরিয়ে প্রমোদবনে,

মরিতেছি মনোপুণে.

মনে করি ত্বরা আসি, কব প্রেম বাবি দান।

তোমাবি মিলন আশে

স্বথ নীরে প্রাণ ভাসে,

ভাসায়োনা দুঃখ নীরে, দুঃখিনী বেবতীর প্রাণ ॥

তৃতীয় রক্তভূমি

ভোজপুর—রাজা বিজয় সিংহের বাটি

বসন্তকুমারীর শয়নমন্দির—বসন্তকুমারী আসীনা

বসন্ত—(স্বগত) আজকেই আমার জীবনের শেষ। আজই আমার—ভগবান !

তুমিই রক্ষাকর্তা ! তুমিই অবলার আশ্রয় ! সতীত্ব রক্ষার তুমিই একমাত্র

উপায়। নাথ ! তুমি রূপানেত্রে অবলোকন না করলে দাসীর আর উপায়

নাই। যারে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরে সভায় যদি দেখতে না পাই, তবে এ
প্রাণ আব রাখবো না। (মেঘমালাব প্রবেশ)

মেঘ—তুমি একলা বসে কি ভাবছ? চুপেচুপে কি বলছ? এখানে তো কেউ
নেই। কাকে কি বল? তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েছি,
ছি! তুমি তো আর অবোধ নও। আজ তোমার বিয়ে, তোমার এ দশা
কেন? বলতো তোমার এ বেশ কেন? ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা!
বেশ করে সাজগোজ করবে, সর্বদাই হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে মন খুলে
মনের আমোদে কথা কইবে; হাসিখুশী করে ক্রমে দিন কাটাবে। তা নয়,
আজ যেন চিরদুঃখিনী, বিবাহিণী মেজেছ।

বসন্ত—সখী! আমি সাথে একুপ হয়েছি আমার আহাৰ নাই, নিদ্রা নাই, মনে
স্থখ নাই, কেবল দিবানিশি চিন্তা নাগরেই ডুবে রয়েছি। 'দেখনা ভাবতে
ভাবতে আমি একেবারে সারা হলেম। আমি কি আর আমাতে আছি।

মেঘ—এতও জান! তোমার কিসের চিন্তা? আর ভাবছই বা কি? তোমার
রঙ্গ দেখে আব বাঁচিনে বিয়ের মুখ দেখতে না দেখতে আগেই চিন্তাসাগরে
ডুব দিলে?

বসন্ত—(দুঃখিত স্বরে) বিবাহই আমার কাল হয়েছে বিবেচনা কব, আমি স্বপ্নে
যারে বরণ করেছি, কণ্ঠহার গলায় পরিয়েছি, তাঁর দাসী হব, তাঁর চরণ
সেবা করবো, এই বলে এতকাল পর্যাঙ্ক দেবতার আরাধনা করছি,
এই পোড়া চক্ষের আড়াল হবে বলে প্রেম-তুলিকায় চিত্তপটে লিখে
রেখেছি, সেই জীবন-সর্বস্ব পতিভ্রমে যদি অন্ম পুরুষের গলে মালা অর্পণ
করি, তবে তো সতীত্ব-গৌরব একেবারে গেল! সখী! তুমি নিশ্চয় জেনে,
যদি আমার সেই চিত্ত-অঙ্কিত-রূপ সভায় নয়নগোচর না হয়, তবে সেই-
খানেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করব। জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই
ভাল।

মেঘ—তুমিও যেমন পাগল হয়েছ! কাকে কবে স্বপ্ন দেখেছিলে, না জেনে না
জেনে তাকে মন দিয়ে বসে রয়েছ। স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? স্বপ্নে
কণ্ঠহার বদল করেও কি কেউ বিয়ে করে? এও কি একটা কথার মত
কথা? ওসব কথা ছেড়ে দেও, আমার কথা শুন ও চিন্তা দূর কর, কত

রাজপুত্র সভায় উপস্থিত থাকবেন, থাকে তোমার চক্ষে দেখতে ভাল বোধ-
হয়, তাঁর গলে মালা দিও। এ তো আর কেউ ধরে বেঁধে দিয়ে বিয়ে
দিচ্ছে না, তোমারই হাত, তোমারই চক্ষে যাকে ভাল দেখায় তারই গলে
মালা দিও।

বসন্ত—(বিরক্তভাবে) যাও। ও সকল কথা মুখে এনো না, ও কথায় আমি বড়
ব্যথা পাই। আমি যার দাসী, তাঁর গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার
প্রাণ তিনিই আমার জীবন যৌবনের অধিকারী, তিনিই আমার প্রাণের
ঈশ্বর, তিনিই আমার সর্বস্ব, তাঁর করে জীবন সমর্পণ করেছি। তা নেয়
স্বপ্নেই বা হলো, তাতে ক্ষতি কি? তাঁকেই আমি পতি বলে সম্বোধন
করেছি যদি তাঁকে সভায় না দেখতে পাই, যা মনে আছে তাই করবো।

মেষ—দেখব! দেখব! বলতে সহজ গড়ে উঠা কঠিন। আচ্ছা! তুমি যে স্বপ্নে
কণ্ঠহার গলে পরিবেছ কবম্পর্শ করেছ, পতি বলে সম্বোধন করেছ, তোমায়
কিছু পরিচয় দেন নাই?

বসন্ত—কেন দিবেন না? অবশ্যই পরিচয় দিয়েছেন তুমি শুনতে চাও, আমি এত-
কাল পর্যন্ত সে নাম কাবো কাছে ছুটিনি মনের কথা মনেই আছে, আজ
নাচারে পড়ে তোমার কাছে ভাঙছি। সখী! আমি যেমন যত্নে রেখেছি,
তুমিও আমার হয়ে প্রাণনাথের নাম সযত্নে হৃদয় ভাণ্ডারে রাখবে।

মেষ—তুমি এত সন্দেহ করছ কেন? আমি কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞাসাতেও
আনব না। যদি ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন প্রকাশ
করব।

বসন্ত—সখী! আমার জীবন-সর্বস্ব এইভাবে পরিচয় দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা
তিনিই জানেন। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, নাম নরেন্দ্রকুমার। (অশ্রুপতন)

মেষ—এও তো ভারি জ্বালা। আমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করে তোমায় কঁদালেম।
এ কি! নাম বললেই কঁদছ কেন? আজ আনন্দাশ্রু নির্গত হবে, না অনি-
বায় দুঃখের বারি দর দর করে পড়ছে। এ বড় দুঃখের কথা! আমি মিনতি
করে বলছি, তুমি আর কঁদনা। (অবশ্য দ্বারা বসন্তকুমারীর চক্ষু মার্জন)

বসন্ত—বলব কি সখী। প্রাণনাথের নাম মনে পড়লে কোথা থেকে হ-হ শব্দে
চক্ষে জল এসে পড়ে। কণ্ঠরূপে মিমারণ চেষ্টা করি, সকলই বিফল

হয় ! (বিজয় সিংহের প্রবেশ)

(বসন্তকুমারী পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

বিজয়—এ কি ! আজ তোমার মলিন বেশ কেন ! আজ তোমার মলিন বদন দেখে মনে বড়ই বেদনা হচ্ছে । আজ তুমি স্বয়ম্বর গ্রহণ করবে, তোমায় কি এই বেশে থাকতে হয় ? অপর সাধারণ তোমার জ্ঞাত সন্তোষ হৃদয়ে উত্তম উত্তম বেশভূষা কবছে, মা তুমি কেন স্নানমুখে মলিন বেশে রয়েছ ? তোমার কিসের দুঃখ মা ! আজ তুমি ভাল কাপড় পরবে, মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হবে, কেশ বিগ্ৰাস করবে না—তোমার সকলি বিপরীত দেখতে পাই । সহচরীবা ! তোরা কোথায় ? আমাব বসন্তকুমারীকে সাজিয়ে দে । এই সমস্ত কারুকার্য খচিত বসন, এই সমস্ত মণিময়-অলঙ্কার এনেছি, তোরা সকলে মনের মত করে আমাব বসন্তকে সাজিয়ে দে ।

বসন্ত—পিতঃ ! ও সকল বসন-ভূষণে আমার কাজ নাই । কৃত্রিম-রূপ অপেক্ষা ঈশ্বর-দত্ত-রূপই প্রশংসনীয় । শত খণ্ড হীরা মাথায় দিলেই যে গৌরবিণী হলো তা নয়, নারীজাতির সতীত্বই যথার্থ গৌরব, পতি ভক্তি ভূষণই রমণীর প্রধান ভূষণ । মণিমুক্তা, অলঙ্কারে স্বরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতি ভক্তি অমূল্য-ভূষণে স্বরূপা—কুরূপা উভয়েই সুন্দরী । যে অলঙ্কারে কুরূপাকেও স্বরূপার সমান করে, সেই অলঙ্কারই অলঙ্কার । দেশীয় রমণীগণ যে কেন স্বর্ণ-অলঙ্কারকে এত আদর করে, তার ভাব আমি কিছুই জানি না । পিতঃ ! লজ্জাই অবলার অমূল্য-বসন । এ সকল জেনেও যে, রমণীগণ কারুকার্য খচিত বসনে অবগুণ্ঠন দ্বারা লজ্জা প্রকাশ করেন. এ বড় লজ্জার কথা । আমার অপরাধ মার্জনা করুন । আমি ও সকল অহঙ্কারপূর্ণ বসন—ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে গৌরবিণী হতে বাসনা করি না । মিষ্টভাষিণী, নম্রস্বভাবা, সত্যবাদিনী, ধীরা এবং স্বামীর অনুবর্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম-বেশভূষা স্বামীর ভালবাসা হতে ভালবাসি মা ।

বিজয়—বাছা বসন্ত ! তোমার এই মধুমাখা কথা শুনে আমার অবগেন্দ্রিয় জুড়াল । প্রাণাধিকা হেমন্তকুমারীর আর রাণীর মরণ হঠাৎ মনে পড়েছিল, তোমার এই সুপ্রাচীন কথাটি শুনে প্রত্নতত্ত্ব হৃদয়ী হয়েছি যে, সে সকল কথা কিছুই

মনে নাই। মা ! তুমি আমার কুলের গৌরবিনী কন্যা, তুমি আমার বংশের উজ্জল-মনি, মা ! তুমি আমার শতপুত্রসম এক কন্যা জন্মেছ। তোমা হতে বিজয় সিংহের বংশ দ্বিগুন উজ্জল হবে। দেখ মা ! আমি তোমার পিতা, আমার কথাও তুমি রক্ষা করতে হয়। মা ! আমি বারে বারে বলছি, তুমি বেশভূষা কর। সখীবা ! তোরা কোথায় ? বসন্তকে সাজিয়ে দে।

[প্রস্থান]

মেঘ—রাজকুমারী ! অলঙ্কার তো পবনে হলো ? আর না বলতে পারবে না।

বসন্ত—কি করি, পিতার আজ্ঞা।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

ভোজপুর রাজপ্রাসাদ, অভ্যন্তর যুবরাজগণ এবং কাশ্মীর

নর্তকী-দ্বয়েব নৃত্য ও হিন্দি গান

(কঞ্চুকী প্রবেশ)

কঞ্চুকী—(কিঞ্চিত উচ্চস্বরে)

জয় হোক মহারাজ ইন্দ্রপুর পতি
ভুবনে বিখ্যাত বীর-বীরেন্দ্র কেশরী !
তোমারি শোভনে আজ শোভে রাজসভা—
অপূর্ব শোভার হাব শোভে যথা নভে ।
দেবরাজ পুরন্দর সব সিংহাসনে
রাজিছে রাজন তব ভাতি মনোহর,
এ মহীমণ্ডলে আজি, রতন যেমতী
বাজে রত্নাকর-করে, বিপিন মাঝারে ।
অপূর্ব শোভায় শোভে মরকত মনি !
রহ রহ রাজগণ রহ কণতরে,
ভঙ্গদেহ প্রেমানন্দে আজিকার মত ।
অগ্নি ! সুরঙ্গিনীবানী নাচিও না আর,
বাজনা বিরাম দেও রাজ-বাগ্গকর,
আসিছেন রাজবালা সভা মধ্যখানে ।

সহচরীদ্বয় জগতমোহিনী,
 যেমন বিদ্যুৎ লতা বাসন্তী গগনে !
 সাজায়ে বরণ ডালা অগুরু চন্দন,
 মনোহর ফুলমালা স্তবাসিত জন,
 তৃপ্তাবী চামর সেবি, সহস্র আনন ।
 ওই দেখ আসিছেন বসন্তকুমারী ।
 নয়ন খেলিছে যেন যুগল খঞ্জন,
 নীল শতদলে যথা যুগল ভ্রমর,
 তেমনি শোভিছে তাব মুখ শতদল ।
 আমাবি, আমারি যেন প্রকৃতি আপনি
 জগতের যত শোভা একঠাই করি
 এনেছেন শোভিবারে বাজ তনয়ায় ।
 নবীন যৌবন বাল্য বসন্তকুমারী ।
 বহু বহু বাজগণ দেখ নেহাবিয়া,
 আসিছেন বাজকতা বিকাশি-বদন,
 অকলঙ্ক চাঁদ যেন উদয় মহৌতে
 হইল, মোহিতে আজ তোমা সবাকায় ।

[প্রস্থান]

(সহচরীদ্বয় সঙ্গে বসন্তকুমারীর সভায় প্রবেশ—প্রথমে মলিন বদনে চতু-
 স্পার্শ্বে দৃষ্টি—হঠাৎ নবেন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া পূর্ণানন্দে নরেন্দ্রকুমারের
 গলায় মালাদান—এবং সভাস্থ সকলের সম্ভাষণ-সূচক করতালি) (বিজয়
 সিংহের প্রবেশ)

বিজয়—মা ! আমি মহা স্তবী হলেম । উপযুক্ত পাত্রের গলাতেই মালা অর্পণ
 করেছি । আজ আমার আশা পূর্ণ হল । বৎস নরেন্দ্র ! (সবেদনে)
 আমার সর্বস্ব-ধন, আমার যত্নের রত্ন, বসন্তকে তোমার হস্তে সমর্পণ
 করলেম । আমার বসন্ত—(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দান,
 সভাস্থ সকলে সহস্র করতালি এবং নেপথ্যে বিবিধ বাজ ও উল্লুধনি)

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর ; রাজবাটি—রেবতীর শয়ন মন্দির ;

(রেবতী ও মালতী দাসী আগীনা)

রেবতী—মালতী ! মনে পড়ে ? কেমন, হয়েছে তো ? আমি যা বলেছিলুম তাই হয়েছে কি-না ?

মালতী—হয়েছে । আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই হয়েছে । পটে যে রূপ দেখেছিলেম, এখন তাব চেয়ে শতগুণ সুন্দরী দেখতে পাচ্ছি । বেশ হয়েছে, যেমন যুবরাজ, তেমনি বসন্তকুমারী । যথার্থ রাজমহিষী ! বেশ মিলেছে । মহারাজ এই বিবাহে বড়ই খুশী হয়েছেন । আবার স্তনলুম যুবরাজকে বাজা করবেন । তাই নিয়ে পাড়ার মেয়েবাগ্গ আমোদ কবছে । যুব-রাজ রাজা স্তনে আরও খুশী হয়েছে । সকলেই বলাবলি কবছে, কাল আমাদের যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার বাজা হবে ।

রেবতী—তুই বসন্তকুমারীকে ভালকবে দেখেছিস তো ?

মালতী—দেখছি, অমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখি নাই । পাড়ার মেয়েবা তো বসন্তকুমারীকে দেখে আহ্লাদে গলে গলে পড়ছে । মহিষী ! তোমায় কেন এমন দুঃখিত দেখছি ? তোমার কিসেব দুঃখ ? তুমি রাজরাণী, তোমার কিসের দুঃখ ?

রেবতী—মালতী ! তুই আমার মনের ভাব জেনেও যে অমন কথা বলছিস ? আমার প্রাণে আর সঘনা । নরেন্দ্র বিবাহ করে এসে মনেব আনন্দে নব-যুবতীর সঙ্গে সখভোগ করবেন, আর আমি তাই দেখব, আমার প্রাণে তাই সহ হবে, আমি মনে মনে পুড়ে মরব ? এ কখনই হবেনা । (নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল পরে) আমি আজ এর একখানা করবই করব । যুবরাজ বাজা হলে আর কোন উপায় থাকবেনা । যে আমার হল না তার উপর এত মায়া কেন ? তার জন্ত এত দুঃখই বা কেন ? বসন্তকুমারী, তুই আমার সখতরী ডুবালি । আচ্ছা, তোমার এ সখের বাসা আজই ভাঙব,—ভাঙইব—ভাঙব । তখন দেখবে, রেবতী কেমন মেয়ে । যুবরাজ, তুমি আমার শত্রু, আজ তুমি আমার শত্রু ! † বলিতে বলিতে ঐঙ্গের আভরণ ত্যাগ

এবং আলুনাশিত কেশে ধুলিশয্যায় শয়ন ।

মালতী—এ কি ? এ কি কর ? ওমা ! তুমি এ কি কর ? কথা বলতে বলতে এ আবার কি ?

রেবতী—তুই চুপ করে থাক । তোমার এত কথায় কাজ কি ?

মালতী—না, না, না, তুমি উঠ, মহারাজের অন্তপুরে আসবার সময় হয়েছে, তুমি উঠ ।

রেবতী—না, আগি উঠবনা, তুই চুপ কবে থাক । রাজা এলে কোন কথা বলিস নে, যা বলতে হয়, আমিই বলব । (রাজা বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মালতী—(সভয়ে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—এ কি ? (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে) বলি এ কি ? মালতী ! এ কেমন ? (নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে ! তোমার কি হলো, তোমার এ দশা কেন ? আমার প্রাণ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি ! কোন পীড়া হয়েছে ? না, না, তা নয়, অঙ্গের আভরণ যখন মাটিতে পড়ে আছে, তখন এ ছুঃখের চিহ্ন ? তোমাকে কি কেউ মন্দ বলেছে ? না তাই বা কি করে হবে, কার জীবন তার হয়েছে, বাঁচবার সাধ নাই যে, তোমায় মন্দ বলেছে । আমি তো কিছু বলি নাই । আর কাঁবই না এমন সাধা যে রেবতীকে কটু উক্তি করে বেঁচে যাবে । যথার্থই কি তার প্রাণের মায়া নাই ? এমন সাধা কার ? প্রেয়সী ! উঠ, তুমি আমার—(নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে ! (হস্ত ধরিয়া) ছি ! এখনও চক্ষের জলে মাটি ভিজ়ে যাচ্ছে । বীরেন্দ্র সিংহ বর্তমান থাকতে তোমার চক্ষের জল পড়ছে ? বীরেন্দ্র সিংহের মহিষীর চক্ষে জল পড়ছে ? যদি যথার্থই তোমার কেউ কোন কথা বলে থাকে, তবে তুমি তার কেবল নামটি মাত্র বল । দেখ, তোমার সম্মুখেই এই দণ্ডেই এই অসি দ্বারা সে ছুরাঘাত, শিরচ্ছেদন করব । প্রিয়ে ! উঠ, আর আমায় কষ্ট দিও না ।

রেবতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি দেহে আর প্রাণ রাখব না । তুমি দেখ, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করছি, দাঁড়াও ! তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি ।

বীরেন্দ্র—তোমার পায় ধরি, তোমার জীবনে এত ঘৃণা কিসে হল ? স্পষ্ট করে

বল। আমি বীবেন্দ্র যদি তাব কোন প্রতিফল না করতে পারি, তবে তুমি একা মরবে কেন, আমিও তোমার সহগামী হব। তুমি আমার—তুমি মরবে কেন ?

বেবতী—মহারাজ ! সে বড় ভয়ানক কথা। আমি সে কথা মুখে আনতে পারিনা। আমার মরণই ভাল। পুত্রের এই কাজ ! আমি নয় বিমাতাই হলমে ! তাইবলে কি তিনি আমায় কোন মন্দ কথা বলতে পারেন ? এই কি ধর্ম ? তুমি কোথায় ! আমি এ প্রাণ বাখবনা। পুত্র হয়ে আমায় এমন কথা বলতে পাবে ? 'ছি ছি প্রাণে ধিক' নাবীকুলে ধিক ! তোমাব মত রাজার শত ধিক ! আমি তোমাব বাণী হয়ে আবার তোমারই পুত্র মুখে—গুনতে হল ! হায় ! হায় ! প্রাণ বেরও, আর কষ্ট দিওনা। নরেন্দ্রেব দুষ্ট-অভি-সন্ধির কথাব ভাব গুনেও কি তোমাব ঘণা হয় নাই ? তোমায় শত ধিক। তুমি এতক্ষণ যে দেহে আছ সে দেহকেও ধিক !

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! আর বলনা। আর বলতে হবেনা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এখনই চক্ষে দেখতে পাবে, বীবেন্দ্রের ক্ষমতা আছে কি না ? তুমি স্থির হও। আমি প্রতিজ্ঞা কবছি, এই অসি দ্বারা তোমাব সম্মুখেই দুর্বৃত্ত কুলঙ্গারকে এখনই দুই খণ্ড কবব। বড় লজ্জার কথা ! পুত্রের এই কাজ ? (ক্রোধ স্বরে) নগবপাল ! নগবপাল !

বেবতী—মহারাজ ! অন্তঃপুর মধ্যে নগবপাল কোথায় ?

বীরেন্দ্র—আমি হতজ্ঞান হয়েছি ! মালতী ! তুমি শীঘ্রই নগবপালকে ডেকে আন।
(মালতীর প্রস্থান)

বেবতী—হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। বাজরাণী হয়ে এই হল। সকলের কাছে মাননীয় হব, লোকের নিকট আদরিণী হব, স্থখে থাকব বলেই পিতামাতা রাজরাণী করে দিয়েছিলেন, হায় হায় ! শেষে অদৃষ্টে এই হল। মহারাজ ! (রোদন-স্বরে) আমাব বাঁচবার আর সাধ নাই।

বীরেন্দ্র—কেন এত দুঃখ করছ। দেখ ! তোমার সম্মুখেই ছুরাআর উচিত শাস্তি করছি। আর কেঁদনা, আমার মাথা খাও, আর কেঁদনা। তোমার চক্ষের জল আমি আর দেখতে পারিনা।

বেবতী—(কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ ! ছি ছি ! বড় ঘণার কথা ! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি !

নরেন্দ্রকে অস্ত্রপুৰে ডেকে এনে শেষে এই ফল হল ! মহারাজ ! ও ছুঁচা-
রের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র কবনা, কখনই করনা, আমি
বলছি. আমাব সম্মুখে কুলাঙ্গাবকে জলন্ত-অনলে প্রবেশের অত্মমতি কর।
ওর মৃতদেহ যেন আব চক্ষে দেখতে না হয়। যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা
কবে, তবে হাত-পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অস্ত্রে
হবেনা, জলে হবেনা, কিছুতেই হবেনা, অনলই এব যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। এই
যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন, নচেৎ আমার মায়া ত্যাগ করুন।

বীরেন্দ্র—ছি ! তুমি একথা মুখেও এনো না, তুমি আমার প্রাণ, তোমার মায়া
ত্যাগ করলে আমার শূন্যদেহে ফল কি ? আর আমিই বা কি করে বাঁচব ?
তুমি কখনও অমন কথা মুখে এনোনা। অমন ছুঁচার কু-সন্তানের মুখ
দেখতে আছে ? আমি কি পুনরায় ওকে পুত্র বলে সম্বোধন করব ? স্পষ্টই
বলছি, যাতে তোমার দুঃখ নিবারণ হয়, আমি তাইই করব।

(নগরপালের সহিত মালতীর পুনঃ প্রবেশ)

মালতী—(করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ ! নগরপাল উপস্থিত।

বীরেন্দ্র—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) নগরপাল ! নরেন্দ্রকুমারকে যে অবস্থায় দেখবে, সেই
অবস্থাতেই হস্তপদ-বন্ধন করে আমার কাছে নিয়ে এস। [নগরপালের
প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় বন্ধুভূমি

ইন্দ্রপুর ; যুবরাজ নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারীর শয়ন ঘর ; —যুবরাজ ও
বসন্তকুমারী আসীন।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! তুমি যে বাসর-গৃহে বলেছিলে মনের কথা বলব, কই আর কিছুই
বললে না ? এখনও কি সময় হয় নাই ?

বসন্ত—নাথ ! আমি যে বলবো বলেছি, সে তো বলবই ; আপনাকেও একটি কথা
বলতে হবে। আপনি না বললে আমি বলব না। কখনও বলব না।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! দেখ দেখি, এ কেমন কথা ; তোমার কাছে কোন কথা আমার
চাপা আছে ? মনের কথা এমন কি আছে যে, তোমায় গোপন করব ?

বসন্ত—কি জানি, পুরুষের মন ।

নরেন্দ্র—আমি তেমন পুরুষ নই যে, উপযুক্ত স্ত্রীর নিকট কোন কথা গোপন রাখব ।

বসন্ত—বলবে তো সত্য কললে ? বলি, এই যে পত্রখানি আমি তোমার বাস্কে পেয়েছি, এখানি কার লেখা ? সেই দেখছি রেবতী ; সে কোন রেবতী যুবরাজ ? লেখার ভাবে বোধ হচ্ছে সে রমণী আমা হতেও আপনার যত্ন করে—মনের সহিত ভালবাসে । আপনি যে দিন যাব হাতে পত্রখানি পেয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন । (নরেন্দ্র মস্তক হেঁট করণ) মাথা হেঁট কললে যে ? বলোনা, সত্য করেছ ; সে কোন রেবতী ? আর কোন মালতী ।

নরেন্দ্র—আমি মিনতি করছি ও কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না, আর অথ বা জিজ্ঞাসা করবে তাই বলব ।

বসন্ত—না না, তা হবে না ; আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বলুন, না বলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন ?

নরেন্দ্র—যথার্থই শুনবে ।

বসন্ত—শুনবই, না শুনলে ছাড়বনা ।

নরেন্দ্র—আর কোন রেবতী, বুঝতেই পারছ ! মালতী দাসীকেও চিনেছ, আর বেশী বলতে পারিনা ।

বসন্ত—(আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি ? কি কথা ! এমন ! ছি ছি ! নারীকুলে এখনও এমন আছে ? ধিক নারীর জীবনে ! (গালে হাত, নিস্তব্ধ)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! পত্রখানা খণ্ডখণ্ড করে ভস্মসাৎ করে দেও, কি জানি, দৈবাৎ আর কারো হাতে পড়লে একেবারে জীবন্মৃত হতে হবে । পত্রখান দেও । আমি পুড়িয়ে ফেলি ।

বসন্ত—(প্রদান) পত্র নিন কিন্তু পুড়িয়ে ফেলবেন না । ছিড়েও ফেলবেন না । আমার কথা রাখুন, পত্রখানা বাস্কের মধ্যে পুরে রেখে দিন, কি জানি—কি হবে ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ! তবে তোমার কথাই শুনলেম এখন থাক, পরে সাবধানে রাখব । প্রিয়ে ! এখন তুমি তোমার কথা বল ।

বসন্ত—আমার আরো কথা আছে । আমি অবাক হয়েছি ।

বসন্ত—বাসরথরে রে পরম্পর বলেছি, তা বেশ মনে আছে ?

নরেন্দ্র—যাও ! ওসকল কথা মুখে এনো না, আর মনেও করো না, তুমি কি বল-
ছিলো তাই বল ।

নরেন্দ্র—সে কি আর ভুলি ?—অন্তরে গোঁথে রেখেছি ।

বসন্ত—তারপর মনে এই স্থির কলনেম, যদি আমার চিত্ত-আকৃতি, রূপ সভায়
নয়নগোচর না হয়, তবে সেইখানেই আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণত্যাগ করব ।
এদিকে বিবাহের দিন উপস্থিত হলো । আমি ভাবতে ভাবতে একেবারে
সারা হলেম । সখীরা, প্রীতবেশীরা, শেষে পিতা এসে কতমতে প্রবোধ
দিলেন, বসন ভূষণ পরতে অনুরোধ কললেন আমার যে কেন বিরসভাব,
কেন যে দুঃখিত মনে আছি, তা তো কেউ জানতেন না । মনের কথা কেবল
মনেই জানে । বেশভূষা করতে আমার ইচ্ছা মাত্র ছিল না—পিতার
অনুরোধে বেশভূষা কবে সভায় যেতে হলো, কিন্তু আমি তখন যে কি অব-
স্থায় ছিলাম, তা কিন্তু মনে নাহ ; কে আমায় সঙ্গ করে যে কোন পথে
উপস্থিত করেছিল তাও জানি না, পরে যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে,
(মুখপানে চাহিয়া) এই বদনকমল দর্শন করেছি, আহ্লাদে সে সময় যে,
কি করি, কিছুই ভেবে উঠতে পারি নাহ ।

নরেন্দ্র—তাবপব ?

বসন্ত—তারপর, এখন বলতে হাঁসি পাচ্ছে, তখন কেঁদেছি । শেষে আর অপেক্ষা না
করে কণ্ঠহার —(নগরপালের প্রবেশ, —যুবরাজকে বন্ধন)

বসন্ত—নাথ !—নাথ ! আমার প্রাণনা—(মুর্ছা)

নরেন্দ্র (কাতর স্বরে) নগরপাল । এ কি ? কি কর মলেম ।—প্রাণ গেল !

নগর—চোপরাও ! মহারাজকা হুকুম ।

নরেন্দ্র—উহ । উহ । আব সয়না—বন্ধন জালা আর সয় না । নগরপাল !—পিতা
কি অপরাধে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা কললেন ! প্রাণ যে গেল ! বন্ধন
খুলে দেও, আমি তোমার সঙ্গ যাচ্ছি । আমি পালাব না । যাতনা
আর সহ্য হয় না ।

নগর—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) মহারাজকা হুকুম, তোমাকে বাধকে লে বাগা ।

নরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ! সর্বনাশ হয়েছে ।

আমার অদৃষ্টে কি আছে—বলতে পারি না। কি জানি, যদি আরও
না হয়। একবার ওঠো।

বসন্ত—(নেত্র উন্মীলন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তোমার এ-দুর্দশা
কেন? তোমায় কে বেঁধেছে? (নগরপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায়
মূর্ছা)

নরেন্দ্র—হায় হায়! এ দুর্দশা আর প্রাণে সয় না। নগরপাল! আমি মিনতি
কবছি ক্ষণকাল-জন্ত বন্ধন মুক্ত কর—আমি বসন্তকুমারীকে সাধনা করি।
বসন্তকুমারীর দশা আমার আর সহ্য হয় না।

নগর—(কর্কশ স্বরে) সো হোগা নেই।

নরেন্দ্র—(দণ্ডায়মান হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে। তবে আমি বিদায় হই।

বসন্ত—(ক্ষণকাল পরে) মনে করি, এইবার দেখলে বুঝি আর বোদন-বদনও
দেখব না - বন্ধন দশাও দেখব না। নাথ! —সেই আশায় কতবার চোখ
বুজ্জলেম—চাইলেম, তবু বন্ধনদশা!—সেই বোদন-বদন! বলো তো তুমি
কি অপরাধে অপরাধী? হে বাজপুত্র! তুমি কার কি মন্দ কবেছ? তুমি
কার কি ধন চুপ কবেছ? তোমারে চোরের চেয়েও যে, কঠিন বেঁধেছে।
(উপবেশন) সত্যি সত্যি যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে থাক, তবে
তার প্রতিশোধ কি ধনে হয় না? তোমার পাব ধরি খুলে বল। তার
প্রতিশোধ কি হবে না। আমার সমস্ত অলঙ্কার দিচ্ছি, বহুমূল্য পটবসন
দিচ্ছি, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাও দিচ্ছি, তাও যদি শোধ না হয়,
আমি র প্রাণ দিচ্ছি, তোমায কেউ যেন কিছু বলে না। (নগরপালের প্রতি)
তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই? যার নয়নজল পড়লে হৃদয় বিদৌর্ণ হয়
—পাষণ্ড গলে যায় তোমার প্রাণ কি পাষণ্ডের চেয়েও কঠিন? রক্ত-
মাংসের শবীর যে এমন এ আমি কখন দেখি নাই। কারো মুখেও শুনি
নাই। হঠাৎ বন্ধনে নাথের বিরস-বদন দেখেও কি তোমার অন্তরে দয়া
হল না? ঐ মুখের কাতর স্বর শুনেও কি তোমার মন যেমন তেমনি
খাকল? কিছুই মায়া হলো না? ঐ চক্ষের জল দেখে এখনও যে বিশাল-
নয়নে চেয়ে রয়েছ, ধন্ত তোমার কঠিন প্রাণ! (বোদন)

নরেন্দ্র—রাজার আজ্ঞা, নগরপাল কি করবে?

বসন্ত—কি ? —রাজার আজ্ঞা ! তুমি এমনই কি অপরাধ কবেছ যে, পিতা হয়ে
পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা কললেন ?

নগর—(হস্ত-স্থিত বস্তু ধরিয়া যুবরাজকে আকর্ষণ) আর দেরি করণে নেহি
শাকতা ।

বসন্ত—হায় হায় ! প্রাণ বে গেল নগরপাল ! তোমার পায়ে ধরি । আর অমন
করে টেন না । এই কণ্ঠহার তোমায় দিচ্ছি, কণকাল অপেক্ষা কর আমিও
নাথের সঙ্গে যাব । (হার প্রদান)

নগর—মহারাজ কা হুকুম, ক্যা করেরগা, (হার গ্রহণ, যুবরাজের বক্ষন মোচন)

নরেন্দ্র—না—না, তুমি আমার সঙ্গে যেওনা, এ হতভাগার সঙ্গে গিয়ে তুমি কেন
অপমানা হবে ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে । তুমি ঘরে থাক ।

বসন্ত—তোমার এই দশা দেগে আমি ঘরে থাকব ? তোমার মান চেয়েও কি
আমার মান অধিক ? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব । আগা-
দের দুজনকে দেখেও কি মহারাজের মনে একটু দয়া হবে না ?

নরেন্দ্র—(কাতর স্বরে) তুমি রাজার নিকটে যেওনা, আমিই একা যাই ।

বসন্ত—মিনতি করে বলছি, এই দুটি চরণ ধরে প্রার্থনা করছি, (পদধারণ) আমায়
নিষে চলুন ।

নরেন্দ্র—যদি একান্তই যাবে, তবে চল । [সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে গান)

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়া ।

মিছে কেন মিছে ভবে এত অহঙ্কার ।

ভাবিতে কি হবে ভবে হেন সাধ্য কার ॥

ছিলাম রমণী মনে,

প্রেমরসে আলাপনে,

মিছে প্রণয় বন্ধনে,

করি হাহাকার ।

মনে ছিল রত আশা,

সকলি হলো নিরাশা,

জড়িলে আগের দ্বারা,

হেরি অন্ধকার ।
 আমার যুগল করে,
 কঠিন বন্ধন করে,
 পরান কেমন করে,
 বাঁচিনে যে আর ॥

তৃতীয় বন্দন

ইন্দ্রপুর, রেবতার শয়নমন্দির, — রেবতা, মালতী, বীরেন্দ্র সিংহ, বৈশ-
 ম্পায়ন, নবেন্দ্র, বসন্তকুমাৰী, নগরপাল, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত ।

বীরেন্দ্র — (ক্রোধযুক্ত স্বরে) বে ছায়া ! রে কুলাঙ্গার ! তুই এখনও আমার
 সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস ? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি ? নানা শাস্ত্রে বিশারদ
 হয়েছিলি ? তার ফল বুঝি এই ফললো ? তোর এতবড় আশ্পর্ক, ধর্ম
 বলেও তোর ভয় হলো না ? রে পাপাত্মা ! তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত
 করতে হয় । এই অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তক
 ছেদন করতেম, তা করবো না । তুই যে পাপ করেছিস, তোর মাথা কেটে
 কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র করবো ? তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায়
 লুপ্তি হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ করবো ? বীরেন্দ্র সিংহের রাজ-
 পুরীষ মহত্ব যাবে ? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে, ঐ প্রজ্বলিত অনলে
 প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন কর । যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস, তবে
 এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ বন্ধন কবে এই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো ।

নবেন্দ্র — পিতঃ । আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুনে ফেলতে হবে না । আপনি
 বখন আজ্ঞা করেছেন : তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য । তবে আসন্নকালে এই
 নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধী, সেইটি শুনতে চাই ! যদি কোন
 অপরাধও না করে থাকি, আর আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্ম-
 সমর্পণ করতে অনুমতি করছেন, তাও বলুন । আমি সন্তোষ হৃদয়ে আপনার
 আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুণ্যের কাজ করছি ।

বৈশ — যুবরাজ ! আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী, সুতরাং
 আপনি দণ্ডনীয় ! মহারাজ রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, অতএব আপনার
 প্রাণবিনাশ করে সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন ।

নরেন্দ্র—(নিস্তব্ধ) হা ভগবান ! (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ? আর কেঁদো না ।

এ কাঁদবার সময় নয় । কাঁদলে আর কি হবে পিতার আজ্ঞা ! তুমি আমার
জন্মশোধ বিদায় দেও । পিতা : ! আমি বিদায় হলেম ! —মা রেবতী !
আমায়ে জন্মেব মতন বিদায় দিন !

বসন্ত—(সরোদনে) নাথ ! আমি যে চিরসন্ধিনী, যেখানে যাবেন আমিও সেখানে
যাব ! (বোদন)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে । সে কি কথা ? তুমি এখনও বুঝতে পার নাই ? আমি জন্মের
মত বিদায় হচ্ছি ।

বসন্ত (উচ্চবোদনে) তা কখনই হবে না । —বসন্তকুমারী তোমায়ে কখনই
প্রাণ থাকতে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ করতে দেখবে না । 'আপে'
আমিই আগুনে কাঁপ দিব । এও কি কখনও হয়, যে, পতির মরণ স্বক্ষে
দেখে সতী-স্ত্রী জীবনধার করে থাকে ? নাথ । এই দেখুন সেই বিবাহের
রাত্রে । অলঙ্কার অঙ্কেই আছে, পায়েব আলতা পায়েই আছে, সিঁতার
সিঁদুরও মলিন হয়নি, এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ করবো ।
মিনতি কবে বলছি চিরসন্ধিনী অভাগিনীর চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও,
আমি তোমাব সম্মুখে ঐ জলন্ত অনলে প্রবেশ করি ।

নরেন্দ্র—তবে প্রস্তুত হও ।

বসন্ত--আমি প্রস্তুত আছি । কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা !

নরেন্দ্র—(পিতৃচরণে প্রণাম করিতে উত্তত) পিতা : ! বিদায় হলেম ।

নীরেন্দ্র—পামর ! তুই আমার স্পর্শ করিস না । কখনই করিস না !

নরেন্দ্র—(ম্লান মুখে) মন্থীবর ! নরেন্দ্র অত জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করছে ।

মন্থীবর ! আপনি শৈশবকাল হতে আমার যে এত স্নেহ করেছেন,
হতভাগা দ্বারা তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না । সমস্ত অপরাধ মার্জনা
করবেন, আর প্রিয়বন্ধু শরৎকুমারকে বলবেন, নরেন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনে
অনলে আত্মবিসর্জন করেছে । (শরৎকে উদ্দেশ্যে) প্রিয়মিত্র শরৎ ! মরণ
সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না ? মনের কথাও বলতে পারলো না ।
মিত্র ! অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জনা করো । বন্ধু ভেবে
কোনদিন যদি কিছু কড় কথা বলে থাকি, মার্জনা করো । পুণ্যসিগন্ধ !

জননী মৃত্যু সময় তোমাদের হাতেই আমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোমাদের কিছুই উপকার করতে পারলেম না মার্জনা করো! মা রেবতী! বিদায় হই! জন্মের মত বিদায় হই। পিতঃ! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো। (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিতঃ! --(বসন হঠাতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা একবার পাঠ করবেন। পত্র দান বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে অনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র—(পত্র হস্তে করিয়া) নরাদমের পত্র পড়ব? না, পড়ব না। ও পাপাত্ম্য পত্র হাতে করাই অগ্নায় হয়েছে। (ছিন্ন করিতে উগ্ৰত)

বৈশ—(করবোড়ে) মহারাজ! পত্রখানা নষ্ট করবেন না। যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে অনলে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর প্রতি আর কোপ কেন? তাঁর পত্র পড়তে হানি কি? একবার দৃষ্টি করুন। অবশ্যই কোন কারণ থাকতে পারে।

বীরেন্দ্র—(পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতী!

মালতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদধারণ) দোহাই ধর্মাবতার! আমি কিছু জানি না। আমার কোন অপরাধ নাই। রাণী এই পত্র লিখে যুবরাজের হাতে আমায় দিতে বলেছিলেন, তাই আমি দিয়েছি। দোহাই ধর্মের! আমি আর কিছু জানি না। যে দিন বাণী পত্র লেখেন, সেই দিন আপনি এই পত্র রাণীর থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আবার আপনি ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রাণীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছামিছি একটা চল করে গায়ের গহনা খুলে মাটিতে পড়ে ছিলেন।

রাজা—(আর্তস্বরে) নরেন্দ্র! —আমার নরেন্দ্র! —বিনা অপরাধে! —আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই! হায়! হায়! হৃষ্টারিণী রেবতীর ছলনায় আমার নরেন্দ্রকে! —প্রাণের নরেন্দ্র! --ওরে পাপীয়সি! রে পিশাচী! —তোমার শাস্তি— (সজোরে তরবারি আঘাত)

রেবতী—(ভূতলে পতিত) যুবরাজ! আমিই তোমার জীবন-নাশের মূল। আমার নশ্বুর শাস্তি হয়েছে। —হ-য়ে-ছে— যুব-রাজ! (প্রাণত্যাগ)

বীরেন্দ্র—(সরোদনে) মন্ত্রীবর ! পিশাচীর শাস্তি হয়েছে ! হায় হায় ! আমার কি হলো ! আমি কোথা যাব । আমার নরেন্দ্র ! নরেন্দ্র ! আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি হায় হায় ! কি অধর্মের কাজ করেছি ! বিনা-অপরাধে, বিনাদোষে আমার কলতিলককে,—আমার বংশের শিরোমণিকে,—আগুনে পুড়ে মারলেম ! হায় হায় ! আঁ ! কি পাপও,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকারী বসন্তকুমারীর প্রতি ফিরেও চাইলাম না । মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই অনন্য প্রবেশ কললেন । আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না । ষিক আমার জীবনে । (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে) মন্ত্রীবর ! আমার কি হবে ? আমি কোথা যাব ? আমি দুর্ভাগিণী যেবতীব কথাই ভুলে প্রাণাধিক সন্তানেব প্রতি এগন নিষ্ঠুর আচরণ কললেম । মায়াবিনীর মায়াই ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জন কললেম ! হায় হায় ! দুষ্চারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়ে পাঁচ নাই, আমার মত নরাধম নির্দোষ আর কে আছে ? আমার মত পাপাধম মুখ দেখতে নাই । মন্ত্রীবর !
—আমার নরেন্দ্র কি যথার্থই আগুনে পুড়েছে ! নরেন্দ্র ! (পতন ও মুচ্ছা)

মন্ত্রী—(জল সেচন) এখন দুঃখ করলে আর কি হবে ?

বীরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎপরে চেতন পাইয়া) হা ! আমার প্রাণ এখনও পাপদেহে রয়েছে ! নরেন্দ্রই যদি প্রাণত্যাগ কলনো, তবে আমার জীবনের ফল কি ? এ পাপাত্ম্য জীবনে ফল কি ? হায় হা ! কি বলেই বা দুঃখ করি ! কোন মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি ! মন্ত্রীবর ! যথার্থই কি আমার নরেন্দ্র ভীষিত নাই । সত্য সত্যই কি আগুনে পুড়ে মরেছে ! আমি সেই আগুন দেখব । আর সহ্য হয় না । (শিবে কবাসাত করিতে করিতে গমন) হায় ! হায় ! এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মবেছে ! (অগ্নির দিকে দৃষ্টি-পাত কবিয়া উচ্চস্ববে) অগ্নিদেব ! আমার নরেন্দ্র দাও ! —প্রাণাধিক নরেন্দ্র ! —নিরপরাধী শিশু ! —আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও ! নরেন্দ্র প্রাণেব নরেন্দ্র ! বিনাদোষে দ্বিগ্ন-অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আগুনে—হায় ! হায় ! প্রাণের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেম । উহ ! কি নির্দোষ কথা—দুষ্চারিণীর পত্রখানা হাতে করেও সে সমস্ত পড়ি নাই, কি কুংক —সত্যই কুংকিনী আমাকে কুংকজালে আবদ্ধ করেছিল ! ষিক

আমাকে ! দিক আমাকে ! বাছা নবেরু ! কোলে আয় ! আর মজ্জা
না, বাপ ! কোলে আয় ! (অগ্নিতে প্রবেশ) .

মল্লী—হায় ! হায় ! একি হইল । সর্বনাশ হইল (শিরে করাধাত করিতে করিতে)
হায় ! “বৃদ্ধস্ত তরুণী ভাষা” “বৃদ্ধস্ত তরুণী ভাষা” শিরে করাধাত
করিতে সকলেব প্রস্থান ।

সম্পূর্ণ ।

গো-জীবন

প্রথম প্রসঙ্গ

গো-কুল নির্মূল আশঙ্কা

ভারতের অনেক স্থানে গোবধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতা শ্রোত বহিঃ নছে, ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে, একপ্রায়ে, একযোগে গোবংশ বক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংবেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এসময় আর নিরব থাকা উচিত মনে কবিলাম না।

আমি মোসলমান—গোজাতিও পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি। পালিষা, পুষিষা বড় বলদটির গলায় ছুবি বসাইতে পারি। ধর্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো বংশের প্রাণসংহাব করিয়া পোড়া উদর পরি-পোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন ভাব বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। স্বফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পবাসীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসলমান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইব।

আমাদের মধ্যে “হালাল” এবং “হালাম” দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যজ্য। একথাও স্বীকার্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অগ্ন্যংস ও অন্তমতে (মাকি) হালাল। আমার মতে (হানিকি) হালালও বলিতে পারি না, অগ্ন্যংসও বলিতে পারি না। মাংসমাকি একটা নামও আছে (মকরুহ) আরও এই মাকি মতে অলঙ্কৃত মাত্রই হালাল। দুইস্থানে একথা বলিতে পারি যে বজ্রকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বজ্র ধোত সময়

ডুবিয়া থাকে সারি মতের দায় দিয়া সে মন্তব্য পদটুকুও জল মধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া কলসা, পোড়া, সিদ্ধ, স্তব্ধা যাহার যেকোন অতিক্রম হয় করিয়া উদরে মেল, কোন চিন্তা নাই, কখনই পবে খাওয়া নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াতেই হইবে, গোমাংস গল্গল করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য—যথা বরাহ সে বিষয় পবিত্র কোরান শরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখ “খাইওনা” (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক “জাহান্নাম”, তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া বাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ কবিত্তে হইবে—এ কথাও কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি;—খাইনা। ফড়িং ধরিয়া স্বতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোমাংস উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তও ঘোঁষনা, যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই “আল্লাহ আকবর” শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশ্রয়ে তাহার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিকি মোটাগোটা চাকিদার জিনিস বানাইয়া কোরমা, কালিয়া, কাবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিব খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? তাহেই নিবীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেঘ, ছাগল, মৃগ, খরগোস সকলি তো চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও তো ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহবার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গো দুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিত্তে থাকি, সে সময়,—হায়! এমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের তো দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গোদুগ্ধ মায়ের উদরে না গেলে মায়ের

স্তনে দুগ্ধ পাই কই ? মাগেব স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গোরসে জীবন রক্ষা করিয়াছে । মিষ্টান্নে, পক্ষান্নে সত্ত্বেও নব শিশুর প্রাণরক্ষা হয় না। দুগ্ধই জীবের জীবন । জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাদ্য নির্দিষ্ট নাই যে শুধু সেই খাদ্যটি খাইয়া জীবনধারণ করা যায় ।

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য । শুধু অসুস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণসংকট হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন ; সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আব কি রক্ষা আছে ! কালেব মাহাত্ম্য যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার কবি, মাংস খাইতে শিখিয়াছি বলিয়া যদি দুগ্ধের কথা মনে না করি, তত্ত্বেও উপকারী পশু প্রাণী সদৃশভাবে সদবাবহাব করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ক্ষতি কি ? বড় হইয়াছি আর দুগ্ধের ধার কে ধারে ? কিন্তু এদেশে গো জাতিয় সাহায্য ব্যতীত বলুন তো কোনরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে ? কখন না । বে খাদ্যই প্রস্তুত কবিলে গো জাতির উপাসনা কবিতাই হইবে । এদেশে অন্য কোন পশুর দ্বারা ভূমি কৰ্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই । কাজেই বলদেব দণ্ডকার । প্রথম কৰ্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক ? এহেন গোরত্বকে মারিয়া, কাটিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা ? মানিলাম—বুদ্ধি খাটাইয়া বিনা বলদে ভূমি আবাদ করিতেও ক্ষমতা আছে—কল কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে, কিন্তু একাধারে এত গুণ আর কাহার ? সে অপরিমীম গুণ সকল কি কাঁবয়া ভুলিয়া যাই । কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া গোজাতির অসীম গুণ ভুলিব । ভ্রাতাগণ ! আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না । স্রাতঃ ! জগতে কাহার বিষ্ঠার কে কবে আদর করিয়াছে ? আমবা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি কিন্তু যথার্থ হিন্দুগণ ঐ বিষ্ঠাবই বা কত আদর করেন । শুধু বিষ্ঠা কি আর আমাদের আদরের নহে ? গোমূত্রেও উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয় । পুত্র, কন্যা, ভ্রাতার সহিত জীবনেই সম্বন্ধ । যত উপকার, যত সাহায্য, যত লাভ, দেহে প্রাণ থাকিতেই সম্ভবে,—মানব জীবনে আশাও তাহাই । কিন্তু ভাই ! গোজাতি মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে । আহা ! প্রথম দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার সমস্ত প্রকার উপকার করিল,—মাগেব চামুড়া দিয়া তোমার পদসেবা করিল—আর

চাও কি ? তাহার শরীরের শিরাই কি ফেলিবার জিনিস । অস্থির দ্বারা তোমারই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । অকস্মাৎ অস্থিগুলির কথাই কি ভুল। যায় । নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার কবিয়া তোমারই খাতের সুবিধা করিতেছে । এত উপকারী যে তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি একটুকুও দয়ার সঞ্চার হয় না ? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে । নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, যত ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিও না । ভাইরে ! তাহার জীবনের কষ্টক হইও না ।

আর একটি কথা । এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান । পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না । আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই । ঋণ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই । এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সাতাদের সঙ্গে এমন চিরসঙ্গি বাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না । উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না । প্রাণের হানিও বোধহয়—হয় না । এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আব বাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না । যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে তাগে ক্ষতি কি ? ভাইরে ! এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর সহিত গাম না হইয়া যদি খৃষ্টানের সহিত বসবাস হইত আর তাহাদের প্রতি ঘরে ঘরে—আমোদে, আহ্লাদে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পণে-ঘাটে, মাঠে, বাজারে—প্রকাশ্য স্থানে শূকর বধ হইত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি ঘটিত ? ঐ মহানগর কলিকাতায় নিউমার্কেটে এখন যে প্রকার গোমাংস বিক্রয় হয়, ঐরূপ যদি শূকর মাংস বিক্রয়ের দোকান খুলিত তবে আমাদের মনে কি ভাব হইত ? কি কথা মনে উঠিত ! তাহা কি ভাবা যায়,—না মুখে বলা যায় । তবে রাজ্যবিধিতে সকলের মাথাই নওয়াইয়া রাখিয়াছে । কিন্তু মনের আশ্রয় মনেই জ্বলিতেছে, পূর্বেই বলিয়াছি জগত পরাধীন—মন স্বাধীন । আমাদের রাজার চক্ষে শূকর গরু উভয়েই সমান । কাজেই তাহাদের মনে হিন্দু মুসলমানের মর্মেহিত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে । তাই বলিয়া কি

আমরা বুকের ছাঁতি ফুলাইয়া রাজবিধিতে বারণ নাই—গোবধে হত নাই বলিয়া ভ্রাতার মনে মর্শাস্তিক আঘাত করিব ? আমার মতে একথা কথাই নহে । কালে আমবা বাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি । বাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পাবেন । কিন্তু হিন্দু মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না । —পরস্পর কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারে না । জগত যত দিন—সম্বন্ধও ততদিন । এমন গুরুতব সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিতে আমাদের মনে কি একটুকু ব্যথা লাগে না ।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটা কথা মনে পড়িল । তাহার মীমাংসা না করিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না । মোসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন, উপকারীজনের উপকাব মনে করিয়া, কি হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্শাঘাতেব কথা স্মরণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম, কিন্তু জগতের একমাত্র সহায় বল, আশ্রয় যাহা কিছু বল—সকলি ধর্ম । ধর্ম সার - ধর্মই মূল । সেই ধর্ম, সেই এসলাম ধর্মে বলিতেছে কোরবানি কর । মানিলাম বিধি আছে, সে বিধি লঙ্ঘনের উপায় নাই—তাহা যথার্থ । কিন্তু ভাই । সে তো বৎসবের মধ্যে একদিন মাত্র । তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল । অতি কম হইলেও সমগ্র ভারতে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার গোধন পাকস্থলিতে মজিয়া যাইতেছে । অতি কম হইলেও হাজার গোবৎস কেবল স্তব্ধাঘ উড়িয়া যাইতেছে, এগুলি তো রক্ষা পাইবে । অল্পমানের কথা নহে, কল্পনাবও চিত্র নহে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি নির্দয় কসাইগণ যে সময় সেই একাক্ষ, কি মাসেক বয়সের গোবৎসগণের পা বান্ধিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া মাথায় করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যায়, তখন মানুষ মাত্রেই চক্ষে জল আইসে, হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে । আহা ! গোবৎসগুলির সেই সময়ের কাতর রব শুনিলে মনে যে কত কথারই উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই—কি করি ! যাক সে চিন্তা, সে কথা বৃথা ! যে কথা বলিতেছিলাম, বৎসরে একদিন কোরবানি না দিলেই নহে । ইহা স্বীকার্য্য । মোসলমান মাত্রেই একথা স্বীকার্য্য । কিন্তু কোরবানির কারণ কি ? কেন কোরবানি (বলি) প্রথা প্রচলিত হইল, ইহার গূঢ়তম প্রতি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় মোসলমান সমাজের এক-বারে দৃষ্টি করা আবশ্যক । সাধারণ জ্ঞানে যে ‘ইদজ্জহায়’ গরু কোরবানি না করিলে ধর্ম রক্ষায় থাকে না, মোসলমানিও রক্ষা পায় না—এটি সম্পূর্ণ ভুল ।

‘আমি শান্ত দ্বারা দেখাইব, প্রমাণ করিব যে, গরু কোরবানি না দিয়াও ধর্ম রক্ষা হইতে পারে। মোসলমানিত্ব অটলভাবে থাকিতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে হজরত এবরাহিম খলিলল্লাহ এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন ‘এবরাহিম! আম’র নামে বলি দাও’—প্রাতে এবরাহিম একশত উট বলি দিলেন। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম! তোমার বলি গ্রহণ করি না। বলি দাও। পবদিন মহাঈশ্বর এবরাহিম পুনরায় শত উট বলি দিলেন। বিধাতার লীলা বুঝিতে সাধ্য কার? তৃতীয় রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম তোমার বলি গ্রহণ হয় না; বলি দেও। ঘোর তপস্বী এবং ঈশ্বর ভক্ত এবরাহিম স্বপ্নাবেশেই মহাশীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! এ দাম আজ্ঞাব তাৎপর্য কিছুই বুঝিতেছে না। তিনদিনে তিনশত উট বলি দিয়াছি, গ্রহণ হইল না। এইক্ষণে আমি কি বলি দিয়া আত্মা প্রতিপালন করি। বলির উপযুক্ত আমার আব কি আছে? উত্তর হইল, এবরাহিম! তোমার বিশেষ ভালবাসা যে, তাহাকে বলি দাও, অর্থাৎ তোমার সন্তানকে বলি দাও। চিবভক্ত এবরাহিম প্রাতে উঠিয়া প্রথম স্ত্রীর নিকট, শেষ ইসমাইলের (পুত্র) নিকট ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ করিতেই তাহারা মহানন্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। তখনি এবরাহিম ইসমাইলকে স্নান করাষ্টয়া ধৌত-বস্ত্র পরাইয়া গায় স্বগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া এক স্ত্রীলোক ছবিকা হস্তে পুত্রসহ কোরবানি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রের গলায় ছুরি বসাইতেই দৈববাণী হইল, এবরাহিম! তুমি ধন্য—তুমি যথার্থ ভক্ত। কিন্তু এবরাহিম! জগত বড় কঠিন স্থান, মায়া বসে সকলেই মোহিত। পুত্রের গলদেশ বিনির্গত রক্তের ধারা দেখিয়া—সে বচনমণ্ডলের বিকৃতভাব চক্ষে দেখিয়া তোমার মনে অল্প কোন ভাবের উদয় হইলেও হতনে পারে। তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে। তাহাতেই আদেশ হইতেছে যে, তুমি বস্ত্র দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার এ কীর্তি জগতে অক্ষয়কীর্তি স্বরূপ জলন্তভাবে চিবকাল দেদিপ্যমান থাকিবে। এবরাহিম তাহাই করিলেন বলিব পর দেখিলেন যে, ইসমাইল মহাজ্যোতি স্বরূপ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে একটি “দোহা” পড়িয়া আছে, রক্তের ধার ছুটিয়াছে। সেইদিন হইতে কোরবানির স্মৃতি। এ পর্যন্ত মোসলমান জগতে প্রচলিত, ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ, স্মরণীয় কর্তব্যসম্বন্ধে পরিগণিত।

ঘটনা স্থান 'মক্কা' হজরত মহম্মদের গম্বুজের পূর্বে। এখন কথা! এই যে প্রথম কোরবানি দোহা। আরবদেশে আজ পর্যন্ত দোহাই অধিক পরিমাণে বলি হয়, উটও বলি হইয়া থাকে। আবার কেহই গরু কোরবানি করে না। ধর্ম্মেয় গতি বড় চমৎকার। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মোসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসি-
 যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আসিয়াছে। এদেশে দোহা নাই—দোহার পরিবর্তে ছাগল, উটের পরিবর্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। এখন বুঝিলেন পার্থক্য! বুঝিলেন কেন এ কথাটা এই প্রস্তাবে সংযোগ করিলাম। গরু কোর-
 বানি না হইয়া ছাগলও কোরবানি হইতে পারে। তাহাতেও ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ইহার পরেও একটি কথা আছে যে, এক গরুতে সাতটি লোকের কোরবানি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, একটি ছাগ একজন ভিন্ন দুইজন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাঘবে গরুই অগ্র-
 গণ্য। কিন্তু ভাই! এ কথাব আশ্রয় তুলিয়া আমাৎ মুখবন্ধ করিতে পারিবেন না। কোরবানির গরুব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার একটি গরুর মূল্য ২৫টি ছাগল পাওয়া যাতে পারে। তুমি বৎসব বৎসব ২।৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক। আবার সে ২।৩ টাকার ক্ষতি চামড়া বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনাবায়ে ধর্ম্ম রক্ষা। লাভের লাভ তন্তুলাভ মাংস। একযাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম্ম রক্ষা, অর্থ রক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক, আর বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; সকাতে প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক, এবং গো খাদক নামে যেন আর আমবা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয়-কুলই রক্ষা হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

গোধন কি সামান্য ধন ?

গোধন কি সামান্য ধন? চতুষ্পদ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কি গো-
 জাতিকে সামান্য পশু বলিয়া মনে করিব? অকর্ষন্য পশুগুলিকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেই চক্ষে কি গোজাতিকে দেখিব? মনে কি বলে? মোসলমান ভাড়া-
 গণ! মনের দ্বার খুলিয়া নিরপেক্ষভাবে বলুনতো—মনে কি বলে? দোহাই আপনাদের পিতা মাতার, মনে এক, মুখে আর বলিয়া স্ব-স্বমতেই পোষকতা করিবেন না। চক্ষু চক্ষে যাহা দেখিতেছেন, গোজাতির দ্বারা যত প্রকার উপকার পাইতেছেন, একে একে সেই কথাগুলি মনে করিয়া মনের কথা বলুনতো, গোধন কি সামান্য ধন? গোজাতি কি সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শাস্ত্রে

গোজাতির গুণের কোন কথা উল্লেখ নাই। অগ্নাত “হালান” পশু শ্রেণী মধ্যে কেবল নাম মাত্র রাখা আছে। শাস্ত্রে গোজাতির গুণাগুণ বর্ণন নাই বলিয়া কি সামান্য পশু ছাগল, ভেড়ার সহিত গোধনের তুলনা করিব। হরি! হরি! সেই দীর্ঘকায় উটের সহিত কি ইহার সামনজস্ত দেখাইব? যদি ইসলাম ধর্ম রবি প্রথমে ভারতেই উদয় হইত, যদি মোসলমান ধর্ম জ্যোতিঃ প্রথমে বঙ্গের প্রকাশ হইত, যদি নূরনবী হজরত মহম্মদ মুস্তফার অভ্যুদয় ভারতের কোন অংশে হইত, তবে বোধহয় গোজাতি সামান্য পশু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত না। তিনি বিড়ালকে আদর করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত মোসলমান সমাজে সেই আদর অতি আদরের সহিত রহিয়াছে। কুকুরকে ঘৃণা করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কুকুর ঘৃণিতই রহিয়াছে। আরবে উটের যত আদর ভারতেও গোকুল সেই প্রকার আদরের ও যত্নের বলিয়া বর্ণিত হইত; —পবিত্র কথাটাও সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে থাকিত। কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান ধর্ম সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান জাতি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুর সহিত একত্রে বাস করিবে? —পরস্পর আত্মীয়তা ঘটিবে? —একের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে? একাত্ম এক প্রাণ হইয়া কাষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? বিশ্রামদায়িনী নিশার অবসান হইলেই পরস্পর দেখাশুনা ঘটিবে? তাহা হইলে বিধি হইত, ব্যবস্থা হইত, গোজাতির উৎকার বিষয় বর্ণিত হইত। দেশভেদে শাস্ত্রের প্রভেদ, জল-বায়ুর গুণাগুণে আহারবিহার পরিচ্ছদের বিভেদ, যদিও ইহাশাস্ত্রের কথা নহে। কিন্তু যুক্তির আয়ত্ত এবং কারণেব অন্তঃভুক্ত। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে যেমন গোজাতির বিষয় বিশেষ রূপে কোন কথা লিখা নাই, অগ্নাত পশু সম্বন্ধেও লিখা নাই; —আছে কেবল উট আর দোষাব কথা যাহা ভারতের নিম্প্রয়োজন, যাহা বঙ্গের অপুচ্ছ ও তুচ্ছ। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে, সহজ জ্ঞানে ইহাতেই তো বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা, আবশ্যকানুসারেই পবিত্রতা।

দৃষ্টান্তস্থলে আরও কিছু বলিব। শাস্ত্রে কোন কথা নাই, বর্ণনা নাই, নামটিও নাই, করিলে শাস্ত্রমতে বোধহয় পাপও নাই এমন শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য কি আমরা করি না? সকলই করিয়া থাকি। খাওয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞে প্রথম প্রস্তাবেই

বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বার বলা নিম্নয়োজন। পাঠক! অত্র বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ভ্রাতা মোসলমানগণ! বলুন তো মোসলমান হইয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করা কোন হাদিসে আছে? একি দেশ প্রথা নহে? গুড়গুড়ি কি পেঁচাও-নলেব বাহাব দিয়া স্তম্ভক্লিয়ুক্ত তামাকের ধূমপান করা কোন বিধি সঙ্গত? লাল রঙ্গের নাগবা জুতা কি কাল রঙ্গের চড়াতোলা জুতা ব্যবহার করা এটা কি? বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করার বিষয় কি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে? টেলিগ্রামে, টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য নহে? বিলাতি দেশলাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না? কি পবিত্রতাপ! হায়! হায়! কি দুঃখের কথা! মানচেষ্টারের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে একথা কি শাস্ত্রে লিখা আছে? কেবল শাস্ত্রে গোজাতির কোন প্রকার উপকারের কথা লিখা নাই বলিয়া কি তাহার উপকারিতার বিষয় স্বীকার করিব না? যাহা পুরুষ, পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, চক্ষে যাহা দেখিতেছি, অস্ত্রের শিবায শিবায যাহার প্রমাণ পাইতেছি, প্রতি শোণিত বিন্দুতে যাহার সাক্ষ্য দিতেছে, তত্রাচ বলিব যে গোজাতির বিষয় শাস্ত্রে কোন গুণের কথা লিখা নাই। গরুর গুণ কেন স্বীকার করিব? কেন গোবধে ক্ষান্ত হইব? আমাদের পক্ষে, গো, বৃষ, ছাগ, মেঘ, হবিণ, সকলি সমান। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য করিতে বলিব না।—বলিতে সাধ্যও নাই। শাস্ত্র রক্ষা করিয়া উপকারীজনের প্রত্যাশা করা মনুষ্যেরই কার্য। পশুরাই প্রত্যাশা করিতে সহজে স্বীকার হয় না। হিংস্রক জন্তুরাই প্রত্যাশা-কারের পক্ষপাতী। মনুষ্যে কেন প্রত্যাশার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে?

নব্বাধম কসাইগণই গোহত্যা করে। “কাচ্ছাব” শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে, কাচ্ছাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার। বেশ তো, কসাইগণ ব্যবসা করে, শাস্ত্রসঙ্গত কার্য করে, তবে সে কসাই নামে অভিহিত হয় কেন? সে কথা আমাদের মনে আঘাত লাগে কেন? আজ হইতে মনের ভার ফিরাইতে হইল। কারণ কসাই শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য করে না, ব্যবসাদার—ভাল কথা, বড় মিষ্টি সম্ভাষণ। পাঠক! মোসলমান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন? যে গো-হত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন? তাহা নহে। যাহার অস্ত্রের দয়া, মায়্যা, মমতা, কিছুই নাই, পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে, ব্যথা বোধ না করে,

তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন, সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের, কসাই হৃদয়ের তুলনা করিয়াছেন। মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! শাস্ত্রসম্মত কাৰ্য্য বলিয়া তাঁহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই। মহাঋষি, যোগী, ঘোর তপস্বী বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই। কসাই নীচ, অতি জঘন্য, কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। গো-জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান, এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু গোখাদককে কেহ কিছু বলেন নাই। কি ভ্রম! কি ভ্রম! আহা! কসাই কি নিজ উদর গোমাংস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে গোহত্যা কৰে? আপন সম্মান-সম্ভ্রম, পবিত্রাবগণের বসনা পবিত্রপি হেতুই কি নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইয়া থাকে? যাহাদের জিহ্বা গোমাংসের জ্ঞান লালিয়াত, যাহারা গরু হস্তম করিতে পটু, তাহারা কসাইদের মত বদাঙ্গ। যদি খাদক না জোটে, তবে খাওঁব আমদানি কে করে? নিজে খাওঁব কে নেনেব মহিষ ভাঙান! মোসলমান ভ্রাতাগণ! অপরাধ মার্জনা করিবেন, কথাত্বেই কপা বাড়ে, তর্কহলে অনেক কপা আসিয়া পড়ে, এই নোংরাখনি একটি কথা আসিল। যদি মোসলমান কবি কি লিখক মহামতিগণ কসাইকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরীভূত না করিতেন, তবে আজ এই অধমেব সামান্য লিখনি গোখাদক ভ্রাতাগণের মস্তকে উপর সঞ্চালিত হইত না। কাঁচা কথা লিখিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের মনে ব্যথা দিতাম না। তাঁহারা গোমাংস পোড়া উদবেব সেবায় না লাগাইলে কসাই মহাশয় কখনি গোহত্যা করিতেন না। কসাই নামেও সংশোধিত হইতেন না।

পাঠকগণ! মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতির গুণেব ব্যাখ্যা নাই—স্বতবাং সাধাবণ পশু মধ্যে পরিগণিত।—উদরে পোষণে দোষ কি? একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই। অত্রস্থ কোন মৌলবী মহামতির কথাব আভাষে বুঝিয়াছি যে, ঐকথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় কবিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। ধর্মেব দায় দিয়াই গোজাতির সর্বনাশ করিতে অগ্রগণ্য।—প্রতিবাদ করিবেন। ভ্রাতাগণ! আমিও প্রতিবাদ প্রার্থনা করি। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভা-সমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়চার, হৃদয় বিদারক, মর্মান্বহ, ভীষণ—মহাভীষণ ব্যাপারস্বরূপ—গোহত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমেব লিখনি ক্ষান্ত হইবে না। সেই কপা-

ময় ভগবান রূপায়, গোকুল রক্ষা কবিত্তে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে যতদিন ইহাব শেষ না হইবে ততদিন সমানভাবে চলিবে। আজ যদি সেই প্রাচীন নগর ইন্দ্রপ্রস্থব সিংহাসনে গোখাদক সমাটকে দেখিতে পাইতাম, কাজীসাহেবেব দোরবাব (চাবুক) ভয় আমার থাকিত তাহা হইলে এ প্রস্তাব জনসাধারণেব গোচর কবা দূরে থাকুক, মুখে আনিতেও পাবিতাম না। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ-সিংহ ইহাব শাসনকর্তা, গাথা কথা বলিতে কোন বাধা নাই—ভয়েরও কোন কারণ নাই। স্মরণ্য লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে। আমাব বোধ হইতেছে স্থানীয় মোসলমান ভ্রাতাগণ ঐ এক কথা বলিয়াই সবিনয় পড়িবেন, আমাব প্রস্তাবের সত্যাসত্য বিষয়ে কোনকথা আলোচনা বোধহয় না কবিলেও কবিত্তে পাবেন। যাহা হউক গোজাতিব উপকাৰিতা বিষয় হিন্দুশাস্ত্র সংগত যাত্রা দইটি বচন সহস্রে সাধাবন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে এবং কবায়োড়ে সবিনয়ে প্রার্থনা কবিত্তেছি যে, ভ্রাতাগণ আপনাবাও কি এ সময় নাব থাকিবেন? আমাব প্রস্তাবে পোষকতায় লিখনি সঞ্চালন কবিবেন না? অগাণ্য প্রদেশে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া গোধন রক্ষাব জল কত কি উপায় কবিত্তেছেন। টাঙ্গাইল মহকুমাব হিন্দু ভ্রাতাগণ! এ বিষয়ে কি এতদূরেই নীরব থাকিবেন? অগাণ্য স্থানে হিন্দু মহোদয়গণই ইহাব প্রধান নেতা হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, টাঙ্গাইলের শুভভাগে তাহাব বিপরীত। লিখক মোসলমান, পত্রিকাখানিও মোসলমানেব, এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাইবে? হিন্দু ভ্রাতাগণ! ইহা কি আমাব আক্ষেপেব বিষয় নহে? খাদক রক্ষাব কাল্লা কাঁদিতেছে, ‘আহমদী’ অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, সোনায মোহাণা মিশিয়াছে। কিন্তু আপনাবা নীরব! দেখুন তো আপনাব শাস্ত্রে কি বলে।

“লোকে হস্মিনমঙ্গলানন্তো ব্রাহ্মণো গোহৃতাশনঃ

হিবণ্যং সর্গি বারিত্তা আপোবাজা তথাষ্টমঃ ॥

এতানি সত্যং পশ্যন্তন মোবর্জ্য চযং।

প্রদহিণঞ্চ কুর্কত তথা চামূর্ণ হীয়তে ॥”

‘ব্রাহ্মণে, গো, অগ্নি, স্তবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা—এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল পদার্থ সর্বদাই ইহাদিগকে দেখিতে হইবে, নমস্কার কবিত্তে হইবে, অর্চনা করিতে হইবে, আর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। সমান যত্ন করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে, কেননা সকলেই আমাদের মহোপকারী।”

আবার দেখুন !

“গোমূত্রং গোময়ং ক্ষৌরং সপিদধিরোচনা ।

ষড মেতদধি মাঙ্গলাং পবিত্রং সর্বদা গবাং ॥”

“গোমূত্র, গোময়, গব্যাস্ত, দধি এবং গোচনা এই অষ্ট প্রকার গব্য দ্রব্যই শুভ । হিন্দুর সকল প্রকার শুভকর্মে ইহার প্রয়োজন ।”

এইরূপ বচন হিন্দুশাস্ত্রে শত সহস্র রহিয়াছে । সে সমুদায় বিবৃত করা আমার অনধিকার চর্চা । তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, মোসলমান তাহার শাস্ত্র বজায় রাখিয়া গোবধ জন্ত চীৎকার করিতেছে, টাঙ্গাইলের হিন্দু ভ্রাতাগণ নীরব ! ভ্রাতাগণ ! জানিবেন ভারতে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া একযোগে কোন কাৰ্য্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না । একপক্ষ শতবর্ষ কথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবেন না । অতএব পয়স্কা !

তৃতীয় প্রস্তাব

গোমায়স

খাও অখাও স্তখাও । —যাহা সকলেই খায় তাহাই সাধারণ খাও । যাহা কোন মানুষে ভক্ষণ করে না । —তাহাই অখাও । কুচি ভেদে, কাহারও অখাও, কাহারও স্তখাও । কুকুর, বিড়াল, শূগল, ভেক, ব্যাঘ্র, ছাবপোকা কাহারও স্তখাও কাহার অখাও । গরু কাহারও খাও, কাহারও অখাও । ছাগ, মেঘ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি কাহারও অখাও আবার কাহার কাহার উপাদেয় খাও । এই সকল গোলযোগে, যাহা সকল মানুষেই খায়, কি খাইতে ঘৃণা না করে, কোন প্রকার অস্বথেরও কারণ না হয়, তাহাকেই খাও বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছি । অখাও যাহা কোন মানুষে খায় না । স্তখাওের কথাতো পূর্বেই বলিয়াছি । এইক্ষণে কথা এই—দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া খাওের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । পাকস্থলির পেষণশক্তির শক্তি বুঝিয়াই উদর পূর্ণ করা উচিত । আমরা বঙ্গবাসী । আমাদের সাধারণ খাও কি ? দেশে পাঁচে একদিন কি কুটুম্ব স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের আগমন উপলক্ষে আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করি তাহাকে সাধারণ খাও বলিতে পারি না । সদা সর্বদা যাহা খাইয়া থাকি, সেই খাওই যথার্থ খাও । বঙ্গের জল, বায়ু, তাপ এবং মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ খাও নির্দেশ করিতে হইলে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া খাও নির্বাচন করিতে হইলে, একেবারে তেলেবেগুনে জলিয়া না উঠিয়া,—গরু খাইতে বারণ

কবে, এত বড় কথা ? —ইহাতেই আগুন না হইয়া শান্ত এবং শীতল হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে না চলে, আমরা তো খাটয়াই থাকি—আব কথা কি ? যাহারা এই বঙ্গরাজ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদের ও আমাদের কোন বিষয়ে যদি তারতম্য কি পার্থক্য থাকে, কি গোমাংস প্রভাবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পবিমাণে লাভবান বা বলবান হইয়া থাকি, কি কালে হইতে পারিব, তবে গোমাংস কেন ছাড়িব ? এইক্ষেণে দেখা আবশ্যক, বর্তমান জলবায়ু, তাপমাত্রা বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাওয়া কি গোমাংস ?—না একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জ্ঞাত এত লালসিত, এক টুকরা গোমাংসের জ্ঞাত যাহাদের এত জেদ এত প্রতিবাদ, পর্যন্ত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাঁহারা নাহা খাইয়া থাকেন ? প্রতি সন্ধ্যাই কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন ? না প্রতি সন্ধ্যাতেই গোমাংস বানজনে অন্ন রনজিত করিয়া থাকেন ? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্তি করেন ? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন ? ধর্মের দোহাই—মিথ্যা বলিবেন না। প্রতি সন্ধ্যা গোমাংস বানজন পূর্ণ বাটী সম্মুখে দেখিলে মনে কি বলে ? চক্ষু কি দেখিতে ইচ্ছা করে ? না হাতে তুলিয়া মুখে দিতে ইচ্ছা হয় ? প্রতিদিন যে খাওয়া খাইয়েছেন, যথা ভাত, ডাউল, তবকাবী, দুধ, মৎস্য ইত্যাদি। ইহা তৃপ্তিকর এবং রুচিকর। প্রতি সন্ধ্যা না হয় প্রতিদিন এই সকল খাওয়া উদব পবিপূর্ণ করিয়া জীবন বক্ষা করিতেছেন। বলুন তো কোনদিন কি ঘুমা হইয়াছে ? না হইবে ? যদি গোমাংস খাওয়া হইত, যদি গোমাংসই জীবনোপায়ের একমাত্র উপায় হইত, যদি বঙ্গবাসীরা খাওয়া হইত, তবে প্রতিদিন বন্ধনশালায় দেখিতাম, প্রতি সন্ধ্যায় অনেক সহিত প্রতিযোগিতায় একত্র দেখিতাম, প্রতি গ্রামে হস্তে দেখিতাম, পাতে দেখিতাম, মুখে দেখিতাম। চক্ষু ও জুড়াইত, মনও ভালবাসিত। ইহাতেই তো বলি মন স্বাধীন। সে না লিখকের লিখনিকে ভয় করে, না মৌলবী সাহেবেব অথবা ক্রোধে ভয় করে—প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্যেও সহজে ঘটে না। জোর জবরাণে ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকে না ? যিনি আহাবদাতা, যিনি আমাদের রক্ষাকর্তা, যিনি খাওয়াখাওয়ার সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার বিবেচনায় ভুলভ্রান্তির অতি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র অংশও যে আছে, আমি একথা বিগাস করি না। মনযোগ

সহকায়ে একটুকু চিন্তা করিবা। দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রেত তাঁর অতি সহজেই জ্ঞানগোচর হই। তিনিই দেশভেদে খাণ্ডের প্রভেদ কবিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণ খাণ্ড আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত খাণ্ডই আমাদিগের কুচিকর ও তুন্ডিকর। গোমাংস খাওয়াই যদি আমাদের কর্তব্য হইত, তবে এত স্বাস্থ্য ফলমূল শস্তাদি দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র পরিপূরিত করিতেন না। —নদী জলেও এত মৎস্য জন্মিত না। যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্ত করুণাময় ভগবান তাহা অপরিাপ্যপ্তরূপে দান করিয়াছেন। বঙ্গ খাকিয়া কি ইউরোপীনের খাণ্ডের অনুকরণ করা উচিত? না আরববাসীদিগের আহাবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উদর পূর্ণ করা বিধেয়? দেশভেদে আহাবের প্রভেদ—ইহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য।

কাল--অর্থাৎ সময়। বঙ্গবাসী মোসলমানদিগের এমন দুঃসময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, গোমাংস না খাইলে আর জীবন বক্ষা হয় না? এমন কোন সময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, অনাহারে মরি মরি হইয়া, না খাইতে পারিয়া প্রাণপাথি দেহদিনজ্বর হইতে উড়ি উড়ি হইয়া, গোমাংসে শুধু গোমাংসে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, জীবনীশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে? তুন্ডিক উপস্থিত হইলে আমরা কিসের অভাব মনে করি? কোন জিনিসে অভাবজনিত আগাদের কষ্ট বোধহয়? অন্তের—না গোমাংসের? বৎ কোন কোন সময় দুই একজন অর্প-শালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে, এবারে জলে মাছ নাই। ডাঙ্গায় গোমাংস নাই,—একথা বলিয়া কোন মৌলবী সাহেব করে আক্ষেপ করিয়াছেন? কোন ভ্রাতা গোমাংসের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করে? রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করেন? ইহাতেও কি বলিব যে গোমাংস আমাদের খাণ্ড। এ সময়ে, এ দুঃসময়ে গোমাংসই জীবনের জীবন, শবীর পোষক, এবং তুন্ডিক নিবারক?

এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। খাই গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল! বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খাডো ঘরে। চলাফেরা করি সৈঁতসৈঁতে ভিজ-মাটি, জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্তি, পেশী-শক্তিও তথৈবচ। সাহসের তো কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আরকি বলিব। চাল ভাল করিয়া সিদ্ধ না হইলেই মারা গিয়াছি।

—হাতেব জল আর শুষ্ক হয় না । দু'গ্রাস বেশী গলাধ করিলেই পেট ফাটিল প্রাণ
 আই-আই কুবিতে থাকে পাখরচুণীর পাতা আর লবণের দ্রবকার হয় না । এডে ।
 ক্ষমতাসমাবে হজমিগুলিবও আশ্রয় লইতে এসে । এমন জীব শক্তি-বিশিষ্ট মহা-
 পুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণেব উপযুক্ত পাত্র না হওয়া আর কে হইবে ? গোমাংস
 সহজে পরিপাক হয় না । অল্প জ্বালেও সিদ্ধ হয় না । সিদ্ধ হইলেও টানিয়া ছেঁড়া
 যায় না । ছিঁড়িলেও আবার দস্তে । এমন শক্তি নাই যে, উপযুক্ত মত পিষিয়া
 সহজে পরিপাকের উপযুক্ত কবিয়া দেয় । পাকযন্ত্রেবও পেষণ-শক্তি এত প্রবল নহে
 যে, যথার্থ খাণ্ডের ন্যায় উঠাকে যথা সময়ে পরিপাক করিয়া ফেলে । গোমাংস
 খাইলেই পেটের অস্ত্রখ, দাঁতেব অস্ত্রখ, তাহার পর গায়ের জ্বালা, মুখকান্তির,
 বিকৃতি শবীবের লাবণ্যহীন,—এতো ধরাবাঁধ কথা । তাহার উপর মহাব্যাধি ।
 আর চাই কি ? দশটি কুষ্ঠ বোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার
 মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মোসলমান ? দেখুন দেখি কেমন লাভ । এত
 উপকার যাহাতে, তাহা কি প্রাণ বরিয়া ছাড়া যায় ? আর একটি কথা বলিয়াই
 প্রস্তাব উপসংহার করিব । বঙ্গদেশে বাদশ কাব, বঙ্গের চিকিৎসা-শাস্ত্র কাকেরের
 শাস্ত্র—তাঁহা তো স্পর্শই করিব না । ভাক্তাই মতও তাহাই ! —এপিট আর
 ওপিট । হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে । ইউনান (গ্রীস) নিকটে না হউক,
 জলবায়ুর সহিত সমতা না থাকক, তত্রাচ আমবা বাদশার জাত বাদশাই
 দারু, বাদশাই মতের গ্রন্থেই মাননীয় । ভাল কথা—আমিও স্বীকার করি । ইউনানে
 হাকিমি মতের সৃষ্টি, স্মৃতির সংগ্রহের চিকিৎসা-শাস্ত্রই সর্বপ্রাণে গণ্য । মানিলাম
 তাহাই মানিলাম । আত্মগণ । সেই হাকিমি মতের বস্তুবিচার গ্রন্থে গোমাংসের
 গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন ।
 যদি মূর্থতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা
 করিয়া দেখিবেন, গোমাংসের গুণাগুণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তিনি কি
 বলেন । মলাধারে হারগাঁথা এক প্রকার কুমি, কোন মাংসে জন্মিয়া থাকে ? বাত-
 রোগেব জন্ম কোন মাংসে বেশী হয় ? স্বভাবে বাধা দিতেছে, রসনা অরুচির কথা
 কহিতেছে, মহাপ্রাণী অস্বীকার করিতেছে, চক্ষু দেখিতে বিরক্ত হইতেছে, দন্ত-
 ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে, পাকস্থলি পরিপাকে অশক্ত হইতেছে । —মনের বিকারেই
 ভগবানের আভাস পাওয়া যাইতেছে । তবু বলিব ? তবু স্বীকার করিব যে

গোমাংস বন্ধ করার খাণ্ড ? ভুগিতেছি, মরিতেছি, স্বচক্ষে ফলাফল দেখিতেছি, গোমাংস ভক্ষণের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তবু গোমাংস জন্ত যে জিহ্বা লক লক করে, যে জিহ্বায় রস পড়ে, দিক তাহাকে ! শতধিক ।

আবার আমার কায়কটি কথা

বিগত পৌষ মাসেব আখ্‌বারে এসলামীয়া পত্রিকায় “গোমাংস” প্রস্তাবেব যে প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা গো-জীবনে গৃহীত হইল । সমুদায় প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইলো । ন্যায়-অন্যায় সাব্যস্তে বিচারেব ভার পাঠকগণেব হস্তে । লিখকেব নাম, নাম, পরিচয়েব জ্ঞান কেহ ব্যস্ত হইবেন না । শীঘ্রই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন ।

যে প্রতিবাদে হিংসাব আভাস, ঘেষেব অপছায়া, অপকথাব স্প? আভা দেখা যায়, সেখানে লিখক নীরব । কিন্তু এক্ষেত্রে নহে । প্রতিবাদেব প্রতি কথার উত্তর পাইবেন । ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রতি ছত্রে ছত্রে নক্ষত্র দেখিবেন । এ ব্রিটিশ বাজ্য, ব্রিটিশ বিচার, ধর্ম্মাসনে জায়দেবুর নিবপেক্ষ, প্রতিভা প্রভাবে প্রমত্ত কনজরকেও ক্ষুদ্রপ্রাণী মশার হস্তে পবাস্ত হইতে দেখা যায় কে বলিতে পাবে কাহার ভাগ্যে কি আছে । ঈশ্বর মহাব, এলাহী ভবসা, ভগবান ক্ষমক ।

গো দুগ্ধ

দুগ্ধ জীবের জীবন । বিশেষ মানব জীবনের জীবনীশক্তিব উপকরণ । দুগ্ধের সহিত মানুষেব এমনি সম্বন্ধ যে দুগ্ধ নামেই ভক্তির উদয়—দুগ্ধ নামেই মহা-প্রাণী শীতল । দুগ্ধই যেন প্রাণ, দুগ্ধই যেন জীবনের জীবন,—ভারতবাসীর স্বর্গীয় স্তম্ভ । কোন কোন দেশে ছাগ, গর্দভ, মহিষ, উষ্ট্র, প্রভৃতিব দুগ্ধও উদরে স্থান পায়, কিন্তু গো দুগ্ধ আমাদের যত প্রয়োজন, যত প্রকার স্থখাতের স্থল ও মূল উপকরণ, অন্য দুগ্ধ সে প্রকার নহে । বিশেষ গর্দভ দুগ্ধ সর্বজন মুখপ্রিয়, কি সর্ববাদী সম্মত নহে । কোন কোন পীড়ার মহৌষধ হইলেও শাস্ত্র বর্জিত । স্তবরাং গো দুগ্ধই সর্বগ্রগণ্য । যে দিন ভারতসন্তান জননীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইদিনে, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানের জীবনীশক্তিব বৃদ্ধি-হেতু গো দুগ্ধেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে । জীবন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা আহােরের উপাদেয় উপকরণ হইয়া, নানা আকারে, নানা প্রকারে অথবা কাহার সঙ্গে মিশিয়া আত্মার বল, হৃদয়ের বল, শরীরের বল, মস্তিষ্কের বল, সবল-

রূপে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। রাজাধিরাজ মহারাজের স্ববনজিত বন্ধনশালা হইতে, দরিদ্রের পূর্ণ কুটিবস্ত্র ক্ষুদ্র পাকপাত্র পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে, গো দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে। ইহার নিকট জাতিভেদ পরাস্ত, ঘৃণা অ-কিঞ্চি লঙ্ঘিত, হিন্দু মোসল-মানের নিকট সমভাবে সমাদৃত। সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে, কিন্তু দুগ্ধের নিকট বিধানকর্তার হস্ত সঙ্কোচিত, মস্তিষ্ক অবনত। যে হিন্দু গোমাংসের কথা শুনিলে কর্ণে হাত দিতেছেন, তিনি গোরসে মত্ত। আবার যে মোসলমান গোমাংস জন্তু জিহ্বার গ্লান ফোঁটায় ফেলিতেছেন, তিনিও গোরসে লালায়িত। দয়াময় ভগবান সাব অংশ, তৈল অংশ, মধুর অংশ এবং জল অংশ—এই কয়েক অংশ দ্বারা দুগ্ধের সমষ্টি করিয়া অপাব লীলা দেখাইয়াছেন। শুধু মাংস আহাব কবিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এমন কোন খাদ্য নাই যে সেই একমাত্র খাদ্য গলাধ কবিয়া শরীর রক্ষা হইতে পারে, প্রাণ বাঁচাইতে পারে। সে গুণ, সে ক্ষমতা কেবল একমাত্র দুগ্ধে। পবিত্রতার গুণই বা কত বলিষ, —কাফেবের হস্ত হইতে মৌলবী গ্রহণ কবিতেছেন, চণ্ডালের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণে লইতেছেন। কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কোনরূপ ঘণার কথা মুখে নাই। গোমাংস যেমন, সম্প্রদায় বিভেদে ঘণাই, তেমনি গোদুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেই আদরের। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অণুপ্রান্ত যাও, খাদ্যখাদ্যের বিভিন্নতা অর্থাৎ গ্রহণ বর্জন এবং কুচি-অকুচি, সকলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু দুগ্ধ সপক্ষে সেই এককথা, সেই একমত, সেই একভাব। কেহই দুগ্ধের বিরোধী নহে, কোন সম্প্রদায়েষই পরিত্যাজ্য নহে। স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, শীত গ্রীষ্মে, সর্বকালে সেই স্বর্গীয় স্রোত কুচিকব ও তপ্তিকর। যে সকল সাহেবগণ গোকুল নিমূল করিতে স্বতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া-ছেন, তাঁহারাও দুগ্ধকে পবিত্র খাদ্য মনে কবিয়া দাদরে গ্রহণ করিতেছেন, অন্ত-রাগ্না শীতল হইতেছে। শান্তেন দায়দিয়া দুগ্ধের বাটীটি পর্য্যন্ত ধুইয়া উদরে ঢালা হইতেছে। শান্তে আছে—সে সময় “হজরত নূবনবী মোহাম্মদ মুস্তফা” সেই অনন্তকৌশলীর অনন্তলীলায় মর্ত হইতে সপ্ততল বিমান অতিবাহিত কবিয়া পবিত্র অনন্তধামে দয়াময়ের দরবানে স্ব-শরীরে বিঘোর নিশীথ সময়ে “বোরাক আবোহনে” (স্বর্গীয় বাহন) অতি মুহূর্ত্তে নীত হইয়াছিলেন—বলিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—সে মহাপবিত্র পূণ্যধামেও দুগ্ধেরই প্রাধাত্যের কথা শুনা যায়। প্রিয় প্রণয়ীর অভ্যর্থনা হেতু পাত্র পূর্ণ দুগ্ধই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! স্বর্গেমর্ন্তে সমান আদর? ধন্য ভগবানের লীলা ও মহিমা!

গো-খাদক কসাইগণ, গোমাংস পূর্ণ বাটী প্রতিদিন অন্নের সহিত দেখিতে নারাজ। আবাব কিন্তু দুগ্ধ পূর্ণ বাটী প্রতি সন্ধ্যা আহারের সময় সম্মুখে পাইলে আব রক্ষা নাই—বাটী বোত জল পর্যন্ত উদবে স্থান পায় ও মহা-পবিতোষ জন্মে। শয্যাধারা জ্বররোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন, বলবীর্ষাশালী বণমন্ত নীরপুরুষেও সেইরূপ আবশ্যক। প্রতিদিন এক বানজন, এক মাংস, এক ডাইল, এক তবকারী একই খাদ্য দ্বারা জীবাত্মা কখনই সন্তোষ জন্মে না,—কিন্তু দুগ্ধ নাচার বিপবীত। অনেক মরোদয়কেই এক সন্ধ্যা দুগ্ধের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, গোবস উদবে না গেলে অপকারের কথাও সময় সময় শুনা যায়। সামান্য কথায় বলে যে, সাত সন্ধ্যা দুগ্ধ না দুগ্ধ সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস এবং উদবতন্ত্রী শুনারও স্তিত্ব পবিত হয়। উদব সেবায়, বন্ধু সেবায়, দেব সেবায় সর্ব সেবাইতেই গব্য বসের আয়োজন ও প্রয়োজন। বোগী বোগশযায় শায়িত, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে, যমদূত দণ্ডায়মান।—চক্ষু জ্যোতিঃহীন।—তারায় নালিমা বেখা,—জিহ্বা জড, হস্তপদ অবশ, নিঃশ্বাসেই আশা,—পরিজন শিয়বে এবং পাশে স্নানমুখে। ঔষধে ক্ষান্ত। যম তাড়না অস্থির। হৃদয় শুষ্ক, কণ্ঠ নারস।—হাযবে! সে সময়েও দুগ্ধ স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। জগত ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণবিন্ধু দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলাইতেছে, প্রাচীনেরা ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আত্মা-স্বজনেরা সে নিদারণ সময়েও বোগীর মুখে দুগ্ধপাত্র ধরিতেছে। গলাধ কবিবার শক্তি নাই, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। বাটী বাটী গোমাংস ঘবে থাক্য সঙ্গেও চেতনা শূন্য শয্যা ধরা, প্রায় মরা বোগীর মুখে কেহই এক টুকরা গোমাংস তুলিয়া দিতেছে না। গোরসই ধারক, বিবেচক এবং শেষ তৃষ্ণা নিবাবক। ভ্রাতাগণ! বলুন তো মূলে কঠাবাঘাত করিলে কি আর ফল লাভের আশা থাকে? গোকুল নির্মূল করিলে কি আর দুগ্ধের দ্বারা জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবাবনের উপায় থাকে?

আখবাবে এসলামীয়া—মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত করটীয়া আহমদীয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রিন্টার মীর আতাহার আলী, সম্পাদক মোলবী নইমদ্দীন। ১২২৫ সনের শ্রাবণ মাসের পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে

গোকুল নির্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ

সাম্প্রদায়িক গোত্রে গোকুল নির্মূল নথ্যে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমরা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে কিছু লিখিব, এবার এসলামীয়াব একটি প্রিয়বন্ধু প্রোণত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়।

গৌবধ সম্বন্ধে ভাবতব নানা স্থানে বাস্তবিকই আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আপনি বলেন 'কোন সম্প্রদায়েব মধ্যেব সহিত সংযোগ স্বতবাং আমি নীবব' কেবল আহমদাব কোন প্রিয়বন্ধুব অন্তর্বোধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। গোবংশ-বক্ষক মহাশয় যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। যদি তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান না হন, তবে আমরা তাহার প্রবন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। যদি বাস্তবিকই তিনি মুসলমান হন তবে তাহার প্রত্যেক কথাব উক্তব না দিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ী অপবাদী। অতএব তাহার প্রত্যেক কথাব ক্রমশঃ প্রতিবাদ করিতে লেখা হইল।

১। গোবংশবক্ষক মহাশয় আদৌ গোকুল নির্মূল আশঙ্কা শীর্ষক স্থলে ব্যবহার করিতে পারেন না। তাহার মনে রাখা কর্তব্য যে ভাবতবাসী'র উপজীবিকা এবং ধনপ্রাপ্তি অধিকাংশ গোজাতিব প্রতি নির্ভর, সেই গোজাতিকে সম্প্রদায় বিশেষে যে একেবারে নির্মূল করিয়া উঠছে তাহা কখনও সম্ভবে না। কোন কোন জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়াই যে গোজাতি সমূলে নির্মূল হইবে তাহার কথা কি? গো নিবন আজকাল নূতন আবস্থা :— নাই, বহুকালবিধি গো নিধন চলিয়া এখনকাল মধ্যে যখন গোধনের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই তখন তাহার আশঙ্কাই বা কেমন? কেঃ গোজাতিকে পরম শত্রুজ্ঞানে বংশ নিপাতার্থে বধ কবে না। যেমন মাঝে মাঝে গোবধ হইয়া থাকে তেমনই অনবরত গো বধনও গোজাতিব উন্নতিব জন্য শত শত হেঁটাও হইয়া থাকে। একদিকে আংশিক ক্ষয় অপবদিকে প্রচুর বৃদ্ধি।

২। গোবংশবক্ষক মহাশয় যে স্বয়ং মুসলমান নহেন তাহা তাহার আপন কথাত্রেই সপ্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলেন, "আমি মুসলমান, গোজাতিব পরম শত্রু, গোমাংস হজম করিতে পারি ইত্যাদি" এই ভান করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিতেছেন। যিনি মুসলমান হইবেন তিনি কখনও আপন শাস্ত্রমুখোদ্ভূত হালান বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গজনক উক্তি দেন ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা

জাতি' শুনিয়া কাকের শ্রেণীতে গণ্য হইবেন না। অতএব তিনি মুসলমান নহেন।

৩। তিনি বলেন, “পালিয়া পুখিয়া বড় বলদের গলায় ছুরি বসাইতে পারি।” তিনি মুসলমান হইলে অবশ্যই অবগত থাকিতেন যে তাঁহারা কোন প্রকারের বলদের গলায় ছুরি বসাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিষ্ঠ কার্যাপযোগী বড় বলদের গলায় ছুরি বসান না।

৪। মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ কবে না, প্রয়োজন মতে তাহারা বন্ধা গাভী অথবা দুগ্ধ দেওয়ার অল্পযুক্ত গাভী জবাহ করিয়া থাকে। গোবংশ বক্ষক মহাশয় যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিত বাস করিতেন তবে গোমাংস ভক্ষণের প্রণালী বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। কোবাণে অনেকস্থলে ‘কোরবানি’ শব্দ উল্লেখ আছে, তৎপরিবর্তে তিনি ‘বলি’ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বোধকরি আশৈশব তাঁহার বলি এবং কাটাছিড়ার অভ্যাস, অতএব তিনি যে মুসলমান নহেন তাহাতে সংশয় কি?

৫। তিনি বলেন, যাহা ন্যায় চক্ষু দেখিতেছি, যে ব্যক্তি মুসলমান শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া আপনিই স্বীকার করিতেছেন ও আবাব তিনি সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বিশেষের অন্য় প্রতিবাদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাহার আপন ধর্ম্মের প্রতি আস্তা নাই তাঁহাব আবাব ন্যায় চক্ষু কোথায় ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ।

৬। লিখক বলেন, “প্রিয় মৌলবী সাহেব মার্জনা করিবেন।” মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে মার্জনা করিতে পারি না। আপনি যে বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাব সহিত ধর্ম্মের অনেক যোগাযোগ বহিয়াছে। অতএব আপনি সম্পূর্ণ মার্জনায় অযোগ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যদি আপনি মুসলমান না হন তাহা হইলে আপনার প্রবন্ধের উক্ত দিতে বাধা নাই, যদি মুসলমান বলিয়া দাবি করেন তবে আপনার প্রকৃত মুসলমানীয় দাবির কি সত্ত্ব আছে অগ্রে প্রকাশ করিয়া বলুন তাহাতে যদি আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া প্রতিষ্ঠা জন্মে তবে এ সম্বন্ধে ফতওয়া (পাতী) প্রদান করিতে বাধা নতুবা আমার নিরব থাকাই ভাল। মুসলীসাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাই একটুক মনযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন।

৭। লিখক বলেন, “প্রিয় মুন্সীসাহেব ক্ষমা করিবেন।” মুন্সীসাহেব! আপনাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। “আমাদের মধ্যে হালাম হারাম ইত্যাদি”—এ কথা আপনি ব্যবহার করিতে পারেন না। বোধহয় আপনি গোমাংস ভক্ষণার্থে মুসলমান ধর্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত গোমাংস ভক্ষণ করিয়া হজ্জম করিতে সাধা হয় নাই, তাই বুদ্ধি গোমাংসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে কখনই মুসলমান জগৎ প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন নাই যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই লোকসমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্দেশিত হইবে।

৮। গো বংশরক্ষক মহাশয়! আপনি মুসলমান বলিয়া দাবি করুন তাহাতে আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। “রাফিজী” সম্প্রদায়ও মুসলমান বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, কিন্তু সাফি, হানিফি শব্দ উল্লেখ হালাল হারামের বিচারের প্রয়াস পাওয়া আপনাব ত্রায় লোকের পক্ষে শোভা পায় না।

৯। “সাফি মতে জনজন্তু মাত্রেই হালাল”—এই শাস্ত্র আপনি কোথায় পাইলেন আমাকে দেখাইয়া দেউন। অনেক শ্রেণীস্থ জনজন্তু সাফি মতেও হারাম। বোধকরি আপনিই প্রথম মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া যখন যে জন্তু সম্মুখে পাইতেন তাই ভক্ষণ করিয়া তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিয়া থাকিবেন। শেষ বজকের পায় পড়িয়াছেন।

১০। “সাফি মতে বজকের পদ যতটুকু জলে থাকে কাটিয়া লইয়া ইত্যাদি,”—এমন কথা কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় কোন ধর্মগ্রন্থে নাই। আপনি কোথা হইতে আনিয়া যোগ করিতেছেন বুদ্ধিতে পাবি না। কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় ধর্মগ্রন্থে যে বিষয় নাই সেই সব বিষয় আছে বলিয়া যাহারা প্রচার করেন তাহারা কোরাণের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাফের এবং মহাম্মদীয় ধর্ম হইতে বর্জিত বলিয়া নির্দেশিত। বোধকরি আপনিই কখন সাফি মতের দায় দিয়া বজকের পায়ের সিদ্ধ পোড়া গুরওয়া, বলসা প্রভৃতি পাক আহার করিয়া স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

১১। “শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ না করিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অথাচ্চ তাহার নাম উল্লেখ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য, থাইও না, লিখা আছে!” —শাস্ত্রে লিখা আছে কি না তাহা

আপনার গায় লোকে কিসে জানিবে ? আমাদের জন্ত গোমাংস হালালই আছে, আমরা তাহাই আহাৰ কৰিয়া বসনা পৰিতৃপ্ত কৰিতে পাৰি। আপনাব ভাগ্যে ঘটে না বিধায় বুঝি আপনে যে স্থানে যে হাড় পান তাহাই চিৰাইয়া দন্ত পৰিতৃপ্ত করেন। বিশেষ কোন কাৰণত্মসাবে কোৱাণে তীব্রভাবে গোবধের আদেশ আছে। আপনাব তদ সঙ্কল্পে জ্ঞাতবা থাকিলে বাৱন্তে জানাইব। গোজাতি পৰম উপকাৰী জন্তু বলিয়া ভক্ষণ নিষেধ হইলে কোৱাণে ও হাদিসে তাহাব স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা থাকিত। বিশেষ সম্মানি জন্তু মধ্যো গণ্য হইলে কোৱাণে উটের গায় উহাবও প্রশংসা থাকিত।

১২। “খাইবার অনেক আছে খাইতে পাৰি খাইনা।” -- খান না কেন ? আপনাকে কে নিষেধ কৰিতেছে ? আপনাব মন তো স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই কৰিতে পাবেন : আপনাকে আমবা হাত ধৰিয়া নিষেধ কৰিতেছি না। আপনাব গায় দুই একজন আজকাল হিন্দুসমাজ হইতেও বাহিৰ হইতেছেন, তাহাদেব যাহা অভিপ্ৰায় তাহাই করেন। তদাজেব তাহাবা বড় একটা ধাব ধাবেন না।

১৩। আপনাব বিজ্ঞা এৰা শাস্ত্ৰজ্ঞানেব বুঝি এই পর্যন্ত দৌড় “ফডিং ধৰিয়া ঘতে ভাজিয়া টপাটিপ গিলিলে পাৰি।” এই বুঝি শাস্ত্ৰেৰ কথা ? শাস্ত্ৰে টিডিং খাওয়াও বিধান আছে. আপনে টিডিং ভ্ৰমে ফডিং ব্যবহাৰ কৰিয়া শাস্ত্ৰেৰ প্ৰতি দোষাবোপ কৰিতেছেন। শাস্ত্ৰই দোষী না আপনিই দোষী ? যখন আপনাব ঘোড়া এবং ভেড়া, ফডিং এবং টিডিং, পৰ্বত এবং সমভূমিতে যে কি বিভিন্ন তাহাৰ জ্ঞান নাই তখন আপনে কোন মুখে মহাম্মদী শাস্ত্ৰ সমালোচনা কৰিতে অগ্রসৰ হইতেছেন ?

১৪। “গোমাংস উদগ্ৰাস্ত কৰিলে পাৰি, ভয়ে তাহাব নিকটেও যাইনা।” পয়গম্বৰ সাহেব স্বয়ং কখন গোমাংস খান নাই এবং তাহাব বংশাবলৌব মধ্যোও কেহ কখন ব্যবহাৰ করেন নাই, তাহাব সময়ে আববেৰ কোন সম্প্ৰদায় গোমাংস আহাৰ কৰিত, পয়গম্বৰ সাহেব তাহাদিগকে প্ৰচলিত পথ অনুসাৰে গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং কোথাও স্পষ্ট আদেশ প্ৰচাৰ করেন নাই।

১৫। গোকুল ছাড়িয়া যে আবার ছাগল লইয়া বসিলেন ? আপনে কোথায় দেখিয়াছেন যে মুসলমানগণ দুগ্ধবতী ছাগল জবাহ কৰিয়া মাংস ভক্ষণ কৰিয়া থাকে ? কোৱাণে নিষেধ আছে যাহাৱা জাহেল (মূৰ্খ) এবং ধৰ্ম্ম-বিষয়

অনভিজ্ঞ তাহাদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করা কৰ্ত্তব্য নহে ।

১৬। “ছাগলের মধ্যে পাঁঠা তো খাদ্য—তাহার দিকে বড় ঘেঁষি না।”
পাঁঠার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই, কেন যে তাহার দিকে ঘেঁষি না তাহা কেনা জানে? পাঁঠার মাংস ব্যবহারই অতি দুর্গন্ধযুক্ত অথচ এক পাঁঠার মূল্যে তিন ছাগল পাওয়া যায় বলিয়া আসবো তাহার দিকে ততদূর ঘেঁষি না। কিন্তু অপব নিয়মে শাস্ত্রানুসারে তাহার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই। পাঁঠার দিকে আমরা ঘেঁষি না বলিয়া কি পাঁঠাকুল বক্ষা পাইবাছে? কোন সম্প্রদায় যে পাঁঠাকুলেব অববর্ত সংহার কবিয়া আসিতেছেন তাহা কি আপনার চক্ষে উঠে না?

১৭। “উষ্ট্র এদেশে নাই, থাকিলে তাহার কাছেও যাঠিন না। শবীবের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়।” উষ্ট্র অতি পবিত্র জন্তু, তাহার মাংস অতি পবিত্র ও হালাল, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়, পবিত্র বস্তু প্রতি এই ঘণাক্রম মহাপাপ মুক্তি লাভার্থে অগত্যা একবার তাহার মাংস ভক্ষণ করা আপনার প্রতি ওয়াজেব (কর্ত্তব্য)। যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য সে দেশে তাহার ব্যবহার অধিক। উষ্ট্র আমাদের দেশে নাই স্বতবাং তাহার ব্যবহারও বিবল। ভাই বলিয়া মাথা ঠকিয়া যাবেন কেন? গোজাতি এদেশে অপরিপাক্য পরিমাণ পাওয়া যায়, কাজেই তাহার ব্যবহার অধিক।

১৮। “মহিষ খাদ্য, তাহার নিকট ছবি হানে কবিয়া যায় কে?” ছবি হাতে কবিয়া কেহ যায় না বটে কিন্তু কোমর বান্ধিয়া জগন্মন্দির পবাকার্থী দেখাইয়া অলৌক আমাদের জন্য শত শত দণ্ডকমণ্ডলীর মাফাতে অসিহাস্ত ধারণ পূর্বক যে শত শত লোক তাহার দিকে ধাবিত হয় আর সাদা ঘটা রাজিতে থাকে ও উলুধ্বনি পড়িতে থাকে তাহা বোধকরি লিখক মহাশয়ের চক্ষে বেশ সহ হয়।

১৯। “মহিষ, ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ, খরগোশ—সকলি তো চলিতে পারে, এ সকল খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, এত থাকিতে গোমাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন?” ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর মাংস যে ব্যবহার না হয় এমন নহে। যাহাদের সংখ্যা অল্প ব্যবহারও অল্প। গোমাংস দেখিয়া জিহ্বার জল পড়ে বলিয়া ব্যবহার হইতেছে—এটি আপনারই মনগড়া কথা। গোজাতির সংখ্যা অত্যধিক, মাঝে মাঝে তাহার বধ হইলে গোবংশ নির্মূল

হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; তদজ্ঞাই বধ হইয়া থাকে । ছাগ প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প, তাহাদের অনবরত ধ্বংশে বংশ নিপাত হওয়ার আশঙ্কা । সৃষ্টি নিপাত করা কাহার তো উদ্দেশ্য নহে ।

২০। “এপর্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ, স্মরণ্য কৰ্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত । ঘটনাস্থল “মক্কা” হজরত মহাম্মদের জন্মের পূর্বে,”— লিখক মহাশয় ! কোরবানির উৎপত্তির মূল কারণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই, কেবল ঘটনাটি মাত্র প্রকাশ করিয়া নানা বাস্তবজনক উক্তি করিয়াছেন । মুসলমান ধর্ম সৃষ্টি অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহার বিরোধীগণও ইহাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন নাই । তবে লিখক মহাশয় স্বয়ং মুসলমানী দায় দিয়া কেন যে এসলামকে বিদ্বেষ এবং উপহাস করিয়া ধর্মচ্যুত হইতেছেন, তাহার বিচার মুসলমান সমাজ করুন ।

“এ পর্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত,” লিখক মহাশয়ের মনে বিশ্বাস যে ইহাব মূলে কিছুই নাই, কেবল প্রচলিত প্রথা অনুসারে চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে, মূল অতি দৃঢ় । “ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ,” তাঁহার লিখার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি এ-কথাটি সহজে স্বীকার পাইতেছেন না, কেহ যেন তাঁহাকে বলপূর্বক স্বীকার করাইতেছে । কোরাণ ও হাদিসে যে কোরবানির কথা উল্লেখ আছে তাহা কি কখন তিনি কণ্ঠেও গুনেন নাই ?

২১। “ধর্মের গতি বড় চমৎকার, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদ-নদী ছাড়াইয়া মুসলমান ধর্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোবানিও আসিয়াছে”, ধর্ম বাস্তবিকই ধর্ম, তাহাব গতি অতি চমৎকার না হওয়ার কথা কি ? যে ধর্মের নেতা একজন মাত্র সহায় লইয়া আপনার সদৃশ বহু সংখ্যক প্রতিবাদীর মুখের উপর ধর্ম প্রচার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন নাই, সে ধর্মের গতি চমৎকার বৈকি ? যখন তাহাব গতি চমৎকার তখন তাহাকে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া ভারতে আসিতে বাধা দিতে পারে এমন সাহসী কে ? ধর্ম যখন আসিতে সাহসী হইল তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ্য তাহার সঙ্গে আসিবে, তাহাতে কোবানি দূষি কিসে ?

গৌরবাক্ষ মহাশয় ! নয়ন মুদ্রিয়া মননিবেশ পূর্বক একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলেই অসম্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহার আপন মতানুসারে দিনদিন দশ সহস্র গোবধ হওয়া সত্ত্বেও গোবংশের কিছুমাত্র ধ্বংস বা বিলুপ্তি হয় নাই !

ভারতে গোজাতি ভিন্ন আরও অনেক রকমের গ্রাম্য জন্তু আছে (যাহা কোন সম্প্রদায়ের আহায্য নহে)। তাহার সহিত গোপালের তুলনা করিলে কোন জাতির সংখ্যা অনেক হইবে? অনিবার্য গোবধ হওয়া সত্ত্বেও ঘাটে, হাটে, মাঠে শত শত গোপালই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, অন্য প্রকারেব দশ বারটি পশু বোধকরি লিখক মহাশয় একত্রে একস্থানে পান কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যাবহারের বস্তু কখনই নষ্ট হয় না, বরং উহা উন্নতি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো দুইই আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে, গোজাতির পরিশ্রমের উপর এ দেশের কৃষিকার্য নির্ভর, সেই গোজাতির উন্নতির এবং বৃদ্ধির জন্তু ভারতবাসী মাত্রই সচেষ্টিত। মুসলমানগণ শুধু মাংসার্থে গোজাতিকে সমাদর করিয়া থাকে না, তাহা বা বহুবিধ প্রয়োজনানুরোধে গোজাতির সমাদর করিয়া থাকে। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করে যে, মুসলমানগণ শুধুই গোজাতির শত্রু। কোরাণে যে ভাবে ও যে চক্ষে গোজাতিকে লক্ষ করার বিধান আছে সে চক্ষে দেখিলে কবে গোজাতি নির্মূল হইত। ভারতবাসীর অপর সম্প্রদায়গণ ঘরে ঘরে প্রতিপালন করিয়াও সে ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। “সুফি সাহেব কিছু মনে করিবেন না।”

সুফি সাহেব! আমি কিছু মনে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মোল্লা মাতুষ, স্বভাবত বিবাদ প্রিয় নহি, কাজে কাজেই ক্ষান্ত না থাকিয়া উপায় কি! একটি কথা হঠাৎ মনে পড়িল, তাহাই জনসমাজে প্রকাশ পূর্বক প্রস্তাব উপসংহার ও মনের খেদ নিবারণ করি। প্রথম এদেশে যখন খৃষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদিগের হস্তগত হয় তখন তাঁহাদের আপন ধর্ম বিস্তার জন্তু পালে পালে মিশনারীগণ দেশ-দেশান্তর বহির্গত হইয়া স্মৃষ্টি বাক্য ও গন্তীর স্বরে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক নিচাশয় পামরচেতা হিন্দু আপন ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক খৃষ্টিয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হেটকোট পরিধান করত সাহেব সাজিলেন। ইহাতেই কি সাহেব হওয়া যায়?—না তাহারা এখন এদিকে মিশিতে পারেন না ওদিক বাইতে পারেন! অন্তবস্ত্রের উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহার্থে পুনরায় মিশনারীদিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা রুল্লিলেন যে, তোমরা আপন আপন ধর্মে নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্বক প্রচার করিতে থাক, সরকার হইতে তোমাদের জন্ত বন্দোবস্ত করা বাইবেক। তদানুসারে তাহারা আদাজল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের ধর্ম বিনাশের আশঙ্কা চোটা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই, সেইরূপ আজকাল কোন কোন

মুসলমান সম্প্রদায় সমাজে হইতে দূরীভূত হইয়া মুসলমান ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানিলে যে তাহার নিগূঢ়ত্ব উদ্ঘাটন করিতে সমিয়াছেন তাহাতে সত্যধর্মের কিছু মাত্র অপচয় হইবেক না। সত্যের জয় মিথ্যার পতন।

মহাশয়! সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরবেন; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা। উপসংহার কালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।

ভারতে গোবধ

আজকাল ভারতে গোবধ সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি নংস্থাপিত হইয়া এই তরঙ্গের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায় গোহত্যা-জনিত দুঃখে বিষম দুঃখিত ও মর্ম্ম-পীড়িত। গোখাদক জাতির অত্যাচারে গোকুল নিম্নূল হইল, ইহাই তাহাদের আর্তনাদের মূলসূত্র। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতাই গোবংশ ধ্বংসের একমাত্র প্রধান কারণ, এইটি তাহাদের যুক্তি। উক্ত ধর্ম্মধ্বজীগণের যুক্তি কিরূপ ত্রায়সঙ্গত নিয়ে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

গোখাদকদিগের অত্যাচারে গোকুল নিম্নূল হইতেছে - কোন যুক্তি বলে গোকুল রক্ষণগণ একপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহা আমবা স্থির করিতে পারিতেছি না। জগতের অধিকাংশ জাতিই গোখাদক; সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত অধিবাসীগণই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! ঐ সকল দেশের গো বংশ তো ধ্বংস হয় নাই। আর ভারতবর্ষে প্রায় আটশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টিয়ানগণও শতাব্দিক বৎসর পর্য্যন্ত গোমাংসে উদর পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও এই দীর্ঘকালের মধ্যে গোকুল ঐংসে যায় নাই। আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে গোকুল যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানগণের গোমাংস ভক্ষণের মাত্রা পূর্বাশ্রয় বৃদ্ধি হইলে আমরা এই যুক্তি

কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। বরং মুসলমানদিগের মধ্যে ‘নিবামিষ ভোজী’ নামে এক শ্রেণীর নব্যজীব আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্বারা গোবধের মাত্রা অবশ্যই কিছু না কিছু কম হওয়া সম্ভব। যদি গোবধের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার কারণ অল্পপ্রকার, ধর্মধ্বজী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস খসকারী। যদি কেহ একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চান, তবে সন্ধ্যার সময় কলিকাতাস্থ ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে রুটি ও কাবাবের দোকানে এবং মোগলদিগের “প্রাইভেট কুশে” দুই এক ঘণ্টা কাল দাঁড়াইলে দেখিবেন। দুঃখের বিষয় ঐহাদের পেটে এখনও গরুর “হাসা” রব শ্রুত হওয়া যায়, তাহারাও ধর্মধ্বজী নাম ধারণপূর্বক গোবধের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমবা অবাক হইয়াছি। মারোষাবী প্রভৃতি জৈন ধর্মাবলম্বীগণের মুখে এসব কথা শোভা পায়। মাংস প্রিয় বাঙালী ভায়াদেব মুখে একরূপ অযথা চাঁৎকাব শোভা পায় কি? হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন, তাহাদের একরূপ দৃষ্টতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পাবি না। বাপুহে! আমাদের খাতি জিনিস আমবা খাই। তাহাতে তোমাদের বুখা চাঁৎকাব এবং গলার্বাজী কেন? আমরা তো তোমাদের গরুগুলি জোর করিয়া আনিয়া বধ করিতেছি না? নিজেরা পালিয়া, পুষ্টিয়া আবশ্যক মত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, তাহাব বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া তোমাদের কি হইবে? যদিও আমবা জানি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট হিন্দুদিগের এই অযথা অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবেন, তবুও তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মর্মান্বিত হইয়াছি। গোড়া হিন্দুদিগকে বলি, তোমরা গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া আমাদের তাহাতে কতি বুদ্ধি কি? সর্বল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায, আইনকার্টুন ও জোর জবাবদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজ্ঞাতায় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়! উক্তরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদেব কারণই—আর কিছুই নহে। ঐহারা গোকুল ধ্বংস হইল বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করিতেছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা গোকুল বুদ্ধির অর্থ কি উপকার করিতেছেন? পূর্বকালে আপনারদের মধ্যে রাজাধিরাজ হইতে সামান্য (খিলাসী) পর্যন্ত সকলেই গোপালন করিতেন, এমন ভদ্র নামধারী কয় ব্যক্তি

গোপালন করিতে তৎপর ? আজকাল শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, গোজাতির অবনতিব তাহাই একমাত্র কাবণ। আজকাল অনেক চাষার ছেলে খোদাতত্ত্বগ্রহে “বিদ্বান” তৎসঙ্গে সম্মান্য শ্রেণীতে উন্নীত। তাহারা গোপালন করিতে বা কৃষিকার্য্য করিতে কখনও কি সম্মত হইতে পাবেন ! বিদ্বানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, দেশের অবস্থা উন্নত না হইয়া ততই অবনত হইয়া দাঁড়াইতেছে। গোপালনে বীতাত্মরাগ ও কৃষিকার্য্যে অনাস্ত্য দেশের সর্বনাশের প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্র হইবার যত কারণ নির্দেশ করা যায়, ইহা অপেক্ষা তাহার কোনটিই সমীচিত নহে। যাহাদের চৌদ্দপুরুষ কৃষিজীবী, তাহারাও অনেকে এখন গোপালন এবং কৃষিকার্যের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এদেশে শিক্ষাকার্য্যের যতই উন্নতি হইতেছে গোবংশের এবং তৎসঙ্গে কৃষি কার্য্যে ততই অবগতি হইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি স্বেচ্ছা জনপদে শিক্ষার ফল ঠিক ইহার বিপরীত। চাকুরীই যে-দেশের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সে দেশের অবনতি যে অবশ্যস্তাব্য একথা কে না স্বীকার করিবে ? কোন সোখানবাবু একটি গাভী প্রতিপালন করিয়াই মনে করেন যে আমি গোকুল রক্ষা করিলাম। দুইটি ইংরেজী বর্ণমালা বা দুইগণ বাঙ্গলা ভাষা যাহাব কণ্ঠস্থ তিনিই গোপালন বা কৃষিকার্য্যকে অতীব ঘৃণিত কার্য্য মনে করেন। একপক্ষের গোবংশের উন্নতির আশা বিরূপে করা যাইতে পাবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নগরের দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা বসিয়া যাহারা গোকুল রক্ষার জন্ত জাগ্রত স্বপ্ন দেখেন, সভা-সমিতিতে বৃথা গলাবাজী করেন, তাহাদের জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে ধন্য। গরু দ্বারা মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, একটি কৃষিকার্য্য দ্বিতীয়টি গো-মাংস ভক্ষণ, যেখানে গুরুতর দুইটি স্বার্থ বহিয়াছে, সেখানে জাতির উন্নতির জ্ঞাত তাহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে বেশি। ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের গোধন যে অধিক তাহাই এ বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

যাহারা বলেন, গোখাদকদিগের অত্যাচারেই গোকুল নিশ্চল হইতেছে তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুকুর, কিড়াল, শূকর, শূগল, ইত্যাদি বেসকল জন্তুর একবার একাধিক সম্মান প্রদান করে, আবার বৎসরে একবার যাহাদের সম্মানোৎপাদন হয়, অথচ যাহারা ভারতবাসীগণের অখাদ্য, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না কেন ? গরু তো একেবারে একটি মাত্র সম্মান প্রদান করে, পক্ষান্তরে উহার মাংস

বহুল পরিমাণে ভক্ষিত হয়, অথচ উহাদেরই বা বংশের এত উন্নতি কেন? ইহার অভ্যন্তরে কি কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য নহে? ষাঁহারা যুক্তিমার্গে বিচরণ করেন তাঁহাদের একবার এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞ সংবাদপত্র সম্পাদক একপ প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতের হিন্দু রাজ্য ও জমিদারগণ তাঁহাদের অধিকারে গোবধ নিবারণ করিয়া দিলে গোবংশ অনেক অংশে রক্ষা পায়। আমরা বলি, আমাদের গ্রাম পরামর্শ সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কি হিন্দুরাজ্য ও জমিদারদিগকে একপ অবস্থা ক্ষমতা প্রদান করিবেন? যদি একপই হয়, তাহা হইলে মুসলমান নবাব ও জমিদারগণ হিন্দুদিগের মধ্যে গায়েব জোরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন। গোকুল রক্ষা অপেক্ষা হিন্দু বিধবাদিগকে পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করা এবং ক্রম হত্যা নিবারণ করা কোনরূপেই অল্প পুণ্যের কার্য্য নহে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের বর্তমান গতিমতি দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, ইহারা কিঞ্চিৎমাত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই মুসলমানদিগকে গোমাংস হইতে বঞ্চিত করিবেন। তারপর মুসলমানদিগের অগ্ৰাণ্য ধর্ম্ম কার্য্যগুলিও বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কাশ্মির এবং অগ্ৰাণ্য হিন্দুরাজ্যে বর্তমান। হিন্দুদিগের এই সমস্ত অবস্থা আন্দোলন ও আবদার দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, মুসলমানদিগকে নির্যাতন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপসংহারকালে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দেলছয়ার হইতে একখানি মোসলমান সংবাদপত্র (আমরা কিন্তু মুসলমান সংবাদপত্র বলিতে প্রস্তুত নহি) বাহির হয়। কাগজখানির নাম “আহমদী”, সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু কাগজখানির ভাব, ভঙ্গি ও সম্পাদকের লিখন ভঙ্গি দ্বারা আমরা কোনরূপেই সম্পাদককে মুসলমান বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বর্ষের আহমদীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় “গোকুল নিম্নূল আশঙ্কা” নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। “আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি একপ যাহার মনের ভাব, তিনি মুসলমান নহেন। মুসলমান বলিয়া তিনি কোনরূপেই দাঁড়াইতে পারেন না। একপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খোদাতালাার সত্যদর্শ প্রচারকের আদেশ অমান্য করত নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন। যদি তিনি ইহার প্রমাণ

আমাদিগকে দর্শাইতে বলেন, তবে খোদাতালার ফজলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা প্রদর্শন করিব। আর যদি তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া 'তওরা' করিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি এই গুরুতর অপরাধী যেন পবন দ্বারা খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন। আর মুসলমান ভ্রাতাদিগকে আমরা বলি যে আপনারা এই প্রবন্ধকে মুসলমানের লিখা বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না এবং তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। লেখকের হৃদয় সৎপথে চালিত হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন। আমিন! আমিন!

প্রস্তাব লিখক আহমদীর বন্ধু আপনি যে উচ্চরের লিখক, বাঙ্গালা ভাষায় যে আপনার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করি, তাই বলিয়া আপনার কলমে যাহাই আসিবে তাহাই লিখিবেন? অন্তায় কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এসলামী ধর্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের গোটাকত কথা লিখিতে হইল। ক্রটি মার্জনা করিবেন। মহোদয়! আপনি পাঁচ ছয় মাসের যোগাড়ে আবার গোকুল নির্মূল আশঙ্কা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বিগত ১৫ই পৌষ আহমদী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনি যে সত্যবাদীও ধার্মিক তাহা বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তাব লিখক!

আপনি লিখিয়াছেন, “আমাব লিখিত প্রস্তাব আহমদীতে প্রকাশ হইলে “কোন কোন” সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া গোকুল রক্ষার সহায়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সহযোগী উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আক্ষেপ সহকারে প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন।” মহাশয়! যাহা আপনি লিখিয়াছেন যদি উহা সত্য হয়, তবে আপনি ও তিনি এক ধর্মাবলম্বী সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, “কোন মহোদয় আহমদী সম্পাদককে অথবা গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কেহ আহমদী পত্রিকাতেই যাহা ইচ্ছা বলিয়া মনের আবেগ সাস্থনা করিয়াছেন।” মহাশয়! এসলামী ধর্ম বিগর্হিত অন্তায় কথা বলিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে? যাহাদের ইমান আছে, যাহাদের মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাস আছে ভক্তি আছে, তাহারা আহমদী সম্পাদককে ও আপনাকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে ইহা তাহাদের

স্বভাবসিদ্ধ যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, “কেহ লেখকদের প্রতি সন্দেহ করিয়া হিন্দু সাব্যস্তে কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন।” মহাশয় ! আপনি সত্য বলিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধ লিখককে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বই কোন মুসলমান এসলামী ধর্মাবলম্বী বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এতাদৃশ এসলামী ধর্ম বিগর্হিত প্রবন্ধ মুসলমানের কলমে কথানি আসিবে নী এবং কোন মুসলমান লিখিতেও সাহসী হইবে না। এবারের প্রবন্ধেও আপনে ক্রটি করেন নাই। এমন কি প্রকারান্তরে হিন্দুধর্মের পিছেও লাড়িয়াছেন। গুরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম সঙ্গত তাহা অনেকেই পবিত্র কোরাণ শরীফের আওত (প্রবচন) দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয়, তাহা মুসলমান মাত্রেই শিরোধার্য্য, ভরসা করি আপনি ও আপনার বন্ধু ব্যতীত জগতের কোন জাতি কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিতে সাহসী হইবেন না। যাহারা মুসলমান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিবেন তাঁহারা শবাব বাবস্তানুসারে সে কাফের ইহাতে অহু-মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধে এসলামী ধর্মশাস্ত্রে যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় আপনি একটি ছোটখাট দর্প করিয়াছিলেন, তজ্জন্তই কোন কোন মুসলমান আপন আপন দাওয়া কোরাণদ্বী দ্বারায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে তোরা করার কথা বলিয়াছেন যদি সেই প্রমাণ আপনার নিকট এসলামী ধর্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা হয় তবে আপনি এসলামী শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাঁহারা উহা অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবে, সত্যপ্রকাশ হয় এই তাঁহাদের ইচ্ছা। অনিতে পাইলাম আপনি নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ পড়িয়া রাগান্বিত হইয়া উহার উত্তর লিখার কারণ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন এবং অনেক মোলবী সাহেবের নিকট নাকি গুরু জবহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিরাশ হইয়া রিক্ত সম্মুখে পুনঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর আবার আপনার লিখা ধর্ম বিগর্হিত দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ বিগত ১৫ই পৌষের আহমদীতে দেখিতে পাইলাম। উহা দুই

আমার শিশুকালের একটি গল্প স্মরণ হইল দেখুন তো ঠায় সঙ্গত কিনা? উহা এই—কোন পথের ধারে হুটপুট এক ব্যক্তি বাছে বসিয়া থিরা খাইতে-ছিল। ঐ পথ দিয়া একটি চিকিৎসক যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, তাই! বাছকালে কিছু খাইতে নাই। সে ব্যক্তি উহা শুনিয়া রাগাঙ্ক হইয়া বলিল, তুই এতবড় শক্ত কথা বলিলি। দেখ! আমি গু দিয়া থিরা খাইব, পরে তাহাই করিল। চিকিৎসক তাহাকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসায় পু বৃত্ত হইবেন!

প্রস্তাব লিখক আখবারে এসলামীয়া আহমদী সম্পাদক লিখিয়াছিলেন আপনার বন্ধু যিনি গোকুল নিরুপল আশঙ্কা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি তাঁহার কিছুই উত্তর দেন নাই, তদুত্তরে আপনি বলিতেছেন “সকলেবই জানা আবশ্যক যে প্রস্তাব লিখক ও সম্পাদক বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন আকৃতি।” মহাশয় চটিয়া উঠিবেন না, ভাল বলুন তো দেখি! যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতঃ! আপনার ভ্রাতার নাম কি? যদি আপনি তাহার উত্তর না দেন আব আপনার ভ্রাতা বলেন আর আমার ভ্রাতা বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ভিন্ন আকৃতি। তবে এই উত্তর ঋণসঙ্গত কিনা? এবং বক্তার গালে আপনি দুটা চড় মারিবেন কিনা? আহমদী সম্পাদক যে আপনার নাম লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে বাসনা করেন, উহাতে তাঁহার স্ববুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। লোকে বলে হাত ছোট আম বড়—প্রমাদের কথা, সেদিন কথায় কথায় গোকুল নিরুপল সঙ্ক্ষে উঠিল, তাহাতে আমাদের জনৈক বন্ধু বলিলেন আপনারা কি আহমদী সম্পাদকের বন্ধুকে চিনেন, যিনি গোকুল নিরুপল সঙ্ক্ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? আমরা বলিলাম—না। তিনি কহিলেন, সেই প্রবন্ধ লেখক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অঞ্চলে আনিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভালরূপ চিনি। —তিনি একটা হুটপুট এক ব্যক্তি, যদি আহমদী সম্পাদক বেড়ে আড়াই ফুট হন তবে তিনি অনুন পাঁচ ফুট হইবেন। যদি সম্পাদক দীর্ঘে তিন ফুট হন তবে তিনি অনুন চারি ফুট হইবেন। কিন্তু নাম বলিলেন না। মহাশয়! ধর্ম বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া কেনই বা মেয়েলোকের মত লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? এমন প্রবন্ধ লিখকের জীবনে খিক না দিয়া কে থাকিতে পারিবে?

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন “আহমদী সম্পাদক ও পাক্ষা মুসলমান।” তিনি যে পাক্ষা মুসলমান তাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পাক্ষা মুসলমানের ঔরবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুনিয়াছি তিনি নাকি আহমদী প্রকাশের পূর্ব কতকদিন ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যাইতেন। মৎস্ত, মাংস ছাড়িয়াছিলেন, নামাজ পড়িতেন না। পরে মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত হওয়াতেই হটক কি মনের ইচ্ছাতেই হটক কি মুসলমান সমাজে চলাচল করার জগুই হটক কি মৎস্ত মাংস পুনঃ রুচিবশতই হটক ঐ ধর্ম ছাড়িয়াছিলেন। বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, যাহাব উক্তব আখবাবে এসলামীয়াতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আপনাব ও পার্টকগণেব নিকট অপ্রকাশ নাই। এমন ব্যক্তি যদি পাক্ষা মুসলমান হয়, তবে বলুন জগতে কাফেব কে? এইক্ষণ স্তম্ভে পাই আহমদী সম্পাদক নাকি নমাজ ছাড়িয়াছেন। কয়েক দিবস হইল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একটি হিন্দু বক্তা করটিয়া জমিদার বাটিতে আসিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে জমিদার বাটিতে একটী সভা আহত হয়। সে সভায় আহমদী সম্পাদকের আগমন হয়। মুসলমানগণ সভা হইতে উঠিয়া আছরের নমাজ পড়িতে গেলেন, আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ত্রায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, “মন স্বাধীন, লিখনিও স্বাধীন, কিন্তু বাধা অনেক, আশঙ্কা অনেক।” মহাত্মন ! যদি কেহ কোন কার্য্য করিতে উত্তত হয়, তবে ঐ কার্য্য ত্রায়সঙ্গত হইলে যদি কোন প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারে তবে সেই প্রতিবন্ধককে বাধা বলে। কোন ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারিলে তাহাকে আশঙ্কা বলে। ভরসা করি ইহা আপনারও স্বীকার্য্য। যদি কেহ বাধা ভয় না মানে, মন স্বাধীন বিবেচনায় মনে যাহা লয় তাহাই করে, তাহাই বলে, তাহাই লিখে, তাহা হইলে পাগলবই তাহাকে কি বলা যাইতে পারে। অতএব মনে যে কথাই উদয় হয় ঐ কথা সাংসারিক উপকারী কি অহুপকারী, হিত কি অহিত ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ প্রথম বুদ্ধির বিচারালয় উপস্থিত করিবে। যদি বুদ্ধির বিচারে সে কথা অসঙ্গত হয়, তবে তাহা কখনই করিতে নাই। যদি সঙ্গত হয়, তবে ঐ কথা দ্বিতীয়বার ধর্মের বিচারালয়ে

উপস্থিত করিবে। ধর্মের বিচারে যদি উহা অসঙ্গত হয়, তবে উহা পরিত্যজ্য, সঙ্গত হইলে অমনি সে কথা জীবনে পরিণত করিবে। যিনি প্রথম বিচারের অন্তথা করিবেন, তাঁহাকে পাগলবই কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? যিনি দ্বিতীয় বিচারের অন্তথা করিবেন তিনি কথা বিশেষ কাজ বিশেষে পাপী, বিধর্মী, কাফের বলিয়া অভিহিত হইবেন। এইক্ষণ আপনার মন কিরূপ স্বাধীন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোমাংস

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, “খাত্ত, অখাত্ত, স্তখাত্ত।” আপনি এইরূপে ক্রমশঃ যে খাত্তদ্রব্যের বিভাগ করিয়াছেন, গভাবভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে আপনার মোটা ভুল হইয়াছে কি না? আমবা বলি সাধারণ খাত্ত, সাধারণ অখাত্ত। যাহা খাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণ খাত্ত। যাহা খাওয়া যাইতে না পারে তাহা সাধারণ অখাত্ত। সাধারণ খাদ্য দুইভাবে বিভক্ত, খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা খাওয়া সিদ্ধ তাহাই খাদ্য। যাহা খাওয়া অসিদ্ধ তাহা অখাদ্য। আবার ঐ খাদ্যদ্রব্য দুইভাগে বিভক্ত। স্তখাদ্য ও কুখাদ্য। স্তখাদ্যস্থায় যাহা খাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার না জন্মে, তাহাই স্তখাদ্য। যাহা খাইলে শরীরে অপকার না জন্মে, তাহাই কুখাদ্য। মহোদয়! জগতেব সকল সন্ত্যজাতিই এক একটি ধর্ম বজ্জতে আবদ্ধ আছেন। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মানুসারে খাদ্যখাদ্যের বস্তু ঠিক করিয়া লন। তাহাতে কাহারও কথা চলে না। কাহারও তর্ক চলে না। অতএব যখন আমাদের পবিত্র কোরাণ শরীফে গোমাংস সেবনের ও গরু কোরবানি করণের বিধি স্পষ্ট লিখিত আছে, তখন গোমাংস যে আমাদের খাদ্য ইহা অস্বাস্থ্যমানে বিশ্বাস করিয়া গোমাংস সেবন করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা কখন বা স্তখাদ্য কখন বা কুখাদ্য পরিণত হয়। আহমদী সম্পাদক যেরূপ শীর্ণদেহ কীণকায় তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোমাংস সেবন কবা অবশ্য কুখাদ্যের মধ্যে পরিণত হইবে। তাই বলিয়া কি পবিত্র কোরাণ শরীফের বিধি উড়িয়া যাইবে?

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “এইক্ষণে কথা এই বে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।” মহাশয় দেখা যাউক আপনার এই যুক্তি কতদূর জায়সঙ্গত। দেশ বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য

হয়, তবে ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমানগণ যখন শীতপ্রধান দেশ ইউরোপে গমন করিবেন তখন তাঁহাদের শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। আবার যখন শীতপ্রধান দেশবাসী ইউরোপীয় মহাপুরুষগণ ভারতে আগমন করিবেন তখন তাঁহাদের চাল, ডাল, কাঁচকলা ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। এই যুক্তিটি ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় মহাপুরুষগণের পক্ষে মন্দ হয় না।

২। কেবল কাল বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের শরাব, শূকর, গোমাংস সেবন করা কর্তব্য। আবার গ্রীষ্মকালে উহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য হইবে। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের যে আশীর্বাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। কেবল পাত্র বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যাহারা আহমদী সম্প্রদায়ের ছায় দুর্বল ক্ষীণকায় তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস না খাওয়া কর্তব্য। আবার ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহারা হুটপুটাজ তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস খাওয়া কর্তব্য। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া যে ভারতের হিন্দু, মুসলমানের আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ কি? ধন্য তাঁহার যুক্তি শক্তি। যদি বলেন দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মীমাংসা না করিয়া একত্র মীমাংসা করা কর্তব্য, মানিলাম। তাহা হইলেও তাহার ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানগণ ইউরোপে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাহারা দুর্বল যাহাদের পরিপাক শক্তি নিস্তেজ তাহাদের ব্যতীত সকলেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। আবার ইউরোপ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন তাঁহাদের ও ভারতের হিন্দু মুসলমানগণ মধ্যে শীতকালে যাহারা শক্তিহীন যাহাদের পরিপাক শক্তি অতি কম, তাঁহাদের ব্যতীত সমস্তেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপ যুক্তিটিও ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের পক্ষে মন্দ হয় না।

আমরা বলি যাহার যে ধর্ম সেই ধর্মামুসারে প্রথম তাহার খাদ্যের মিনিস সকল নির্ণয় করিয়া লওয়া কর্তব্য। পরে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এই সকল

জিনিস মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে দেশে যে সময় যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের সেবা যাহা অপকারী তাহাই অসেবা।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, “যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্ত এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্ত এত জেদ এত প্রতিবাদ ধর্মত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাহা খাইয়া থাকেন ? প্রতি সন্ধ্যা কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন ? না প্রতি সন্ধ্যাতে গোমাংস ব্যঞ্জে অন্ন বঞ্জিত করিয়া থাকেন ? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন ? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন ? ধর্মের দোহাই মিথ্যা বলিবেন না।” মহাশয় কোন মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্ত লালায়িত নহেন, গোমাংসের জেদে প্রতিবাদও করেন না, প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা তাঁহারা যে গোমাংস খাইয়া থাকেন একথা কোন মৌলবী সাহেব লিখেন নাই ও বলেন নাই। গোমাংস বলিয়া কথা কি, আপনি ধর্মত বলুন তো আজ যে যে ব্যঞ্জে অন্ন বঞ্জিত করিয়াছেন প্রতিদিন কি প্রতিসন্ধ্যায় তাহা কি খাইয়া থাকেন ? কখনই নয়। বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে আপনি কত ধর্ম নিগহিত কথা লিখিয়াছেন, সে কথা কি দুমাস ছমাসেই ভুলিয়াছেন ? মহামান্য পবিত্র কোরাণ শরীফে খোদাতালা আদেশ করিয়াছেন, “তোমরা গোমাংস সেবন কর।” আপনি লিখিয়াছেন, “আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই।” তজ্জগুই মৌলবীগণ আপনার প্রতি কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন। আপনি ধর্মত বলুন তো কখনও গোমাংসের ব্যঞ্জে আপনার অন্ন বঞ্জিত হইয়াছে কি না ? গোমাংসের স্বরূপা ঢালিয়া লইয়াছেন কিনা ? বাটী ভরা গোমাংস না পাইলে ক্রোধে জলিয়া ছার-খার হইয়াছেন কিনা। এখনও মধ্যে মধ্যে চুপেচুপে গোমাংসের বাটীর সামনে গমনাগমন করেন কিনা ? যাহারা কুড়ি ত্রিশ বৎসর গোমাংস সেবন করিয়া প্রকাশে গোমাংসের নিন্দা করে তাহাদিগকে ধিক্ ! শতধিক্ !

মৌলবী সাহেবগণ বলেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের ব্যবস্থানুসারে গোমাংস সেবন করা মুসলমানের পক্ষে হালাল। কোরবানি করাও হালাল। গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক উপকার হয় তাহার খাওয়ায় বাধা নাই, না খাইলেও পাপ নাই, জ্বাবর গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক অপকার হয়, তাহার না খাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু গোমাংস ও কোরবানিকে হালাল বিশ্বাস করা মুসলমান মাত্রেরই

উচিত। যিনি মুসলমান হইয়া উহা হালাল না জানেন তিনি কাকেরের মধ্যে পরিগণিত, এই এসলামী ধর্মের সার ব্যবস্থা।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন “প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্যও সহজে ঘটে না জোর জোবান ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকে না।” মহাশয় যিনি কেবল আপনার এই মস্ত্র দীক্ষিত, তিনি নাস্তিক। যাহারা নাস্তিক তাহারা এসলামীয়া ধর্ম্মানুসারে কাকের। তাহারা কখনই মুসলমান বলিয়া গণনীয় নহে। আপনার এই মস্ত্রটি যদি কেহ কাহার পরিবারবর্গকে শিখাইয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে তোমাদের স্বভাবে যাহা লয় তাহাই কব কোন বাধা বিঘ্ন মানিও না। তবে তাহার বাটিতে অনতিবিলম্বে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কিনা? আবার যাহারা ঐ মস্ত্র জপ করিয়া থাকেন যদি তাহারা তাহাদের পরিবারকে পিনজর পাখীর তায় আবদ্ধ রাখেন তবে তাহাদের প্রকৃতির আদেশ ভঙ্গ হয় কিনা?

প্রস্তাব লিখক! যাহারা গোমাংস সেবন করে তাহারা তো আপনার কথা-নুসারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। মানিলাম! ভাল বলুন দেখি যাহারা গোবংশগুলাকে জ্বরদাস্ত ক্রমে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের জীবিকা কাড়িয়া খায়, তাহারা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কিনা? আফসোস! খোদরা কজ্জিত। দগররা নছিহত।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন, “যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্ত করুণাময় ভগবান অপরিখ্যাপ্তরূপে তাহা দান করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই কথা স্বীকার্য্য। সেইজন্তই ভারতে মুসলমানগণ গরু খাইয়া থাকেন। কেননা খোদাতালা ভারতে অপরিখ্যাপ্তরূপে গরু সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন প্রায় সহস্র বৎসরাবধি মুসলমানগণ গরু খাওয়া সত্ত্বেও ভারতে গরুর কোন অংশেই ন্যূনতা নাই। সে দিগেই চাওয়া যায় সেইদিগেই শত শত গরু দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব এদেশে গরু খাওয়া যে খোদাতালার অভিপ্রায় তাহা আপনার লিখাই প্রমাণ করিতেছে। যাহারা গরু খাওয়া নিষেধ করেন তাহারা খোদাতালার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। নউজ বেলা মেন্‌হা!

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠদ্রোগীকান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মুসলমান।” মহাশয়! আমরা বোধ করি মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবেক না, গোমাংসের

গুণ অধিক কি দেখাইব, ভাল আপান দশজন পুরুষত্বহানি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখুন, তন্মধ্যে কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। পিস্তুল পীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। দশজন গৃহিনী রোগাক্রান্ত মেয়েলোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু ও কয়জন মুসলমান। অতএব হালানী বস্তুর অসীম গুণ। ভরসা করি যাহার উদরে মোরগের ঝাণ, গো-মাংসের স্তরুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে সে এ-ভাবে ভুলিবার নয়।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “ভাতাগণ! সেই হাকিমানের বস্ত্র বিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অল্পগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, যদি মূর্খতাদোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে, তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।” মহাশয় এই লিখাংশসারে ইউনানি হেকিমী বিজ্ঞায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম আপনি হাকিমী ও ডাক্তারী মতানুসারে গোমাংসের গুণাগুণ ও ছুন্দের গুণাগুণ আগামীবারে আহমদীতে প্রকাশ করুন। এবং তাহা কোন কেতাবের কত অধ্যায় লিখিত আছে তাহা লিখিয়া দেউন, তৎপর বাহাদিগকে আপনি মূর্খ বলিয়া নির্দেশ করত দর্প করিয়াছেন তাহাদের কথা পরে শুনিবেন।

পাঠক! প্রস্তাব লিখকের প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত লিখিবেন, আগামীতে আখবাবে প্রকাশ হইবে।

(প্রতিবাদ সমাপ্ত)

পরিামাষ লিখকের কার্যকাণ্ড কথা

১। প্রতিবাদকারী মহাশয়গণ লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়, আহমদী সম্পাদক নিকট তলব করায় সম্পাদকের অমুরোধে লিখক পরিচয় দিতেছে।

২। আখবাবে এসলামীয়া সম্পাদক লিখকের পরিচয় আভাবে “সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসা” যে লিখিয়াছেন, তাহা নহে। অদৃষ্টের চক্রে এবং অমলজলের আর্কষণে সামান্য দাসত্ব স্বীকারে, গৌরী, পদ্মা, যমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে। নিবাস—বঙ্গরাজ্য মধ্যস্থিত বিখ্যাত নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাবডিভিজন কুষ্টিয়ার অতিনিকট সামান্য পল্লী লাহিনী-পাড়া গ্রামে জন্মস্থান—বংশানুক্রমিক বাসকুটির বর্তমান।

৩। এসলামীয়া সম্পাদক ও তাঁহার বহুকুপী বন্ধু, যিনি কখনও মোলবী, মুহর্ত্ত পরেই মুন্সী, চার পাঁচ ছত্র পরেই আবার সুফি পরিচয় দিয়া লিখককে কাকের সাবাস্ত কবির্যাছেন, মুকব্বি-য়ানা মতে “তওবা” করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

৪। টাঙ্গাইলের অরৈতনিক কাজী এবং নেকাহ তালকের সাক্ষী গোপাল মোলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব বিগত ১৮৩৮ ভাদ্র শুক্লাবার দিবা দ্বিপ্রহর তিন-টার সময়, সাবডিপুটী মোলবী সফাউদ্দিন সাহেবের বাসাবাটিস্থ কয়েক সপ্তাহ-স্থিত, মোসলমান ধর্মসভার সভাগণ সম্মুখে গোবুল নিশ্বূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে “কাকের” এবং জ্ঞী “হারাম” হওয়া সাবাস্ত করিয়া উপস্থিত সভাগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন। আরও বলেন যে, “যদি কোন মোসলমান ঐ প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে তিনি “তওবা” করুন।” সে সময় লিখকের নাম অপ্রকাশ। কিন্তু লিখক সে ধর্মসভায় উপস্থিত। কিন্তু কোন বাদ প্রতিবাদ করে নাই। —মাত্র বলিয়াছিল বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বিবেচনা করিয়া আপনার এইমত প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। অবশ্যই প্রস্তাব লিখকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৫। এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মোলবী নঈমুদ্দীন ও তাঁহার বহুকুপী বন্ধু এবং অরৈতনিক কাজী সুলতান আহাম্মদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহারা গো-জীবনের কোন কোন প্রস্তাবের, কোন কোন শব্দে লিখককে কাকের ও তাঁহার জ্ঞী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের সেই সেই শব্দ বা উক্তি বিশেষরূপে নিদৃষ্ট করিয়া অদা হইতে ত্রিশ-দিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত রাব্বুররছম চক্রবর্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৬। সুবিজ্ঞ মুসলমান ভ্রাতাগণ! গো-জীবনের আদি-অন্ত মনোমংযোগ পাঠ করিয়া কোফরে কালামের পদগুলি নির্ণয় করত প্রকাশ করিয়া লিখককে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন। ইহাই লিখকের সাহসনয়ে প্রার্থনা।

৭। “কাকের” ও “জ্ঞী হারাম” দুইটি কথা যেমনই হৃদয় বিদারক, তেমনি ভয়ানক। লিখকের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। বখার্ব মোসলমান ভিন্ন

সে আঘাতের বেদন', অন্য কোন সম্প্রদায় অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। দ্বী বর্জিত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ বেদনা এ বাতনা দ্বী, প্রিয়জন মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

৮। ঘোড়াশাল স্কুলের প্রথম শিক্ষক মহাশয় প্রতিবাদ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ৫ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আখবাবে এসলামীয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, “গোকুল নিখুল আশঙ্কা প্রস্তাবেব প্রতিবাদ আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ জ্ঞাত পাঠান হইয়াছিল, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।” যদিও এক্ষেত্রে সম্পাদক নিরব। কিন্তু লিখক বলিতেছে, এবং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে ১৫ই আশ্বিন ৫ম সংখ্যার আহমদী দৃষ্টি করুন। ভ্রম দূর হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ লিখক বিশেষ মনোযোগের সহিত পূর্বেই পাঠ করিয়াছিল, গো-জীবন মুদ্রাঙ্কন সময়েও পাঠ করিয়াছে—গৃহীত প্রতিবাদ হইতে তাহাতে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই বলিয়া গো-জীবনে গৃহীত হইল না। শিক্ষক মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

৯। দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্রধাম মক্কা মোয়াজ্জমায় পুণ্যক্ষেত্রে বোগদাদে, মোসলমান রাজ্য প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরীফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী মৌলানা, মহামতিগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সম্বরে হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে। সর্বশক্তিমান ভগবানই লিখকের রক্ষক। সেই অদ্বিতীয় জগত-নিধান জগতপতি জগদীশ্বরই লিখকের আশ্রয়।

